রবীন্দ্রসাহিত্যে দেবতা ভাবনা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের
অধীনে পি এইচ. ডি. উপাধির শর্তপূরণে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মহুয়া দাশগুপ্ত

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. অনন্যা বড়ুয়া

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ড. সনৎকুমার নস্কর

অধ্যাপক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা-৭০০০৩২

২০১৬

Certified that the Thesis entitled

রবীন্দ্রসাহিত্যে দেবতা ভাবনা

.....

submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Prof. Ananya Baruya and Prof. Sanat Kumar Naskar And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the

1. Supervisor :	Candidate :
Dated :	Dated:

2. Supervisor :

Dated :

কথামুখ

স্নাতকোত্তর স্তরে লেখাপড়া করার সময় রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলাম। সেই তখন থেকেই চলেছে আমাদের গবেষণাটির প্রস্তুতিপর্ব। তারপর ২০১০ সাল থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে রীতিসম্মত ভাবে শুরু হয় গবেষণার কাজ। আমাদের গবেষণাটির শিরোনাম হল 'রবীন্দ্রসাহিত্যে দেবতা ভাবনা'। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এই গবেষণাটিকে লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য সচেষ্ট থেকেছি। গবেষণা কাজের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে এখন তাঁদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই, যাঁদের সাহায্য ছাড়া এই গবেষণা কাজটি সঠিক দিশা পেত না।

প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই আমার দুজন তত্ত্বাবধায়ক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. অনন্যা বড়ুয়া এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. সনৎকুমার নস্করকে। তাঁদের আন্তরিকতা, সদা সতর্ক দৃষ্টি এবং মূল্যবান উপদেশ আমাকে প্রতিনিয়ত উৎসাহ দান করেছে। তাঁদের দুজনের প্রতি রইল আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপকদের প্রতিও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করি। কারণ তাঁদের মূল্যবান উপদেশগুলিও আমাদের গবেষণাটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

আমাদের গবেষণার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার নির্ভর পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। ফলে, বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা রইল। এই কাজে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় গ্রন্থাগার, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার ইত্যাদি গ্রন্থাগারের কাছে আমি ঋণী।

আমার কর্মক্ষেত্র, বেলগাছিয়া মহাত্মা অশ্বিনী দত্ত বিদ্যাপীঠের সহকর্মীদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। তাঁদের সহযোগিতা এবং নিরন্তর উৎসাহদান গবেষণা কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমাকে সাহায্য করেছে। আমার শিক্ষিকা ড. শিপ্রা ঘোষের প্রতিও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল, যাঁর প্রেরণায় আমার বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পড়তে আসা।

এখানে যাঁদের সাহায্য ছাড়া আমার এই গবেষণা কাজটি অসম্পূর্ণ থেকে যেত তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাবার পালা। আমার পরিবার পরিজনদের আন্তরিক উৎসাহ ও সহযোগিতায় আমি গবেষণা কাজটি সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। তাঁদের আশীর্বাদ, প্রেরণা এবং শুভেচ্ছায় আমার গবেষণাটি সমৃদ্ধ হয়েছে।

এছাড়াও, গবেষণাপত্রটির অক্ষরবিন্যাস ও মুদ্রণের কাজে আন্তরিকভাবে সাহায্য করার জন্য শ্রী অর্ণব ভট্টাচার্য এবং শ্রী প্রণব নস্করের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ রইলাম। এছাড়া ধর ব্রাদার্স পরম যত্নে গবেষণাপত্রটি বাঁধাইয়ের কাজ করেছে। তাঁদের কর্মকুশলতার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল।

গবেষণাকাজটিকে সার্থক রূপ দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তবে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, সযত্ন প্রয়াস সত্ত্বেও অনেক জায়গা ত্রুটিমুক্ত করা গেল না। এ দায় সম্পূর্ণভাবেই আমার।

তারিখ গবেষকের স্বাক্ষর

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১
প্রথম অধ্যায়	
রবীন্দ্রপূর্ব ও রবীন্দ্র সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে দেবতাচর্চা এবং রবীন্দ্রনাথ	৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	
রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক পরিমণ্ডলে দেবতত্ত্বচর্চার ধারা	৬৩
তৃতীয় অধ্যায়	
রবীন্দ্রসাহিত্যে দেবপ্রসঙ্গ	৯২
চতুর্থ অধ্যায়	
সাহিত্যে দেবতা ভাবনার অন্তরালে রবীন্দ্রমনস্তত্ত্ব	২২৭
উপসংহার	২৪৪
গ্রন্থপঞ্জি	২৪৭

ভূমিকা

সভ্যতা সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে প্রকৃতির প্রতিটি বিস্ময়কর ঘটনার অন্তরালে একটি করে দেবতার অস্তিত্ব কল্পনা করে নেওয়া হয়েছিল। বৈদিক যুগে মন্ত্র দিয়ে নির্মাণ করে নেওয়া হয়েছিল দেবতাদের শরীর। আর্য ঋষিদের বিস্ময়কে অতিক্রম করে ভারতীয় দেবদেবীরা শুধু অন্তরীক্ষের জ্যোতি হয়ে রয়ে যাননি। ভারতবাসী দেবদেবীদের নিজের পরিচিত, প্রিয় গণ্ডির মধ্যে অনায়াসে নিয়ে এসেছে। তাঁরা কেবল মূর্তি বা ধ্যানের সামগ্রী নয়; তাঁরা জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, সন্তান, সন্ততি, ক্রোধ, দ্বেষ ইত্যাদি নানা ইতিহাসে আবদ্ধ। যুগে যুগে দেবদেবীদের চেহারা, প্রকৃতি এবং আভিজাত্যের পরিবর্তন হয়েছে। দেবদেবীদের ওপর ভর করেছে আর্য, অনার্য, দেশি, বিদেশি সমাজ ও সংস্কৃতি। তবু মানুষ জীবনের প্রতিটি আবেগের সঙ্গে দেবতাকে জড়িয়ে নিয়েছে। দেবতাকে প্রিয় করেছে, প্রিয়কে দেবতা।

রবীন্দ্রসাহিত্য পড়তে গিয়ে আমরা লক্ষ করেছিলাম, দেবদেবীদের বিচিত্র ভঙ্গিতে নিজের সাহিত্যে ব্যবহার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অথচ, তথাকথিত ব্রাহ্ম পরিবারে আবাল্য লালিত হওয়ার ফলে তাঁর মনে দেবসংস্কার না থাকারই কথা। এই বিষয়টি আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের একটি নতুন ব্যক্তিত্বকে উন্মোচন করেছিল। স্নাতকোত্তর স্তরে রবীন্দ্রসাহিত্য পড়তে গিয়ে 'রবীন্দ্রসাহিত্যে দেবতা ভাবনা' এই বিষয়টির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। বিষয়টির মাধ্যমে আমরা বোঝাতে চেয়েছি রবীন্দ্রনাথের দেবকল্পনার জগৎকে। রবীন্দ্রসাহিত্য বহুধাবিস্তৃত। রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে গবেষণাও হয়েছে বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন ধারায়। আমরা এই বিশাল রবীন্দ্রসাহিত্যের দেবপ্রসঙ্গগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে, গবেষণার আলোকে ব্যাখ্যা করতে চাই রবীন্দ্রনাথের দেবতাভাবনার বিশিষ্ট স্বরূপকে। এই সূত্রে দুটি বইয়ের উল্লেখ করতে চাই। প্রথমটি পম্পা মজুমদারের 'রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস' এবং দ্বিতীয়টি হল প্রণবেশ চক্রবর্তীর 'দেবতা অনুরাগী রবীন্দ্রনাথ'। এই দুটি বইতেই ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের দেবসংস্কার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পম্পা মজুমদার তাঁর বইতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রায় প্রতিটি দিক নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তার মধ্যে সংক্ষিপ্ত অংশে তিনি দেবতাদের প্রসঙ্গ এনেছিলেন। এই সূত্রে তিনি লিখেছিলেন যে এঁদের অনেককেই কবি অতিপরিচয়ের ধূলিলিপ্ত ঔদাসীন্য থেকে মুক্ত করে নতুন বেশে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। কখনো তার হারিয়ে যাওয়া পুরানো পরিচয়কে প্রকাশ করেছেন, কখনো বা তার ওপর আপন চিত্তভাব আরোপ করে তাকে অনেকাংশে নতুন রূপে তুলে ধরেছেন। পম্পা মজুমদারের এই মন্তব্যটির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের দেবকল্পনা সম্পর্কে যে মূল্যবান

উন্মোচনের সম্ভাবনা আভাসিত হয়ে উঠেছে, আমরা তাকেই বাস্তব রূপ দিতে চেয়েছি। প্রণবেশ চক্রবর্তী 'দেবতা অনুরাগী রবীন্দ্রনাথ' বইটিতে রবীন্দ্রনাথের দেবসংস্কারের সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে মনে প্রাণে কট্টর ব্রাহ্মণ এবং সনাতন হিন্দু আদর্শে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ শুধু পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে ব্রাহ্ম সেজেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের এই দিকটিও আমরা বিস্তারিতভাবে এবং আরো যুক্তি-প্রমাণ সহযোগে দেখাতে চেষ্টা করেছি।

আমরা খেয়াল রেখেছি, রবীন্দ্রনাথ আবাল্য ব্রাহ্ম পরিবেশে লালিত হয়েছিলেন এবং পরিণত বয়সে তাঁকে আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক ভাবাদর্শ প্রচারের পাশাপাশি উপাসনা মন্দিরের আচার্যের বেদিতে ধর্মোপদেষ্টার ভূমিকাও গ্রহণ করতে হয়েছিল। সেই কারণে প্রথাগত দেবসংস্কার তাঁর না থাকবারই কথা। কিন্তু কিশোর বয়সে যেমন তিনি পিতার দ্বারা ঔপনিষদিক ব্রাহ্মধর্মের অপৌত্তলিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তেমনি একই সঙ্গে মায়ের জীবনে দেখেছিলেন পৌত্তলিক ধর্মাচরণের নিষ্ঠা। শুধু তাই নয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের লোকসংস্কার ও লোকপুরাণ এবং পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের দেবকল্পনার উত্তরাধিকার— উভয়ের সঙ্গেই তাঁর যোগ ছিল নিবিড়। বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছিল আবাল্য পরিচয়। তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন, উপনিষদের সঙ্গে এই পরিবারের সম্পর্কের কথা। কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থের ''বন্ধুসমাগম'' শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লেখ করেছিলেন যে, ১৮৯৩ সালে রানাঘাটে নবীনচন্দ্রের বাড়িতে বসে কথাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আমি অনেকসময় ভাবি, আমিও পৌত্তলিক কি না।' সবচেয়ে বড়ো কথা, পারিবারিক সূত্রে অর্জিত চিরাভ্যস্ত অপৌত্তলিক মানসিকতার গভীরে রবীন্দ্রনাথের মনে দৃঢ়মূল হয়েছিল পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির শতাব্দীবাহিত যৌথ নির্জ্ঞান। আর মগ্নচৈতন্যের এই স্মৃতিলোককে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছিল রবীন্দ্র-কবিমানস।

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সৃষ্টিসম্ভার নিয়ে এর আগে বিভিন্ন ধারায় গবেষণা হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যের সংরূপগুলির শিল্পরূপগত বৈশিষ্ট্য, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা, শিল্পচেতনা, রাজনীতিভাবনা, ইতিহাস ও সমাজচিন্তা, প্রকৃতিভাবনা, অধ্যাত্মচেতনা সম্পর্কে বিশ্লেষণ, রবীন্দ্রসাহিত্যের জীবনীমূলক, ভাষাতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক বা সংগঠনবাদী সমালোচনা ইত্যাদি দিক থেকে আলোকপাত করেছেন বিভিন্ন গবেষক। আমাদের গবেষণার প্রতিপাদ্য পূর্ববর্তী এই ধারাগুলির থেকে একটু আলাদা। এই বিষয়টির পূর্বসূত্র হিসাবে আমরা পম্পা মজুমদারের 'রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস', প্রণবেশ চক্রবর্তীর 'দেবতা অনুরাগী রবীন্দ্রনাথ'-এর নাম আগেই উল্লেখ করেছি। এছাড়া সুলেখা চট্টোপাধ্যায়ের একটি

গবেষণাগ্রন্থ এই প্রসঙ্গে মনে করা যায়— 'রবীন্দ্রকাব্যে নটরাজ কল্পনা।' তবে এইটিতে শুধু নটরাজের প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। পম্পা মজুমদারের বইটিতে দুটি সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রসাহিত্যের দেবপ্রসঙ্গগুলির বিশদ উল্লেখ আছে। কিন্তু তার অন্তরালে রবীন্দ্রনাথের মনস্তত্ত্বের কোনো ব্যাখ্যা নেই। তাছাড়া এই বইতে রবীন্দ্রনাথের দেবকল্পনার ভারতীয় প্রেরণা-উৎসগুলি গুরুত্বলাভ করলেও তার অন্তরালের সম্ভাব্য পাশ্চাত্য প্রভাব সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। প্রণবেশ চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থটিতে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের অন্তরের সুপ্ত দেববিশ্বাসকে। সেই সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন রবীন্দ্রসাহিত্যের অল্প কয়েকটি দেবপ্রসঙ্গ নিয়েও। তবু, এই গবেষণাটিও সম্পূর্ণ নয়। গ্রন্থের 'ভূমিকা' অংশে লেখক নিজেই অতৃপ্তির সঙ্গে প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'এটিও কি : পূর্ণ রূপ? নিজেরই মনে রয়েছে সংশয়।' আমাদের গবেষণাটিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট দেবতারা রবীন্দ্র সাহিত্যে কীভাবে আবির্ভূত হয়েছেন ও রবীন্দ্রকল্পনার স্পর্শে কীভাবে তাঁদের প্রথাগত রূপের বিবর্তন ঘটেছে, তার বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যে দেবতাদের নবরূপায়ণের অন্তরালে কবিমনস্তত্ত্বের কী নিগূঢ় প্রেরণা ক্রিয়াশীল হয়েছে, তাও আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি।

সমগ্র গবেষণাটিতে আমরা দুই ধরনের উপাদানের উপর নির্ভর করেছি। মুখ্য উপাদানের মধ্যে রবীন্দ্রসাহিত্যের দেবপ্রসঙ্গমূলক অংশগুলি আর গৌণ উপাদানের ক্ষেত্রে অবলম্বন করা হয়েছে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পুরাণ, মহাকাব্য ও প্রাচীন সাহিত্য, দেবতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণামূলক অভিধান ও বিভিন্ন আকরগ্রন্থগুলিকে। আমাদের গবেষণাটি সম্পন্ন করতে গ্রন্থাগার নির্ভর পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। বিষয়বস্তু বিচারের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণমূলক ও বর্ণনাত্মক রীতি অনুসরণ করেছি।

আমাদের প্রথম অধ্যায়টির শিরোনাম হল— 'রবীন্দ্রপূর্ব ও রবীন্দ্র সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে দেবতাচর্চা এবং রবীন্দ্রনাথ।' এই অধ্যায়টিতে আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি রবীন্দ্রনাথের পঠনপাঠনের আড়ালে রয়ে যাওয়া দেবপ্রসঙ্গগুলি। ভৃত্যদের মুখে শোনা পুরাণের গল্প, 'সচিত্র শিশুবোধক' বইটিতে নৃসিংহ অবতারের প্রসঙ্গ থেকে শুরু করে বেদ, উপনিষদ, মঙ্গলকাব্য, গীতগোবিন্দম্, বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী রবীন্দ্রনাথ আত্মস্থ করেছিলেন পরম যত্নে। উনিশ শতকে ক্রমশ হ্রাস পাওয়া তথাকথিত দেবসংস্কার, ব্রাহ্মধর্ম ও খ্রিস্টধর্মের প্রবল প্রভাব, হিন্দু রক্ষণশীলদের প্রবল গোঁড়ামি, দেবতা সম্পর্কে মেধাহীন কিছু রচনা কেমন করে সংশয়াচ্ছন্ন করেছিল হিন্দুদের দেববিশ্বাসকে— এই অধ্যায়টিতে তাও আমরা দেখিয়েছি। সমকাল যে রবীন্দ্রনাথের মনের ওপর কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেটিও

আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে। এরপর নির্বাচিত করে নিয়েছি সেইসব সাহিত্যিকদের, যাদের রচনা রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিতভাবে পড়েছিলেন অথবা পড়ার সম্ভাবনা ছিল। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র— এই সাতজন সাহিত্যিকের দেবসংস্কার আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পাঠ্যতালিকা এবং জীবনকে এই মনীষীদের দেবসংস্কার কীভাবে প্রভাবিত করেছে, তা যুক্তি প্রমাণ সহযোগে দেখানোর চেষ্টা করেছি। এই অধ্যায়ের শেষে আমরা আলোচনা করেছি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-নিবেদিতার দেবসংস্কার ও ধর্মভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নিয়ে। সদর্থক এবং নঞর্থক দুই ধরনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াকেই আমরা অধ্যায়টিতে তুলে ধরেছি। উদ্দেশ্য একটাই— একটি যুগ, যুগের দেবতাভাবনা, রবীন্দ্রনাথের মনন চর্চা এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মুখ্য সাহিত্যিকদের দেবতাভাবনার প্রকৃতিকে উপলব্ধি করতে চাওয়া। এই প্রতিটি বিষয়কে নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল রবীন্দ্র-কবিমানসের স্বতন্ত্র দেবসংস্কার।

আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায়টির শিরোনাম হল---- ‘রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক পরিমণ্ডলে দেবতত্ত্বচর্চার ধারা।’ এই অধ্যায়টিতে আমরা প্রথমে আলোচনা করেছি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির গোঁড়া বৈষ্ণব থেকে কট্টর ব্রাহ্মে রূপান্তরিত হওয়ার ইতিহাস। রঘুনাথ আচার্যের বংশধরদের জাতিচ্যুত হওয়ার ফলে তাদের আত্মীয়-কুটুম্বরা পিরালী থাকের ব্রাহ্মণ হয়ে সমাজে ‘ব্রাত্য’ হয়ে পড়েছিলেন। এরপর জগন্নাথ কুশারীর বংশধরদের ‘ঠাকুর’ হয়ে ওঠার কথা, শিবপ্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ, শালগ্রাম শিলার নিষ্ঠাবান সেবায়েত হিসেবে সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াবার ইতিহাস বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমল থেকে রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্ম প্রীতি ঠাকুরবাড়ির দেবসংস্কারে সামান্য চিড় ধরিয়েছিল। তবে, আমরা দেখিয়েছি দ্বারকানাথের তথাকথিত ভ্রষ্টাচার কিন্তু ঠাকুরবাড়ির বৈষ্ণবীয় আবহাওয়ার বদল ঘটাতে পারেনি। ঠাকুরবাড়ির পৌত্তলিক সংস্কারের ভিত আমূল নড়িয়ে দিয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ, তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা এবং দ্বারকানাথের শ্রাদ্ধে সম্পূর্ণ অপৌত্তলিক পদ্ধতি গ্রহণ করে দেবেন্দ্রনাথ একটি গোঁড়া বৈষ্ণব পরিবারকে হঠাৎ করেই ব্রাহ্ম পরিবারে পরিণত করতে চাইলেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্ররা— দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রত্যেকেই ব্রাহ্মধর্মের পক্ষে ছিলেন। এই অধ্যায়ে আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর ব্রাহ্মপুত্রদের মগ্নচেতনের দেবসংস্কার ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভরা হিন্দু মনগুলি। যদিও দেবেন্দ্রনাথ একরকম জোর করেই ঠাকুরবাড়িতে ব্রাহ্মধর্মের ধ্বজা উড়িয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন কিন্তু অন্দরমহলে গোপনে চলেছিল পুতুলপুজো। আসলে, অলকাসুন্দরী, সারদাসুন্দরী এবং দিগম্বরী দেবীর কাছ থেকে ঠাকুরবাড়ির

অন্দরমহল নিষ্ঠাভরে দেবপুজোর রীতি শিখেছিল। ফলে, হঠাৎ করে একদিন একটি নির্দেশ তাঁদের মনের দেবসংস্কারকে মুছে দিতে পারল না। ফলে, ব্রত, পার্বণ, কৃষ্ণপূজা, দীক্ষাগ্রহণ— পৌত্তলিক প্রতিটি আচরণই ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল বজায় রেখেছিল। এই অধ্যায়ে আমরা অবনীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ এবং রথীন্দ্রনাথের দ্বিধাপূর্ণ দেবসংস্কারের পাশাপাশি দেখিয়েছি প্রতিমাদেবী, সুনয়নী, বিনয়নী, সরলাদেবীদের দেবভাবনার স্বচ্ছ প্রকাশকে। এছাড়াও, সৌদামিনী, প্রফুল্লময়ী, জ্ঞানদানন্দিনী, কাদম্বরী, মৃণালিনী ইত্যাদি অন্তঃপুরিকাদের পৌত্তলিক আচরণগুলি আলোচনা করেছি এই অধ্যায়টিতে। শেষে ভৃত্যমহলের প্রবল দেবভক্তির উল্লেখ করে আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি রবীন্দ্রনাথের মনে তাঁর পরিবার ও পরিবেশের দেবসংস্কারের প্রভাবকে।

আমাদের তৃতীয় অধ্যায়টির শিরোনাম হল— 'রবীন্দ্রসাহিত্যে দেবপ্রসঙ্গ।' এটিই আমাদের গবেষণার প্রধান অধ্যায়। এই অধ্যায়ে আমরা মোট উনিশ জন দেবদেবীকে নিয়ে আলোচনা করেছি। অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য, চন্দ্র, বরুণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, বিশ্বকর্মা, মদন, কৃষ্ণ, কার্তিক, গণেশ, উষা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, দুর্গা, কালী এবং লৌকিক দেবদেবী— এই প্রত্যেক দেবদেবীর প্রসঙ্গগুলি রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে অন্বেষণ করে উল্লেখ করেছি এবং প্রতিটি পরিচ্ছেদের শুরুতে তাঁদের সামগ্রিক পরিচয় দিয়েছি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও নাটকে দেবদেবীদের বিচিত্র রূপ খুঁজে বার করে তাঁদের বিশেষত্বকে তুলে ধরাই এই অধ্যায়ে আমাদের মুখ্য উপজীব্য বিষয়। আলোচনার সূত্রে আমরা দেখেছি, দেবদেবীদের তথাকথিত সিদ্ধরূপকে রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছামতো বদলে দিয়েছেন। যেমন অগ্নি এবং বরুণের পুরুষ মূর্তির পাশাপাশি নারীরূপও দেখিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কোথাও আবার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই দেবতাকে মিলিয়ে এক নতুন, অভিনব দেববিগ্রহ নির্মাণ করেছিলেন তাঁর সাহিত্যে। যেমন মদনের ক্ষেত্রে আমরা গ্রিক এরস ও রোমান কিউপিডের আশ্চর্য মেলবন্ধন খুঁজে পাই। অনেক সময় প্রাচ্য দেবতা ও পাশ্চাত্য পুরাণকে একই সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন। দেবতা কখনো শক্তিশালী দিব্য প্রেরণা আবার কখনো অত্যন্ত দুর্বল মানবিক রূপ পরিগ্রহ করেছেন তাঁর সাহিত্যে। বিশ্বকর্মাকে যেমন রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছিলেন তাঁর দর্শনচিন্তার প্রকাশের ক্ষেত্রে। তেমনি ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দও প্রভাব ফেলেছিল দেবতার চরিত্র নির্মাণে। পূর্বজ সাহিত্যিকদের দেবতা ভাবনার প্রভাবও আমরা এই অধ্যায়ের আলোচনার ক্ষেত্রে লক্ষ করেছি। অধ্যায়টিতে উনিশ জন দেবতার বিস্তারিত পরিচয় এবং রবীন্দ্রসাহিত্যে তাঁদের রূপ ও স্বভাবের বৈচিত্র্য দেখানোই আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল।

আমাদের চতুর্থ তথা শেষ অধ্যায়টির শিরোনাম হল— 'সাহিত্যে দেবতা ভাবনার অন্তরালে

রবীন্দ্রমনস্তত্ত্ব।' এই অধ্যায়টিতে আমাদের গবেষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। অধ্যায়টির শুরুতে খুব সংক্ষেপে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির বক্তব্যকে ভিত্তি করে আমরা রবীন্দ্রনাথের অন্তরের সুপ্ত দেবসংস্কারকে দেখানোর চেষ্টা করেছি। এরপরে, শিলাইদহ পর্বে রবীন্দ্রনাথের দেবতা অনুরাগী মনের পরিচয় দিয়েছি। তারপর, রবীন্দ্রনাথের নিজের বক্তব্য উদ্ধৃত করে দেখিয়েছি রবীন্দ্রনাথ নিজেকে ব্রাহ্মগোষ্ঠীর গণ্ডিতে আটকে রাখতে চাননি। তার মানে এই নয় যে তিনি তাঁর আচরণে 'হিন্দুয়ানি'র প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি নিজেকে 'কবি'-ই মনে করতেন। ফলে তিনি বৈদিক সাহিত্যকে কবির দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। শেষে, তাঁর সাহিত্যে দেবতাদের বিশিষ্টতা উল্লেখ করে দেখাতে চেষ্টা করেছি, ব্রাহ্ম বা হিন্দু নয়, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রকৃত কবি। দেবদেবীরা তাঁর সাহিত্যে প্রতীক মাত্র, যার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ মানবিক আবেগগুলির প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন।

এই গবেষণার আলোকে আমরা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষ দিককে আলোকিত করতে চেয়েছি, যার সূত্রে রবীন্দ্রসাহিত্যে দেবতাভাবনার বিশিষ্টতা প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

রবীন্দ্রপূর্ব ও রবীন্দ্র সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে দেবতাচর্চা এবং রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ যে সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই সময়টি ছিল বাংলাদেশের এক যুগসন্ধিক্ষণের মুহূর্ত। নবজাগরণের প্রবল অভিঘাতে তখন সদ্য জেগে উঠতে শুরু করেছিল বাঙালির মন এবং মনন। বাংলা সাহিত্যও যেন সেজে উঠছিল নতুন ভাবে। প্রাগাধুনিক, দেবনির্ভর বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত ছক ভেঙে নতুন ধরন, নতুন ভঙ্গিতে উজ্জ্বল হয়ে আত্মপ্রকাশ করছিল বিভিন্ন সাহিত্য সংরূপগুলি। সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজ এবং রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের এক দ্বন্দ্বমুখর পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন।

উনিশ শতকের শেষদিক থেকে সাহিত্য রচনা শুরু করলেও রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের শিরোপা পেয়েছিলেন মূলত বিশ শতকে। তাঁর মনের দেবসংস্কার আলোচনা করতে বসে অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে প্রাচীন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের দেবতাভাবনার ইতিবৃত্ত। যুগের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির মনে এবং মননে দেবতাচর্চার বিবর্তনটিও লক্ষ করার মতো। রবীন্দ্রপূর্ব বাংলা সাহিত্য বলতে মনে আসে প্রাগাধুনিক বাংলার এবং উনিশ শতকের প্রধান প্রধান সাহিত্যিকদের রচনার কথা। প্রাগাধুনিক এবং উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের এবং এই সময়কার বাঙালি সাহিত্যিকদের রচনায় দেবচর্চার ইতিহাস আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিতে চেষ্টা করব রবীন্দ্রনাথের দেবসংস্কারের ওপর একটি বিশেষ সময়ের প্রভাবকে। আসলে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক মন এবং মননের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবীদের সাহিত্যচর্চা এবং তাঁর নিজস্ব সাহিত্যপাঠের ইতিহাস।

উনিশ শতকের জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি বাঙালির সংস্কৃতিচর্চার পথ নির্দেশক স্তম্ভের মতো ছিল। ফলে, উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে বহুপাঠের সহজ ও সাবলীল ধারাটি ছিল ঠাকুরপরিবারের মজ্জাগত বিষয়। ঠাকুরবাড়ির সদস্য হিসাবে রবীন্দ্রনাথও যে গ্রন্থকীটের মতোই প্রাচীন এবং নবীন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে অনায়াসে পরিচিত হবেন, এই ভাবনাও অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সঙ্গত। ১৮৬৪ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত প্রথাগত শিক্ষার আরম্ভ হয়। তাঁর বয়স তখন চার। মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে প্রথম সূচনা হয় রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাচর্চার। তারও আগে ভৃত্যদের

গুরুমশাইগিরির মধ্য দিয়ে রামায়ণ ও মহাভারতের গল্পের সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করেছিলেন শিশু-রবি। 'সচিত্র শিশুবোধক' বইটিতে প্রহ্লাদের গল্পে বিষ্ণুর নৃসিংহ অবতারের প্রসঙ্গ তাঁর মনে দেবতা সম্পর্কে আবছা এক আভাস তৈরি করে থাকতে পারে। ১৮৬৬ সালে রবীন্দ্রনাথের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল হরিনাথ শর্মার রচনাবলী, নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'জ্ঞানাঙ্কুর' এবং কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদিত 'সদ্ভাবশতক'। তাছাড়াও স্বল্প লেখাপড়া জানা কোনো বিশেষ ভৃত্য তাদের মাদুরপাতা আসরে, রেড়ির তেলের ভাঙা সেজের চারিদিকে ঠাকুরবাড়ির শিশুসদস্যদের বসিয়ে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত পড়ে শোনাতো। এইসব আসরে হঠাৎ করে এসে হাজির হতেন কিশোরীনাথ চট্টোপাধ্যায়, শুনিয়ে যেতেন দাশু রায়ের পাঁচালির পৌরাণিক গল্প। মায়ের কাছে বসেও রবীন্দ্রনাথ কৃত্তিবাসী রামায়ণ শুনতেন। মায়ের সখী শুভঙ্করী দেবীর মার্বেল কাগজ মণ্ডিত কোণ ছেঁড়া-মলাটওয়ালা মলিন বইটা কোলে নিয়ে পৌরাণিক, মহাকাব্যিক বিষাদ ভর করত শিশু রবির মনে। মেঘাচ্ছন্ন বারান্দায় ছড়িয়ে পড়ত অপরাহ্নের আকাশের ম্লান আলো। এভাবে রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীল মনে ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছিল পৌরাণিক পৃথিবীর দেবদেবী ঘেরা এক কল্পজগৎ।

বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের ছিল আবাল্য পরিচয়। উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্-পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে ঠাকুর পরিবারে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্যের চর্চা লক্ষ করা যায়। পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে 'ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ' থেকে উপনিষদের শ্লোক ব্যাখ্যা করে আবৃত্তি করাতেন। কিশোর বয়সে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'সঞ্জীবনী সভা'র সদস্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে 'লালরেশমে জড়ানো বেদমন্ত্রে একখানা পুঁথি' সভ্যদের অবশ্যপাঠ্য ছিল, তাঁদের দীক্ষাও হয়েছিল ঋক্‌মন্ত্রে।

বেদ ও পুরাণের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে উনিশ শতকের সদ্য প্রকাশিত রচনাগুলিও নিবিষ্ট মনে পাঠ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন, তাঁর ছেলেবেলায় বাংলা সাহিত্যের 'কলেবর কৃশ' ছিল। এসব কারণে পাঠ্য-অপাঠ্য বাংলা বই যে কটি ছিল, সমস্তই তিনি শেষ করেছিলেন।[১] এই সূত্রেই মেঘনাদবধ কাব্য, একত্র বাঁধানো বিবিধার্থসংগ্রহ, আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস, বাংলা রবিনসন ক্রুসো, সুশীলার উপাখ্যান, রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের জীবনচরিত, বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি তখনকার সময়ের বইগুলি তিনি আন্তরিকভাবে পড়ে ফেলেছিলেন। 'অবোধবন্ধু' পত্রিকাটিও রবীন্দ্রনাথ আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন। বড়ো, চৌকো এই বইটি বুকে নিয়ে, শোবার ঘরে, তক্তপোশের

ওপর চিত হয়ে পড়ে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়েছিলেন তিনি। 'অবোধবন্ধু' পাঠের সূত্রেই বিহারীলালের কবিতার সঙ্গে তার পরিচয়। একই ভাবে 'বঙ্গদর্শন' পড়তে পড়তে তিনি পরিচিত হন বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার সঙ্গে। এই নিছক আনন্দের জন্য যে সাহিত্যপাঠ, তা যেন সরল বাঁশির সুরে তাঁর মনের মধ্যে মাঠের এবং বনের গান বাজিয়ে তুলত।[২]

বেশির ভাগ সময়, বাড়ির মেয়েদের সংগ্রহ করা বইগুলি অধিকার করে পড়ে ফেলতেন কিশোর রবীন্দ্রনাথ। অনেক সময়, এক মালিনী মেয়েমহলে বই বিক্রি করতে আসত। বটতলার যত কিছু নতুন বই, কাব্য, উপন্যাস, আষাঢ়ে গল্প ইত্যাদি নিয়ে এসে সে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে 'লাইব্রেরি কলেবর' বৃদ্ধি করে যেত।[৩] বইয়ের তালিকা নেহাত কম ছিল না। মানভঞ্জন, প্রভাস মিলন, দূতীসংবাদ, কোকিলদূত, রুক্মিনীহরণ, পারিজাতহরণ, গীতগোবিন্দ, প্রহ্লাদচরিত্র, রতিবিলাপ, বস্ত্রহরণ, বাসবদত্তা, অন্নদামঙ্গল, হাতেমতাই, গোলেবকায়লী, লায়লামজনু, কামিনীকুমার ইত্যাদি বইতে নিত্য ভরে উঠত ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের গ্রন্থভাণ্ডার। রবীন্দ্রনাথ যে অনায়াসে এই বইগুলি দিব্যি পড়ে ফেলতেন তা অনুমান করতে প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

কিশোর বয়সে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর প্রভাবে বৈষ্ণব পদাবলী, কবিকঙ্কণের লেখা চণ্ডীমঙ্গল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, রামপ্রসাদের শাক্তপদ প্রভৃতি মধ্যযুগীয় সাহিত্য ছাড়াও প্রাগাধুনিক যুগের হরু ঠাকুর, রাম বসু, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক ইত্যাদি কবিওয়ালাদের প্রতিও তাঁর আগ্রহের অভাব ছিল না। ১৮৭৪ সাল নাগাদ রবীন্দ্রনাথ গভীর ভাবে পরিচিত হলেন বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে। কবিওয়ালাদের কুরুচিপূর্ণ প্রকাশ রীতির ফলে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ ছিলেন বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ। মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনা' প্রকাশ করে বৈষ্ণব পদাবলীকে বিকৃতির হাত থেকে উদ্ধার করেন। এরপর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সংকীর্তন শুনে বাঙালি আবার রাধাকৃষ্ণ লীলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। জগদ্বন্ধু ভদ্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'মহাজন পদাবলী সংগ্রহ'। এরপর ১২৮১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাস থেকে প্রতি মাসে ধারাবাহিকভাবে 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' নামে বিদ্যাপতির পদাবলী টীকা সহযোগে প্রকাশিত হতে থাকে। পরে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় 'চণ্ডীদাসকৃত পদাবলী', 'রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ', 'গোবিন্দদাসকৃত পদাবলী' ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই সব বই পড়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে সুরক্ষিত আছে এর খণ্ডগুলি। 'জীবনস্মৃতি'র পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায় দাদাদের পড়া হয়ে গেলে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবপদ বিষয়ক পত্রিকাগুলি একজোট করে পড়ে ফেলতেন। মৈথিলি কবি বিদ্যাপতির অস্পষ্ট পদগুলি নিজে নিজে বোঝার চেষ্টা করতেন কিশোর

রবি। দুরূহ শব্দ এমনকি ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলিও ছোটো বাঁধানো খাতায় নোট করে রাখতেন।[৪] ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে গঙ্গানদীর উপর নৌকায় চড়ে বেড়াতে বেড়াতে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত 'গীতগোবিন্দম্' কাব্যের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় রবীন্দ্রনাথের। পরবর্তীকালে, গদ্যরীতিতে ছাপা, শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' কাব্যের বিচিত্র ছন্দকে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সমগ্র কাব্যটিকে একটি খাতায় তিনি নকলও করে নিয়েছিলেন। অনেক পরে বৈষ্ণব পদাবলীর কিছু নির্বাচিত পদ টীকা ও ব্যাখ্যাসহ প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিলেন বলে জানা যায়। বৈশাখ, ১২৯২ বঙ্গাব্দে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে চলেছিল 'পদরত্নাবলী', অর্থাৎ বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীর মধ্যে সেরা কবিদের একত্র সংগ্রহ। এই ঘটনাটি তাঁর প্রাগাধুনিক সাহিত্যচর্চার সাক্ষ্য বহন করে।

ছেলেবেলায় যে প্রাচীন কবি রবীন্দ্রনাথের মনকে প্রায় বিমুগ্ধ করে রেখেছিলেন তিনি হলেন মহাকবি কালিদাস। 'জীবনস্মৃতি' থেকে জানা যায় কালিদাসের সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল নিবিড়। গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে 'কুমারসম্ভব' এবং রামসর্বস্ব পণ্ডিতের কাছে 'শকুন্তলা' পড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'ছেলেবেলা' বইতে তাঁর নিজের মন্তব্য থেকে অনুমান করা যায় যে 'কুমারসম্ভব' তাঁকে আগাগোড়া মুখস্থ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১২৮৪ সালের মাঘ সংখ্যার 'ভারতী'তে 'কুমারসম্ভব'-এর তৃতীয় সর্গটির অনুবাদ সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ নিজেই করেছিলেন। তাঁদের বাড়িতেও কালিদাসের সাহিত্যচর্চার একটি ধারা বেশ চোখে পড়ে। ১৮৬০ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মেঘদূত'-এর পদ্যানুবাদ করেছিলেন। আবার ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হয় গণেন্দ্রনাথের 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের পদ্যানুবাদ। নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই সময় বিখ্যাত প্রায় সব সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করে ফেলেছিলেন। এই প্রতিটি বই ঠাকুর পরিবারে অত্যন্ত সহজলভ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের মনে এই মহাকবির লেখা কাব্যগুলি দেবতাভাবনার এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল বলে আমাদের অনুমান।

এই বিচিত্র বিষয়ের বিবিধ জ্ঞান রবীন্দ্রনাথের মগ্নচেতনে এক বিশেষ অনুভূতিলোকের সৃজন করেছিল। ঠাকুরপরিবারের অনুকূল আবহাওয়া এবং সেকালের যুগপরিবেশ— এই দুইয়ের মেলবন্ধনে রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান এবং বোধ সম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধ হয়েছিল। তাঁর পাঠচর্চার কথা মনে রেখে, প্রাগাধুনিক ও উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে দেবতাচর্চার ইতিবৃত্ত আলোচনা করে আমরা বুঝে নিতে চেষ্টা করব তাঁর মনের দেবতাভাবনার ধরনটিকে। এই প্রসঙ্গে বাঙালি মননের বিবর্তনশীল দেবচিন্তার দিকটিও আমাদের আলোচ্য বিষয় হিসাবে গুরুত্ব পাবে।

'দেব' শব্দটি থেকে 'তা' প্রত্যয় যোগে 'দেবতা'র জন্ম। যা কিছু দীপ্ত, দীপ্যমান প্রাগাধুনিক মানুষ সেই সব বিষয়ের উপর দেবত্ব আরোপ করেছিল। দেবতা নিজের আশ্চর্য শক্তির জোরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং পৃথিবীর যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করার ক্ষমতা রাখেন। মানুষের কল্পনা প্রাচ্যে এবং প্রতীচ্যে অজস্র দেবদেবীর জন্ম দিয়েছে। বিভিন্ন দেবকল্পনার অন্তরালে আসলে যা ক্রিয়াশীল থাকে, তা হল সমাজমনস্তত্ত্ব। সৃষ্টির শুরু থেকেই প্রকৃতির প্রতিটি বিস্ময়কর ঘটনার আড়ালে কোনো না কোনো দেবতার অস্তিত্ব কল্পনা করেছিল যুক্তিবোধশূন্য, সরল মানুষ। লক্ষ করলে বেশ দেখা যাবে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতোই ঋগ্বেদের ঋষিরা যেমন প্রকৃতির বিচিত্র রূপের মধ্যে থেকে মন্ত্র দিয়ে নির্মাণ করেছিলেন ভারতবর্ষীয় দেবতাদের বিগ্রহ, তেমনি গুপ্তযুগে লেখা পুরাণ জন্ম দিয়েছিল রাজবেশধারী রাজকীয় দেবসমাজের। পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের দেবকল্পনার সঙ্গে ভারতবর্ষের দেবদেবীদের সাদৃশ্য থাকলেও তাঁরা বিশেষভাবে প্রাচ্য সমাজ ঘেঁষা ছিলেন। আবার, বাঙালি মন ভারতবর্ষের দেবকল্পনাকে বিশিষ্ট করে তুলেছিল। হতে পারে সেই কারণে বাঙালির দেবসম্প্রদায় তাঁদের তথাকথিত দেবসুলভ গাম্ভীর্য হারিয়ে অনেকটাই বাংলার সমাজ ও প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছিলেন। মধ্যযুগের দেবনির্ভর, দেবশাসিত, প্রাগাধুনিক সাহিত্যের পৃথিবীতেও দেবদেবীরা কখনো ঘরের মেয়ে, কখনো গৃহবধূ আবার কখনো মোহন বাঁশি হাতে কিশোর ছেলেটি।

সমাজ এবং রাষ্ট্র অনেক সময় দেবদেবীর চরিত্রের বদল ঘটাতে পেরেছিল। যেমন, মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রাচীন দেবসমাজের ভাবগাম্ভীর্য একান্ত লঘু করে তুলেছিল শিবের কামুকতা, মনসার ক্রুরতা, চণ্ডীর নিষ্ঠুরতার মতো বৈশিষ্ট্যগুলিকে। পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তেই বহু প্রাচীনযুগ থেকে দেবসমাজের ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে দেবতারা নিত্য নতুন অবয়ব পেয়েছেন। সামাজিক নানা চিন্তাস্রোত এবং সংস্কার দেবতাদের ব্যক্তিত্ব গঠনের অন্তরালে নীরবে বহমান ছিল। পৃথিবীর দেবসভাকে এইভাবে সমাজমন এবং মানুষ কল্পনা ক্রমাগত পরিবর্তিত করে চলেছে। মহাপ্রতাপশালী প্রাচীন দেবতাদের সঙ্গে নতুন দেবতারা অনায়াসে মানবমনের স্বর্গলোকে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। মানুষের খেয়ালি কল্পনার এ ভাঙাগড়ার খেলায় দেবতাদের নিত্যনবায়মান হয়ে ওঠার তাই কোনো সমাপ্তি নেই। রবীন্দ্রনাথ পুরনো বাংলা সাহিত্য পাঠের মধ্য দিয়ে দেবচরিত্রে এই ক্রমবিবর্তন লক্ষ করেছিলেন নিশ্চয়ই। পরবর্তীকালে নিজের সাহিত্যে তিনি অনায়াসে ব্যবহার করবেন এই বিবর্তনশীল দেবতাভাবনার সহজ উত্তরাধিকার।

বৈদিক সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ

ঋগ্বেদে দেবতার সংখ্যা ছিল তেত্রিশ। স্বর্গ, মর্ত্য এবং অন্তরীক্ষ— এই তিনটি জায়গায় বিস্তৃত ছিল তাঁদের লীলাক্ষেত্র। শতপথ ব্রাহ্মণে এই তেত্রিশটি দেবতাকে তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে— আদিত্য, রুদ্র এবং বসু। বারো জন আদিত্য, এগারো জন রুদ্র এবং আট জন বসুর উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। কিন্তু হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেবতার কথা বেদ তো দূর অস্ত, কোনো পুরাণেও নেই। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধের 'বেদের দেবতা' শীর্ষক পরিচ্ছেদে সহজভাবে এই সংশয়ের সমাধান করেছিলেন। ঋগ্বেদের তেত্রিশ জন দেবতাই যে কবি, ভক্ত বা ঠাকুরাণীদিদিদের গল্পে গল্পে তেত্রিশ কোটি হয়েছেন, অর্থাৎ লোকমুখে পল্লবিত হয়েই ঋগ্বেদের তেত্রিশ জন দেবতা তেত্রিশ কোটিতে পরিণত হয়েছিলেন সেকথা বুঝতে পারা যায় ।[৫]

ইন্দ্র, অগ্নি, মিত্র, বরুণ, সোম, বায়ু প্রভৃতি দেবতারা ঋগ্বেদে দেবমণ্ডলীর প্রধান ছিলেন। বৈদিক যুগে আর্যরা শিশুর মতো সরলতা নিয়ে প্রাকৃতিক বস্তুতে দেবত্ব আরোপ করে বিস্মিত হত। বৈদিকযুগে দেবতাদের কৌলীন্য এবং আভিজাত্য ছিল অনেক বেশি। মর্ত্যমানবদের সঙ্গে তাঁদের এক ধরনের শ্রদ্ধা ও ভীতির সম্পর্ক ছিল। সেই তুলনায় পুরাণের যুগে কিন্তু দেবতারা অনেক বেশি সহজ, মাটির কাছাকাছি ছিলেন। তাঁরা কখনো পিতৃসত্য পালনের জন্য মানব শরীর ধারণ করে বনবাসী হয়ে যেতেন, আবার কখনো বন্ধুপ্রীতির কারণে সারথী হয়ে রথ টানতেন। এই পরিবর্তনটি লক্ষ করার মতো।

রবীন্দ্রনাথ যে বেদ-উপনিষদ এবং পুরাণের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন সেকথার উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। ছেলেবেলায় গায়ত্রী মন্ত্রের নির্ভুল উচ্চারণের মধ্য দিয়ে যে সংস্কার তাঁর মনকে স্পর্শ করেছিল তা তিনি কখনো ভোলেননি। ১৮৭৫ সালের আষাঢ় মাসে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের লেখা 'প্রকৃতির খেদ'। তখন তাঁর বয়স মাত্র চোদ্দ। এই কবিতায় সরস্বতী নদীর তীরে আর্য ঋষিদের সামগান করার একটি ছবি ধরা আছে।[৬] 'হিন্দুমেলায় পঠিত দ্বিতীয় কবিতা'টিতেও আর্য কবিদের উল্লেখ করেছিলেন কিশোর রবীন্দ্রনাথ। পরিণত বয়সে অনেকবার তাঁর লেখায় বেদের প্রসঙ্গ আসবে। কিন্তু কিশোর বয়সের ওই প্রকাশটুকুর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়, তাঁর মনের গহনে ঋগ্বেদের গাঢ় প্রভাবের ইঙ্গিত। অনেক বৈদিক মন্ত্রে সুরও দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি হিবার্ট বক্তৃতায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছিলেন—

> When I look back upon those days it seems to me that unconsciously I followed the path of my Vedic ancestor.[৭]
>
> (The Religion of Man 1931, Chapter VI; The Vision)

যদিও 'দেবের কাব্য', তবু রবীন্দ্রনাথ তাকে কবির দৃষ্টিতেই দেখেছিলেন। বৈদিক কবির সরল দৃষ্টিও রবীন্দ্রনাথের নজর এড়ায়নি। 'পথের সঞ্চয়' বইটির 'কবি য়েট্‌স্' প্রবন্ধে তাই লিখেছিলেন যে বৈদিক কবিরাও জল, স্থল, প্রাণ এবং হৃদয়কে দেখেছেন। নদী, মেঘ, ঊষা, অগ্নি, ঝড় বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে নয়, ইচ্ছাময় মূর্তিরূপে তাঁদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে।[৮] রবীন্দ্রসাহিত্যের দেবলোকে এই 'ইচ্ছাময় মূর্তি'র জয়জয়কার।

রামায়ণ, মহাভারত ও রবীন্দ্রনাথ

ছেলেবেলায় রামায়ণ ও মহাভারত পড়ার কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করতে ভোলেননি। প্রথমে শুধু কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়লেও বাবার সঙ্গে ডালহৌসি পাহাড়ে বেড়াতে বেড়াতে 'বাল্মীকির স্বরচিত অনুষ্টুপ ছন্দের রামায়ণ' পড়ে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তা অবশ্য ঋজুপাঠ গ্রন্থের উদ্ধৃত সামান্য অংশমাত্র। 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'-এ রাম 'নরচন্দ্রমা' নয়, কবির আরোপিত দেবত্বের ফলে 'বিষ্ণুর অবতার'-এ পরিণত হয়েছিলেন। কৃত্তিবাস ওঝা প্রথম থেকেই রামকে প্রেমের দেবতা হিসাবে পাঠক মহলে পরিচিত করে তুলেছিলেন। 'ফুলধনু' হাতে বালক রাম বিচরণ করতেন।[৯] একদিকে ধনুক ও বান যেমন রামের বীরত্বের প্রতীক, অন্যদিকে 'পুষ্পধনু' শব্দটি ভারতীয় পুরাণে প্রেমের দেবতা মদনকে চিহ্নিত করে। 'বালকবীর' রোমান দেবতা কিউপিডের কথা কৃত্তিবাসের জানা ছিল না। কিন্তু শ্রীরামের কন্দর্পকান্তি রূপ এবং প্রেমে পরিপূর্ণ হৃদয়ের ইঙ্গিত দিতে গিয়ে কবি কৃত্তিবাস উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে 'ফুলধনু' প্রসঙ্গটি ব্যবহার করেছিলেন বলা যায়। তাছাড়াও 'শ্রীরামপাঁচালি'র বিভিন্ন অংশে ইতস্তত ছড়িয়ে ছিল বিভিন্ন দেবদেবীর উল্লেখ। তাঁরা সকলেই কিন্তু দেবতা বলে বিশুদ্ধ চরিত্রের ছিলেন না। কৃত্তিবাস ইন্দ্র চরিত্রটিকে 'চতুর' বিশেষণে বিশেষিত করেছিলেন। দশরথ তাঁর পূর্বপুরুষদের প্রতি ইন্দ্রের করা দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন দেবতাদের 'রাজা ইন্দ্রকে বাঁধিয়া আনি।'[১০] নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে চাওয়া এবং দেবরাজ সম্পর্কে রাজা দশরথের এই ঘৃণাবোধ যেমন একদিকে বৈদিক ইন্দ্রের দৈবী মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করে, অন্যদিকে বিষ্ণু ও কৃষ্ণের পৌরাণিক দ্বন্দ্বকে প্রকাশিত করে আশ্চর্য সুন্দর ভঙ্গিতে।

রামায়ণ পাঠের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনাতেই খুঁজে পাওয়া যায়। ১২৮৭ সালে লেখা 'বাল্মীকি প্রতিভা' এবং ১২৮৯ সালে লেখা 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্য দুটিতে রামায়ণের গল্প এবং রামায়ণের শ্লোক পর্যন্ত স্থান পেয়েছে। পরবর্তীকালে 'অহল্যার প্রতি' ('মানসী', ১২৯৭) এবং 'পতিতা' ('কাহিনী', ১৩০৪) নামের দুটি কবিতায় রামায়ণের গল্পকে অবলম্বন করে নিজের মনের

ভাব প্রকাশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু কৃত্তিবাসের মতোই দেবচরিত্রগুলিকে কখনো মানবিক দোষগুণের ঊর্ধ্বে অলৌকিক ভঙ্গিতে দেখতে পারেননি। উপরন্তু মানুষকেই দেবতা হিসেবে গড়ে তোলার ইঙ্গিত আছে তাঁর রচনায়— 'তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দগানে।'[১১] কারণ তিনি চিরাচরিত ভক্তের দৃষ্টিতে কোনোদিন দেবসমাজকে দেখেননি। তিনি জানতেন, কবির 'মনোভূমি' সব সময় অযোধ্যার চেয়ে অনেক বেশি সত্য। রামায়ণের ঘটনার থেকে ভাব রবীন্দ্রসাহিত্যে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। ১৯১৫ সালে রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'সংক্ষিপ্তম্ বাল্মীকীয় রামায়ণম্' গ্রন্থটি তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে রামায়ণের গল্প এবং সেখানকার দেবচরিত্রগুলি রবীন্দ্রসাহিত্যে রূপকের জাল বিস্তার করবে।

বেদব্যাসের লেখা সংস্কৃত মূল মহাভারতের কথা উল্লেখ না করলেও কাশীদাসী মহাভারত যে রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে পড়েছিলেন সেকথা জানা যায় তাঁর নিজেরই নানা মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'অভিলাষ' (১৮৭৪) এবং 'হিন্দুমেলায় উপহার' (১৮১৫)-এ মহাভারতের প্রসঙ্গ গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শুধু 'কাশীদাসী মহাভারত' নয়, কালীপ্রসন্ন সিংহের অনূদিত মহাভারতও তিনি পড়েছিলেন। অবশ্যম্ভাবীভাবে মহাভারতের কাহিনি তাঁর পরবর্তীকালের কিছু রচনাতেও স্থান পাবে। যেমন 'চিত্রাঙ্গদা' (১২৯৯), 'বিদায় অভিশাপ' (১৩০৬), 'নরকবাস' (১৩০৪), 'গান্ধারীর আবেদন' (১৩০৪), 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' (১৩০৬) ইত্যাদি। 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' বইটির ''ইতিহাস'' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মহাভারতকে 'আর্যদের ইতিহাস' হিসাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গীতার্চা ও রবীন্দ্রনাথ

মহাভারতের মুখ্য দেবতা হলেন কৃষ্ণ। উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে কৃষ্ণকে নিয়ে অনেক মনীষী কলম ধরবেন। দেবতা কৃষ্ণের জ্যোতির্ময় রূপের আড়াল থেকে খুঁজে নিয়ে আসবেন কৃষ্ণের মানবিক মূর্তি। কাশীদাস অথবা মধ্যযুগের অন্য কোনো মহাভারত-অনুবাদক কিন্তু কৃষ্ণের দৈবী মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করার কোনো চেষ্টাই করেননি। রবীন্দ্র সাহিত্যে দ্বিভুজ-বংশীধারী প্রেমিক কৃষ্ণ যত অবাধ ক্ষেত্র পেয়েছিলেন, রাজনীতিজ্ঞ, কূটনীতিবিশারদ কৃষ্ণকে সেভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার দেননি রবীন্দ্রনাথ। এর অন্তরালে রয়ে যেতে পারে ছেলেবেলার পাঠচর্চার প্রভাব।

এই সূত্রে আরো একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করা যেতে পারে। সেই প্রসঙ্গটি হল রবীন্দ্রনাথের

গীতাচর্চা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে গীতার প্রচার অত্যন্ত ব্যাপক ছিল। ভারতীয় নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে ভারত-সংস্কৃতির প্রতীক ছিল গীতা। ১৭৯৮ শকের চৈত্র মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত 'ভগবদ্‌গীতা' বিষয়ক বক্তৃতায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন যে সেকালে এমন কোনো ভট্টাচার্য ছিলেন না, যিনি বাংলা পদ্যে গীতার অনুবাদ না করেছেন।[১২] রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি মনীষীরাও গীতার অনুবাদ এবং তার ব্যাখ্যা করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'গীতাপাঠ' (১৩২২), সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা' অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছিলেন ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তিলকের 'গীতারহস্য' গ্রন্থের সযত্ন অনুবাদ করেছিলেন 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা রহস্য' নামে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে। পারিবারিক ও সামাজিক গীতাচর্চার প্রত্যক্ষ প্রভাব এসে পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের ওপর। ফলে দেবতা কৃষ্ণকে গীতাপাঠের আলোকে নতুনভাবে আবিষ্কার করা তাঁর পক্ষে অনিবার্য ঘটনা ছিল।

তবু, প্রথম জীবনের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ 'গীতা'র উল্লেখ সেভাবে করেননি। আসলে 'গীতা'কে নিয়ে হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের মাতামাতি তিনি খুব ভালো চোখে দেখেননি। অনেকপরে 'অলকা' পত্রিকায় ১৩৪৫ আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত 'মুক্তির উপায়' নাটকে একনিষ্ঠ গুরুভক্ত ফকিরের 'গীতাধোয়া জল' খাওয়ার প্রতি ব্যঙ্গের প্রসঙ্গটি প্রমাণ করে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সবরকম ধর্মীয় গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে। আবার, ১৯২৯ সালে লেখা 'যোগাযোগ' উপন্যাসে মধুসূদন কুমুদিনীর দাম্পত্য সঙ্কটের জটিলতার মুহূর্তে সমাধান হিসাবে তিনি অনায়াসে ব্যবহার করেছিলেন গীতার শ্লোক। 'ঘরে-বাইরে' (১৩২৬), 'চার অধ্যায়' (১৩৪৬) উপন্যাস দুটিতেও গীতার অপব্যাখ্যার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের কলম। বোঝা যায়, দেবতা কৃষ্ণের বন্ধু, দার্শনিক এবং পথপ্রদর্শকের ভূমিকাটি সযত্নে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

বৈষ্ণব পদাবলী ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের মনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন প্রেমিক কৃষ্ণ। বৈষ্ণব সাহিত্য পাঠের সূত্রে দেবতা কৃষ্ণের এই বিশেষ রূপটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে লেখা একটি চিঠিতে (১৩২৮ কার্তিক ১৪) তিনি জানিয়েছিলেন যে বৈষ্ণব সাহিত্য ও উপনিষদ বিমিশ্রিত হয়ে তার মনের হাওয়া তৈরি করেছে। নাইট্রোজেনে ও অক্সিজেনে যেমন করে মেশে তেমনি করেই মিশেছে।[১৩] আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি 'মহাজনপদাবলী সংগ্রহ' এবং 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ'-এর

কথা। তাছাড়া অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর উদ্যোগে এবং নিজের আন্তরিক উৎসাহে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলী খুঁটিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর কিশোর বয়স এবং সংবেদনশীল মন দিয়ে তত্ত্বকথার কাঠিন্যকে অতিক্রম করে উপলব্ধি করেছিলেন রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলার তাৎপর্য।

বৈষ্ণব পদাবলীর মুখ্য দেবতা ছিলেন কৃষ্ণ। পদকর্তাদের মতে, 'কৃষ্ণস্তু ভগবানম্ স্বয়ং'[১৪] বৈষ্ণব পদাবলীর চৈতন্যপূর্ববর্তী এবং চৈতন্যপরবর্তী, এই দুটি ধারার কথা সকলেরই জানা। শ্রীচৈতন্যের জন্মের আগে লেখা বৈষ্ণব পদগুলি জীবাত্মা-পরমাত্মা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের প্রাচীরে ঘেরা ছিল। কিন্তু চৈতন্যদেবের জন্মের পর বৈষ্ণব তত্ত্বাচার্যরা গোষ্ঠী রক্ষার তাগিদ থেকেই রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী 'উজ্জ্বলনীলমণি' রচনা করে রাধাকৃষ্ণের প্রণয় সম্পর্ককে যেন এক তত্ত্বের বর্ম পরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই দিক থেকে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি রাধা হলেন 'মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী'।[১৫] 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে রাধাকে বলা হয়েছে 'কৃষ্ণের যোগ্যতম লীলাসঙ্গিনী'।[১৬] 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ কৃষ্ণদাস কবিরাজ রাধাকে বললেন 'কৃষ্ণময়ী'।[১৭] যদিও তত্ত্বের কঠিন আবরণ সৃষ্টি করে বৈষ্ণবরা রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলাকে সব সময় অশ্লীলতার দায় থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, তবু রাধা ও কৃষ্ণের মানবিক আচরণ এবং তাদের উদ্দাম প্রেম তত্ত্বকে উপেক্ষা করেই জনমানসে প্রচলিত হয়েছিল। সাধারণ অশিক্ষিত শ্রোতার কথা বাদ দিলেও রামমোহন রায়ের মতো মনীষীর বিরূপতা প্রমাণ করে, তত্ত্বের আড়ালে থাকা দেবতা কৃষ্ণ তাঁর দেবমূর্তিকে দূরে রেখে দ্বিভুজ বংশীধারী এক যুবকরূপেই বাংলার ঘরে ঘরে আলোচিত হতে শুরু করেছিলেন। পদকর্তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ধর্মপ্রচার এবং তত্ত্বপ্রতিষ্ঠা হলেও বৈষ্ণব পদকর্তারা রাধাকৃষ্ণের চরিত্র নির্মাণ করেছিলেন তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনের সহজ প্রবাহ থেকেই। সেই কারণে বিদ্যাপতির অভিজাত পারিপার্শ্বিকে রাধা অভিজাত সুন্দরী, চণ্ডীদাসের রাধা ছিলেন অন্তর্মুখী সন্ন্যাসিনীর মতো, আবার জ্ঞানদাস বা গোবিন্দদাসের রাধা অনেক সময়ই প্রগল্‌ভা যুবতী।

যাইহোক, বৈষ্ণব পদকর্তারা সেই সময় যদিও তাঁদের পদগুলিতে রাধাচরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেবতত্ত্বটিকে সযত্নে রক্ষা করেই চমৎকার ব্যাখ্যা করেছিলেন, তবু রাধার লৌকিক আচরণে প্রিয়দেবতার বিগ্রহ ভেঙে প্রকাশিত হয়ে যায় কৃষ্ণের 'প্রিয়সখা' রূপটি। তাই, ভালোবাসা আর পূজার গোলক ধাঁধায় সত্যিই বড়ো শক্ত হয়ে যায় কৃষ্ণের দৈবী মাহাত্ম্যের অধরা চালচিত্রের গোপন আড়ালে

সযত্নে রাখা, মানবিক ও বাসনাজর্জর ব্যাকুল মনটিকে উপলব্ধি করা। রাধা ও কৃষ্ণের প্রতি অঙ্গের জন্য প্রতি অঙ্গের আকুল আর্তির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অবশ্যই ছিল। কিন্তু সাধারণ অশিক্ষিত জনমানস সেই তত্ত্ব সাপেক্ষে এই পদগুলি উপভোগ করেছিলেন কিনা তা নিয়ে আমাদের সংশয় আছে।

রবীন্দ্রনাথের মনেও এ সংশয় অবশ্যই ছিল। সেই কারণে ১২৯৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে লেখা 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'বৈষ্ণব কবিতা'য় রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিদের প্রশ্ন করেছিলেন। সত্য করে বলতে বলেছিলেন—

> ...এত প্রেমকথা—
> রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
> চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
> আঁখি হতে![১৮]

যখন নিভৃত অবকাশ পেয়েছেন জীবনে, তখনই অনেক যত্নে কাছে টেনে নিয়েছেন পদাবলী। ১৮৯৩ সালের ৩ মার্চে লেখা 'ছিন্নপত্রবলী'র ৮৬ সংখ্যক চিঠিতে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন অবসর যাপনের জন্য বৈষ্ণব কবির পদ আনেননি বলে।[১৯] 'বৈষ্ণব পদাবলী'র প্রত্যক্ষ প্রভাবে ১৮৮৪ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। তাছাড়াও বিভিন্ন সময় 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' (বঙ্গদর্শন, ১২৮০ পৌষ সংখ্যা), 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' (সমালোচনা), 'বৈষ্ণব কবির গান' (আলোচনা) ইত্যাদি প্রবন্ধ লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩৬ সালে লেখা কবিতাতেও রাধিকার ছবির পিছনে চোখে কাজল পরা, মুখচোরা, নীল শাড়ি পরা একটি মেয়ের কল্পনা করেছিলেন তিনি।[২০] প্রাগাধুনিক এই বিশেষ সাহিত্যটিকে 'অনুকরণ' নয়, 'স্বীকরণ' করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ দেবতা কৃষ্ণও যে রবীন্দ্রনাথের কল্পনার জগতে এক নতুন চালচিত্রে ধরা দেবেন, তার সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতিটি পাতায়।

গীতগোবিন্দম্ ও রবীন্দ্রনাথ

কৃষ্ণ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আরো একটি প্রিয় বই ছিল জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্'। 'হরিস্মরণ' এবং 'বিলাসকলাকুতূহল' এই দুই প্রতিকূলভাব মিলেই 'গীতগোবিন্দম্'-এর মনোহর চালচিত্র রচিত হয়েছিল। আধুনিক যুক্তিবাদী পাঠক কিন্তু কোনো দিনই 'গীতগোবিন্দম্'-এর গূঢ় আধ্যাত্মিক তাৎপর্যকে স্বীকৃতি দেয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র, বলেন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রত্যেকেই একই মত প্রকাশ করেছিলেন। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর তো স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে গীতগোবিন্দে গীত থাকতে পারে, কিন্তু গোবিন্দ আছেন কিনা সন্দেহ।[২১] রবীন্দ্রনাথ কিন্তু জয়দেব বিষয়ে বরাবর কৌতূহলী।

ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে নৌকায় বেড়াতে বেড়াতে একটি অতি পুরানো 'গীতগোবিন্দম্' পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বইটি পড়ে তাঁর মন এতটাই ভরে উঠেছিল যে আগাগোড়া সমস্ত 'গীতগোবিন্দ' একটি খাতায় নকল করে নিয়েছিলেন। এরপর আজীবন বিচিত্র প্রসঙ্গে গীতগোবিন্দের শ্লোক ব্যবহার করবেন রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬), 'চিরকুমার সভা' (১৯২৬), 'শেষরক্ষা' (১৯২৮) ইত্যাদি রচনায় প্রেমের বর্ণনায় বার বার জয়দেবকে স্মরণ করবেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের 'সে' রচনাটিতে মূল চরিত্র বলেছিল যে, 'জয়দেবের ভূত কাঁধে বসে সার্কাস করছে, কানের দখল ছাড়েনি।'[২২] আমরা বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণচর্চার ধারায় জয়দেবের গীতগোবিন্দের ভূমিকা নেহাত কম নয়।

প্রাকৃতপৈঙ্গল, সদুক্তিকর্ণামৃত, সুভাষিত রত্নকোষ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ভোলাশংকর ব্যাস সম্পাদিত 'প্রাকৃতপৈঙ্গলম্' পড়েছিলেন বলে জানা যায়। এই সূত্রে আমরা অনুমান করতে পারি 'আর্যাসপ্তশতী', 'সদুক্তিকর্ণামৃত' এবং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর দেবপ্রসঙ্গগুলিও তাঁর অজানা ছিল না। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' পড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু চর্যাপদের সন্ধ্যাভাষার আড়ালে সেই অর্থে কোনো দেবতা খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং দ্বাদশ শতকে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে দেবদেবীর স্বতস্ফূর্ত উল্লেখ রয়েছে। ভাবলে আশ্চর্য লাগে দেবশাসিত মধ্যযুগের কবিরাও দেবদেবীদের নিয়ে রসিকতা করার স্পর্ধা দেখিয়েছিলেন।

লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন শ্রী গোবর্ধন আচার্য। শৃঙ্গার বিষয়ক শ্লোক রচনা করতেন তিনি। শুধু মর্ত্যমানবের গৃহাঙ্গন নয়, বৈকুণ্ঠে আর কৈলাসেও কবির কল্পনা ডানা মেলেছিল। তাই বিয়ের সময় শিবের অভিব্যক্তির বর্ণনায় মানবিক আবেগ লক্ষ করা যায়। পার্বতীর স্পর্শে রোমাঞ্চিত ভস্মে ঢাকা দেবশরীরকে জয়যুক্ত করা হয়েছে এই কবিতায়। ভস্ম হয়ে যাওয়া মদন যেন তপস্বী শিবের শরীরের রোমাঞ্চ হয়ে আবার জেগে উঠেছিলেন।[২৩] আরেকটি পদে, দেবী লক্ষ্মীকে অনায়াসে গণাঙ্গনার সঙ্গে তুলনা করে বসলেন কবি গোবর্ধন। অথচ, দেবসম্প্রদায়ে তিনি সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বিষ্ণুর ঘরনি। দেবী লক্ষ্মী যে স্বর্গ ও মর্তে শ্রীমান, কদর্য, কৃপণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষকে গ্রহণ করে তাদের সমৃদ্ধ করেন— এই পৌরাণিক সত্যটি কবি দুঃসাহসী একটি শ্লোকে ব্যবহার করলেন।[২৪] কবির হাতে এই দৈবী মাহাত্ম্যের অবনমনকে রসপিপাসু প্রাগাধুনিক সমাজ মেনে নিয়েছিল শিল্পের স্বার্থে।

‘সদুক্তিকর্ণামৃত’ ছিল একটি সংস্কৃত শ্লোক সংকলন গ্রন্থ। লক্ষ্মণ সেনের মহাসামন্ত বটুক দাসের পুত্র শ্রীধর দাস এর সংকলক ছিলেন। চারশ পঁচাশি জন কবির বিচিত্র বিষয়ে দুই হাজার তিনশো সত্তরটি কবিতা সংকলন করা হয়েছিল এই গ্রন্থে। অমরপ্রবাহ, শৃঙ্গারপ্রবাহ, চাটুপ্রবাহ, অপদেশপ্রবাহ এবং উচ্চাবচ প্রবাহ— এই পাঁচটি প্রবাহে সাজানো ছিল ‘সদুক্তিকর্ণামৃত’-এর কবিতাগুলি। এগুলির মধ্যে দেবস্তুতি ছিল ‘অমরপ্রবাহ’ অংশে। দেবস্তুতি, কিন্তু তথাকথিত বৈদিক গাম্ভীর্যে দেবচরিত্রগুলিকে আবৃত করে রাখতে পারেনি। রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদগুলি ছিল প্রাকৃত জীবনের সংরাগে আরক্ত। জলচন্দ্র নামের এক বাঙালি কবির তিপান্নটি শ্লোকের মধ্যে নয়টি শ্লোকে রয়েছে শিবস্তুতি। শৈলরাজার মেয়ে উমার সঙ্গে সাপের মালা পরা মহাদেবের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের বর্ণনাটি অত্যন্ত আকর্ষক। আবার, দেবী দুর্গার বর্ণনায় তাঁর আলতা পরা দুটি পায়ের মধ্যে একটি মহিষের মাথায় এবং অন্যটি প্রণত দেবতাদের মাথার উপর রাখা থাকে।[২৫] তীব্র মানবিক আবেগ এই সকল ক্ষেত্রে যদিও দেবদেবীদের জীবনমুখী করে তুলেছিল, তবু কবিরা তাঁদের প্রণম্য সিদ্ধ মূর্তিকেও শ্রদ্ধার সঙ্গেই মেনে নিয়েছিলেন।

‘প্রাকৃতপৈঙ্গল’ গ্রন্থে কৃষ্ণ লঘু চরিত্রের যুবক। এই কাব্যের ‘নৌকাবিলাস’-এর একটি পদে কৃষ্ণ রাধার অনুরাগ পাওয়ার জন্য টালবাহানা করেন। তাই নিরুপায় রাধা কৃষ্ণকে আত্মসমর্পণের প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়।[২৬] রাধাকৃষ্ণের এই লীলাকে ঘিরে থাকে পল্লীপ্রান্তরের মেঠো সুবাস।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বাঙালি কবির সংকলিত শ্লোকের বই ‘সুভাষিত রত্নকোষ’ বা ‘কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়’। এই বইটিতেও রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ের অনেক কবিতা পাওয়া যায়। এর ‘হরিব্রজ্যা’ অংশে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ ও বামন— দশাবতারের মধ্যে পাঁচটি অবতারের উল্লেখ আছে। বিদ্যাকর বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। ফলে, ‘সুগতব্রজ্যা’র বুদ্ধ বর্ণনায় বুদ্ধের পায়ের কাছে ব্রহ্মা, ঈশ, কৃষ্ণ (বিষ্ণু)— এই তিন ব্রাহ্মণ দেবতার অবনত মূর্তি এঁকেছিলেন।[২৭] অর্থাৎ, রচয়িতার মনস্তত্ত্ব সাহিত্যে দেবদেবীর চরিত্র নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করত। প্রাগাধুনিক সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। এই প্রবণতাই কয়েক যুগ পার হয়ে বিশিষ্ট করবে রবীন্দ্রসাহিত্যে দেবতাভাবনাকে।

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যে কৃষ্ণ ছিলেন স্বয়ং নারায়ণের অবতার।[২৮] কিন্তু, অবতারসুলভ কোনো সদর্থক গুণ তাঁর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর মাথায় ঘোড়াচুল, হাতে মনোহর বাঁশি। বাঁশির সঙ্গে বংশীধারী দৈব অনুষঙ্গ জড়িয়ে থাকে, কিন্তু দেবতার মাথায় ঘোড়াচুল আর যাইহোক মনে তেমন ভক্তিভাব জাগিয়ে তোলে না। কামুক এই দেবতা যখন নির্লজ্জের মতো রাধার রূপ বর্ণনা করে দেহের

প্রতিটি অঙ্গের জন্য প্রতিদান প্রার্থনা করেন, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না প্রাগাধুনিক সাহিত্যে দেবতার ওপর ভর করেছিল অত্যাচারী শোষকের করাল মূর্তি। দেবতাও যেন সমাজের মাৎস্যন্যায় পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছিলেন।

মঙ্গলকাব্য ও রবীন্দ্রনাথ

তুর্কি আক্রমণ যেমন বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছিল তেমনি প্রভাব বিস্তার করেছিল বাংলা সাহিত্যের ওপর। তুর্কি আক্রমণের আগে হিন্দুধর্মগ্রন্থগুলি দেবভাষার অভিজাত, জটিল শব্দের প্রাচীরে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু যুগের প্রয়োজনে, জনমানসে হিন্দুধর্ম এবং দেবদেবীদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করার জন্য একদিকে শুরু হয়েছিল রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের বাংলা অনুবাদ এবং অন্যদিকে সৃষ্টি হল সম্পূর্ণ নতুন এক কাব্যধারা—মঙ্গলকাব্য। বাঙালির মনের অনিশ্চয়তা এবং ভীতির ফলে জন্ম হল সম্পূর্ণ নতুন এক বিশেষ দেবসমাজের। বৈদিক বা পৌরাণিক দেবদেবীদের রাজকীয়, দাম্ভিক আভিজাত্য একেবারেই তাঁদের ঘিরে ছিল না। বরং, এই লৌকিক দেবসমাজকে সৃজন করেছিলেন নিতান্ত সাধারণ মানুষ, তাদের নিত্য জীবনসংগ্রামের গল্পকথা দিয়ে। তাই, চণ্ডী, মনসা, ধর্ম, শীতলার মতো দেবদেবীরা ছিলেন রুক্ষ, কঠিন। সমাজের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তাঁদের দিয়েছিল অসম্ভব জটিল মন। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে মানুষ তাঁদেরকে প্রতিহিংসাপ্রবণ করে গড়ে তুলেছিল। নেহাত প্রায়োজনিক তাগিদে জন্ম নিয়েছিলেন যে দেবদেবীরা, সমাজ তাঁদের চরণে ভক্তিতে নয়, ভয়ে নত হয়েছিল। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে এই শ্রেণির দেবসম্প্রদায়কে 'উৎপাতের দেবতা' বলে মনে করেছিলেন।

অবোধ, ইন্দ্রিয়সর্বস্ব, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসহীন বাংলার মানুষ শুধু প্রাণে বেঁচে থাকতে চাইত। তাই, জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ এবং সর্বত্র সাপের উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতে হঠাৎ করেই এই গ্রামীণ দেবদেবীদের ওপর ভরসা করতে থাকে। এই সুযোগেই মনসা হলেন মহাদেবের কন্যা, জরৎকারু ঋষির পত্নী এবং বাসুকির ভগ্নী। অনার্য ব্যাধের দেবী চণ্ডী শিবের অর্ধাঙ্গিনীর মর্যাদা পেলেন। ধর্মঠাকুর একাকার হয়ে গেলেন কখনো বিষ্ণু, কখনো বুদ্ধ, আবার কখনো শিবের সঙ্গে।[২৯] পারিবারিক ও সামাজিক মঙ্গলসাধনের জন্য লেখা কাব্য, তাই হল 'মঙ্গলকাব্য'। এই কাব্যের কাহিনি এগিয়ে চলে দেবলীলা ও নরলীলার নির্দিষ্ট সোপান পার হয়ে। আরাধনা পেতে উৎসাহী হয়ে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা স্বর্গ থেকেই নির্বাচন করে নিতেন কোনো দেবকুমার অথবা নর্তকীকে। তাঁরা শাপভ্রষ্ট হতে বাধ্য হত। তারপর দারিদ্র্য অথবা দুর্ভাগ্যের যন্ত্রণা সহ্য করার সময় স্বপ্নে দেখা পেতেন দেবতা

বা দেবীর, যিনি প্রলোভিত করতে, ভীতি প্রদর্শন করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হতেন না। কালকেতুর মতো নির্বিবাদী চরিত্রদের নিয়ে কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু চাঁদ সদাগরের দৃপ্ত পৌরুষ যখন দেবদেবীর পূজা প্রচারে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াত, তখনই শুরু হত দেবতা ও মানুষের লড়াই। তখনই সপ্তডিঙা ডুবে যেত, প্রাণ হারাতো নিরপরাধ মানুষ দেবীর ক্রোধ ঝলসে উঠত বিকৃত সময়ের প্রতিনিধি হয়ে।

মঙ্গলকাব্যের দৈবী চরিত্রগুলি কিন্তু দেব মহিমায় ভাস্বর নয়, মানবিক দোষেগুণে ভরা। বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল'-এ শুধু একবার ফুল-জল পাওয়ার জন্য দেবী মনসা সাধারণ এক সওদাগরের অনমনীয় পৌরুষের কাছে নত হন। দেবী চণ্ডী 'সাঁচা মিছা' কথা বলেন।[৩০] দ্বিজ বংশীদাসের মনসা ছিলেন আরো নির্মম। তাই, নীলকণ্ঠ মহাদেবের বিষপানের সংবাদে তিনি প্রকাশ্যে খুশি হন। কারণ, শিব যদি বিষপান করে প্রাণ হারান, তাহলে 'হেমন্ত ঋষির বেটি' চণ্ডিকা 'রাণ্ডিকা' হবেন। তৃপ্ত হবেন মনসা।[৩১]

মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ দেবতার প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেনি মানুষ। ধনঘড়া নিয়ে পাছে পার্বতী পালিয়ে যান, এই ত্রাসে কালকেতু সামনে যেতে যেতেও পিছনে ফিরে চেয়েছিলেন।[৩২] আবার 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর দেবখণ্ডে মহাদেব এবং পার্বতী তাঁদের দৈবী মাহাত্ম্য হারিয়ে সাধারণ গৃহস্থের মতো আচরণ করেন। ঠিক বাঙালি স্বামীর মতোই মহাদেব ফরমাস করেন শুক্তো রাঁধবার জন্য।[৩৩] নিম, সিম, বেগুন, কুমড়ো এবং অবশ্যই কাঁঠালবিচি, ফুলবড়ি দিয়ে হয়তো রান্নাটি দিব্য হয়, কিন্তু হারিয়ে যায় পার্বতী ও মহাদেবের দেবমহিমা। দীর্ঘদিন পিতৃগৃহে থাকা কন্যা গৌরীর প্রতি মা মেনকার রুষ্টভাবও এই কাব্যে প্রকাশ পায়। সখীর সঙ্গে সারাদিন পাশাখেলা আর অলস সময় কাটানোয় শক্তিরূপিনী দেবীও রোষের শিকার হন।[৩৪]

ষোড়শ শতাব্দীতে লেখা হয়েছিল শ্রী রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন'। কাব্যের মূল চরিত্র হতে পারেন দেবাদিবের মহাদেব, কিন্তু কাহিনি ছিল একান্ত মানবিক। না হলে, তপস্বী শিবকে ইন্দ্রের কাছ থেকে ভূমিপাট্টা আর কুবেরের কাছ থেকে বীজধান ধার নিয়ে চাষের কাজ করতে হয় না। তার ওপর অভাবের তাড়নায় ত্রিলোকেশ্বরকে নারদের কাছ থেকে ঢেঁকি চেয়ে নিতে হয়। মধ্যযুগের কবি রামেশ্বর যখন শিব পার্বতীর প্রবল কলহের 'চৌত্রিশা' লেখেন,[৩৫] তখন ঋগ্বেদের দেববন্দনার আদর্শকে আর খুঁজেই পাওয়া যায় না।

দেবদেবীকে মর্ত্যজীবনের প্রাত্যহিক ভূমিতে দাঁড় করিয়ে বিচিত্র ভক্তিতে তাঁদের বন্দনার মধ্য দিয়ে সেই সময়কার দুর্বল মানুষ এক আশ্চর্য ইচ্ছাপূরণ ঘটিয়েছিল। একদিকে তারা এই দেবদেবীদের চারিত্রিক স্খলন দেখিয়ে তাঁদের হাস্যাস্পদ করেছে, অন্যদিকে এই বিচিত্র দেবগোষ্ঠীর পায়ে নত হয়েছে অসম্ভব ভীতিতে। আমাদের মতে, মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী অত্যন্ত জটিল মানসিক কল্পনার বিচিত্র প্রকাশ। তাই, একদিকে তাঁরা সমাজের বিত্তবান, শাসক শ্রেণির প্রতিনিধি, যাঁরা দরিদ্রের ভাগ্যনিয়ন্তা। সেই জন্য তাঁদের অপদস্ত করে পরোক্ষভাবে তৃপ্তি পেয়েছিল সাধারণ মানুষ। আবার, নিজেদের জীবনের ছবি দেবতাদের চরিত্রে প্রকাশিত করে, একই সঙ্গে দেবদেবীদের অধরা জগৎ থেকে নিয়ে এসেছিল তাদের দীন কুটিরে। প্রাগাধুনিক মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা তাই সমাজের এক বিশেষ সময়ের দলিল বলা যেতে পারে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল' নতুন ধরনের মঙ্গলকাব্য। কারণ, দেবতা নয়, মানুষের বেদনাই এই কাব্যের মুখ্য বিষয়। ভারতচন্দ্রই হলেন সেই কবি যিনি তাঁর সৃষ্ট পাটনির কণ্ঠে বসিয়ে দিলেন সহজ জীবনবোধ থেকে ভেসে আসা খুব সত্য সেই উক্তি— 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।'[৩৬] অর্থ নয়, প্রতিপত্তি নয়, মৃতের পুনর্জীবনও নয়— শুধু সন্তানের মঙ্গলকামনার মানবিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল এই কাব্য। তাই কাঠের সেঁউতিকে সোনা করে দেওয়ার মতো জাদু দেবী অন্নপূর্ণা জানলেও তাঁর অলৌকিক মাহাত্ম্যকে ম্লান করে দেয় ঈশ্বরী পাটনির বাৎসল্যে ভরা সহজ মন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে লেখা এই কাব্যটিতে ভারতচন্দ্র তথাকথিত অবনত মস্তকে ভক্ত হিসেবে নিজের পরিচয় দেননি। সেই কারণেই শিব তাঁর আর্যগরিমা হারিয়ে ভারতচন্দ্রের কলমে ব্যঙ্গের পাত্র। দেবী অন্নদাও বেশ ছলনাময়ী। 'বিদ্যাসুন্দর' অংশে তো দেবী কালিকার ভূমিকা বিদ্যা ও সুন্দরের উদ্দাম প্রেমলীলার পাশে নেহাতই ম্লান। শিশিরকুমার দাশ সেই কারণেই মন্তব্য করেছিলেন যে ধর্ম আর দেবতা-ঘেরা সাহিত্যে গোপন সুড়ঙ্গপথ রচনা করতে পেরেছিলেন ভারতচন্দ্র।[৩৭]

রবীন্দ্রনাথের পাঠ্যতালিকার একটি বড়ো জায়গা জুড়ে ছিল মঙ্গলকাব্য। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা কোনো অর্থেই তাঁর মনে সদর্থক প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। 'কালান্তর'-এর 'বাতায়নিকের পত্র' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন যে আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় উচ্ছৃঙ্খলতার সময় ভীত পীড়িত প্রজা নিজেকে কবিদের মুখ দিয়ে শক্তিরই স্তবগান করিয়েছে। কবিকঙ্কন-চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসান প্রকৃতপক্ষে অধর্মেরই জয়গান। এই কাব্যে অন্যায়কারিণী ছলনাময়ী নিষ্ঠুর শক্তির হাতে শিব পরাভূত। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, এই পরাভব গানকেই মঙ্গলগান নাম দেওয়া

হয়েছে।[৩৮] মঙ্গলকাব্যের দেবীদের 'খামখেয়ালী শক্তি' বলতে দ্বিধা করেননি রবীন্দ্রনাথ। তাছাড়া 'স্বর্গীয় প্রহসন' নাটকে আর্য এবং অনার্য দেবদেবীদের দ্বন্দ্বটি হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছিলেন তিনি। রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠক মাত্রই অনুমান করে নিতে পারেন রবীন্দ্রনাথের মানসিক ঝোঁকটি ছিল আর্য দেবসম্প্রদায়ের প্রতি।

শাক্ত পদাবলী ও রবীন্দ্রনাথ

ভয় থেকে যেমন জেগে উঠেছিলেন মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা, তেমনি মানুষের মনের বরাভয় থেকে আত্মপ্রকাশ করেলেন বাঙালির ঘরের মেয়ে উমা। সপ্তদশ শতক থেকেই বাঙালির সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে আবার পালাবদল শুরু হয়ে গিয়েছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শুধুমাত্র সম্পদ লুঠ করার জন্য বিদেশি বণিকদের আনাগোনা চলছিল। তাদের হাতের বাণিজ্যিক তুলাদণ্ড স্বৈরাচারী রাজদণ্ডে পরিণত হতে সময় নেয়নি বেশি। তার ওপর স্থানীয় জমিদার ও শাসনকর্তাদের দাপটে, মারী ও মন্বন্তরের বর্গি ও জলদস্যুদের অত্যাচারে বিপর্যস্ত বাঙালি বিপন্ন বোধ করেছিল। তাই তাঁরা কোনো পরাক্রান্ত মহাশক্তির কৃপা ও অনুগ্রহ কামনা করেছিল।

তন্ত্রের মূল নারীশক্তি তখন বাঙালির ঘরের মেয়ে উমা রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডী আখ্যান ও তত্ত্ব এবং বহু প্রচলিত হরপার্বতীর গার্হস্থ্য জীবনের গল্পকথা মিলেমিশে তৈরি করেছিল শাক্তপদগুলি। একদিকে তন্ত্রসাধনার গূঢ় তাৎপর্য প্রতীকের মধ্য দিয়ে পদগুলিতে প্রকাশিত হয়, আবার অন্যদিকে অকলঙ্ক শশীর মতো উমা পুরোদস্তুর বাঙালির প্রিয়জন হয়ে ওঠেন। 'শাক্ত পদাবলী'র আগমনী ও বিজয়া পর্যায়ের পদগুলিতে শিব-দুর্গার দৈবী স্বরূপের তুলনায় বাঙালি সুলভ দাম্পত্য জীবনের মাধুর্যই বেশি প্রকট ছিল।

মা মেনকার বাৎসল্যে ভরা স্নেহদৃষ্টিতে উমা সদাসর্বদা মায়ের স্নেহের পুতুল। মনে পড়ে যেতে পারে মালাধর বসুর লেখা 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর প্রসঙ্গ যেখানে মা যশোদার আদরের ধন কৃষ্ণ। তিনি 'ভাত খায়্যা' আবার মগ্ন হয়ে যান বালক সুলভ নৃত্য ক্রীড়ায়।[৩৯] বাঙালি শিশুর মতোই মাথায় 'সিকা' খসিয়ে সর্বশক্তিমান নারায়ণ যখন যমুনার তীরে ভাত খেতে বসেন, তখন আর তাঁর বৈকুণ্ঠলীলার কথা পাঠক মনে রাখতে পারেন না, প্রাগাধুনিক কবি বৈকুণ্ঠকেই নামিয়ে আনেন মর্ত্যমানুষের দরিদ্র কুটিরে।

মা মেনকাও কখনো উমার গায়ের রঙ নিয়ে চিন্তিত, কখনো বা আদরের মেয়ের বসন-ভূষণহীন ভিখারিণী রূপ স্বপ্নে দেখে মেনকার মন তটস্থ হয়ে যায়।[৪০] কমলাকান্তের একটি পদে 'দিগম্বর'কে

কন্যা সমর্পণ করে মা মেনকার বেদনার শেষ নেই। তাই, শ্মশানবাসী জামাইয়ের হাত থেকে মেয়েকে বাঁচাতে গেলে তাঁকে পিত্রালয়ে, নিয়ে আসা উচিত— এই ছিল মেনকার অভিমত। এই পদটিতে শিবের দেবত্ব নয়, চিতা-ছাই-মাখা ভিখারি মূর্তিই প্রকাশিত হয়েছে। দাশরথী রায়ের লেখা একটি পদে 'গণেশজননী' উমার মাতৃমূর্তি প্রধান হয়ে যায়।[৪১] রামপ্রসাদ সেন তাঁর লেখা একটি পদে মৃত্যুঞ্জয় শিবের সঙ্গে মেনকার প্রবল কলহের উপক্রম করিয়েছিলেন।

এই যে দেবদেবীদের স্বর্গের উচ্চতা থেকে নামিয়ে এনে মাটির পৃথিবীতে পুনঃসৃজন, তা যে কেবল সাহিত্যের প্রয়োজনেই সম্ভব হয়েছিল তা নয়। আসলে, ঋগ্বেদের বিস্ময়বোধ পার হয়ে, পুরাণের যুগ অতিক্রম করে, লৌকিক দেবদেবীদের নতুন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দেবদেবীরা ধীরে ধীরে বাঙালি মনের কাছাকাছি চলে আসেন। সেই কারণে, দেবদেবীকে পূজার অর্ঘ্য নিবেদনের পাশাপাশি তাঁদের নিয়ে রঙ্গপরিহাস ও ইচ্ছাপূরণের সাহিত্যরস অব্যাহত রেখেছিল সাধারণ মানুষ।

তাছাড়া, শাক্তকবিদের দেবী কিন্তু ইহলোকের উন্নতির আশ্বাসপত্র নিয়ে এসে দাঁড়াননি। ভক্তের বাম হাতে নিক্ষিপ্ত পূজার ফুলের জন্যও কাঙালপণ করেননি। তিনি ভক্তের ঘর সোনাদানায় ভরিয়ে না দিলেও অন্তত অন্নজলের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটিয়েছিলেন। শাস্ত্রনির্ভর আচার-সর্বস্বতার শৃঙ্খল থেকে শাক্তপদগুলি সব সময় মুক্ত ছিল। রামপ্রসাদের পদগুলি সম্পর্কে এই অভিমত আরো বেশি করে প্রাসঙ্গিক। দেবতা ও মানুষের মধ্যে তিনি ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ শাক্তপদ, বিশেষ করে রামপ্রসাদের পদ পড়েছিলেন বলে জানা যায়। পরবর্তীকালে তাঁর সাহিত্যে গিরিগুহাবাসিনী উমার রূপকল্প পুনরাবৃত্ত হবে বিচিত্র প্রসঙ্গে। 'লোকসাহিত্য' বইটির অন্তর্গত ''গ্রাম্যসাহিত্য'' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ হর-গৌরী সম্পর্কিত গ্রাম্য ছড়াই যে শাক্ত পদাবলীর ভিত্তি, একথা বলেছিলেন। বাংলাদেশের গ্রাম্য কুটিরের প্রাত্যহিক দৈন্য ও ক্ষুদ্রতার এক তির্যক প্রতিফলন শাক্তপদগুলিতে লক্ষ করা যায়। তাঁর মতে, এখানে কৈলাস ও হিমালয়কে বাঙালির পানাপুকুরের ঘাটের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল।[৪২]

নবজাগরণের পটভূমিতে বাঙালির দেবসংস্কার

এরপর বাংলাসাহিত্যে অন্ধ বিশ্বাসের ঠুনকো নির্মোক খসে যাবে। বাংলা সাহিত্যে নতুন প্রতিষ্ঠা হবে যুক্তির শাণিত ক্ষেত্রে। এক সময়ের প্রবল প্রতাপশালী দেবতাদের শিল্পের প্রয়োজন ইচ্ছামতো ব্যবহার করবেন বাংলার সাহিত্যিকরা। আমরাও লক্ষ করব বাংলা সাহিত্যে দেবতাভাবনার নতুন আঙ্গিক।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রচ্ছন্ন ছিল দৈবনিয়ন্ত্রণ। সেই সময় ধর্ম ও দেবতার প্রচলিত এবং সিদ্ধ অবয়বকে পরিবর্তনের কোনো চেষ্টা করেননি বাংলা সাহিত্যের কোনো লেখক। অবশ্য, ধর্মনিয়ন্ত্রিত প্রাগাধুনিক সমাজ সাহিত্য রচয়িতাদের সেই স্বাধীনতা থেকে রীতিমতো বঞ্চিত করে রেখেছিল। কিন্তু উনিশ শতকের নবজাগরণের সময় মানুষ নিজের মনের বন্ধ জানালাগুলি একে একে খুলে দিতে লাগল। পাশ্চাত্য শিক্ষার নতুন আলোয়, কুসংস্কারের অন্ধকার পার হয়ে মানুষ নিজের গুরুত্ব উপলব্ধি করল। প্রতীচ্য শিক্ষার সঙ্গে ঘটল প্রাচ্য ভাবাদর্শের সহজ মেলবন্ধন। বাংলা সাহিত্যে চোখে পড়ল এক মহৎ পরিবর্তন। বাঙালি লেখকরা আর কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হয়ে সাহিত্য রচনা করলেন না। উনিশ শতকের সাহিত্যে বেজে উঠল নতুন সুর। লেখকের নিজস্ব বিশ্বাস এবং ব্যক্তিগত অনুভূতির আলোয় দেবতারাও লাভ করলেন নতুন রূপ।

রবীন্দ্রপূর্ব এবং রবীন্দ্রসমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে দেবচর্চার ইতিহাস আলোচনা করার আগে উনিশ শতকের বাঙালি মননে দেবতা ভাবনার দিকটি জেনে নেওয়া ভালো। কলকাতাকে কেন্দ্র করেই উনিশ শতকের বাংলাদেশের চিন্তার পৃথিবীতে এক প্রবল আলোড়ন তৈরি হয়েছিল। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। একদিকে ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা তথা অন্যান্য ভারতীয় ভাষা শিক্ষা যেমন এই কলেজের উদ্দেশ্য ছিল, তেমনি হিন্দুসমাজ ও ধর্মের প্রতি আক্রমণ যেন মিশনারি সম্প্রদায়ের লক্ষ্য হয়ে পড়েছিল। তাই, তাঁরা কখনো দলবদ্ধভাবে হিন্দুসমাজকে আক্রমণ করতেন, আবার কখনো দরিদ্র, নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বলপ্রয়োগ করে তাদের ধর্মান্তরিত করতেন। ইংরেজি শিক্ষা বাঙালির সামনে এনে দিয়েছিল রুশো, বেন্থাম, মিল, ভলতেয়ারদের উদার চিন্তার পৃথিবী। আবার, এই সময় রাজা রামমোহন রায়ও তথাকথিত প্রাচীন হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে অজস্র প্রশ্ন তুলেছিলেন। উপনিষদ ও বেদান্তের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন ব্রহ্মতত্ত্বের দিকে। তাছাড়া, পাটনায় উলেমা সম্প্রদায় ও সুফি সাধকদের সঙ্গে পরিচিতির সূত্রে রামমোহন একেশ্বরবাদের সম্পর্কে বিশেষ মনোযোগী হন। হিন্দু সংস্কৃতির বহুদেববাদ-এর মূর্তি পূজার প্রবল বিরোধিতা করেন এবং নিজেই পরিণত হন একেশ্বরবাদী এক প্রতিষ্ঠানে। ১৮১৫ সাল নাগাদ প্রকাশিত হয় তাঁর বেদান্তের অনুবাদ ও ভাষ্য। ঐ বছরই প্রতিষ্ঠিত করেন 'আত্মীয় সভা', যার উদ্দেশ্য ছিল মূর্তিপূজার বিরোধিতা ও একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা। হিন্দুধর্মের ইতিহাসে এ ছিল এক প্রবল আলোড়ন। গোঁড়া হিন্দু সমাজের অনেক বিরোধিতা সত্ত্বেও রামমোহন নিজের বিশ্বাসে অবিচল ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'চারিত্রপূজা' বইটিতে ''রামমোহন রায়'' প্রবন্ধে (পৌষ, ১৩৪০) বলেছিলেন যে

যেদিন বাংলাদেশে প্রগাঢ় অন্ধতা কৃত্রিমতা, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার মধ্যে রামমোহন রায়ের আগমন হল সেদিন এই বিমুখ দেশে তিনিই একলা ভারতের নিত্য পরিচয় বহন করে এসেছেন।[৪৩]

রামমোহনের পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়ে ওঠেন ব্রাহ্মসমাজের নতুন পুরোধা। অনেক পরে কেশবচন্দ্র যদিও রামমোহন এবং দেবেন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ থেকে সরে এসে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নামে নতুন সম্প্রদায় সৃজন করবেন, তবু তিনিও নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজকে উদ্দীপ্ত করেছিলেন, এই বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে আরেকজন মনীষীর উল্লেখ করতেই হয়। তিনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর দৃপ্ত ভঙ্গিতে আঘাত করেছিলেন হিন্দু সমাজের দেবনির্ভর মৃতপ্রায়, অন্ধ কুসংস্কারের মূলে।

ফলে, উনিশ শতকের মানুষের দেববিশ্বাসের অটল প্রাচীরে সামান্য হলেও ফাটল ধরতে শুরু করেছিল। তাছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে আচারসর্বস্ব হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রবেশ করেছিল বিকৃতি। সেই কারণে চড়ক হোক বা দুর্গাপুজো বাঙালির কাছে সবই ছিল ফুর্তির মহোৎসব। দুর্গাপূজার তিন দিন যে 'পাপের স্রোত' প্রবাহিত হত, 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় তার সাক্ষ্য রয়ে গিয়েছে। কালীপ্রসন্ন সিংহের মতো গোঁড়া হিন্দুও 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় এই হুজুগের পুজোর নিন্দা করেছিলেন।[৪৪]

তখন ধর্মের এই বাহ্যিক আড়ম্বর সত্যিই মানুষের মনকে দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলেছিল। তারই সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের উত্থান বাঙালি মনে দেবদেবীদের সম্পর্কে অটল ভক্তিবোধকে দুর্বল করে তুলতে পেরেছিল। ঐ সঙ্কটময় পরিস্থিতি অদ্ভুত এক প্রহসনের মতোই গড়িয়ে চলেছিল মন্থর গতিতে। এই প্রহসনের সুযোগ নিয়েই মার্শম্যান, ফরসাইথ প্রমুখ খ্রিস্টান মিশনারিরা শতমুখে হিন্দুদেবদেবীদের নিন্দা করতে শুরু করলেন। হিন্দুধর্মের বিষয়ে আলোচনা করার সময় সাধারণ সৌজন্যের রীতিটুকুও অনুসরণ করতেন না বিদেশি সমালোচকরা।

শোনা যায়, 'দি মিশনারি স্কেচেস'-এ হিন্দুধর্ম ও দেবদেবীকে বিকৃত ভাবে উপস্থাপিত করা হত। 'ধর্ম অবতার' নামের একটি ট্র্যাক্টে হিন্দু দেবদেবীদের প্রায় অপরাধীর কাঠগোড়ায় দাঁড় করানো হয়েছিল। ১৮৩৯ সালে আলেকজাণ্ডার ডাফ্ 'ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইন্ডিয়া মিশনস্' গ্রন্থে 'হিন্দুধর্ম'কে 'মিথ্যাধর্ম' বলে বসলেন।[৪৫] তিনিও হিন্দু দেবদেবী সম্পর্কে অশ্রদ্ধেয় মন্তব্য করেন, বিশেষ করে কালীর রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে।

আমাদের আলোচনার সূচিমুখ হল দেবনির্ভর বাংলাসাহিত্য। সেই জন্য আলোচনার লক্ষ্যে বক্তব্য কেন্দ্রীভূত করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে আসবে কবিগানের অনুষঙ্গ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই গান ছিল বাঙালির জনপ্রিয়তম সাহিত্য সংরূপ। এই কবিগানেরই একটি ধরা ছিল দেবদেবীর লীলাকথায় পরিপূর্ণ। গোজলা গুঁই, রঘুনাথ দাস, হরু ঠাকুর, ভবানী বেনে, ভোলা ময়রাদের কবিকৃতি এই কবিরা। যেমন, সতীন গঙ্গা সম্পর্কে দুর্গা যখন উষ্মা প্রকাশ করেন, যখন শিবের মাথায় উড়ে এসে জুড়ে বসা এই সতীনকে 'মাগী' সম্বোধন করেন, তখন নিশ্চিত ভাবে মনে হয় কবিগানের এই বহুচর্চিত বিষয়গুলিতে দেবপ্রসঙ্গ থাকলেও তা একান্ত ভাবে উনিশ শতকের এক শ্রেণির মানুষের বিকৃত ভাবনার সহজ প্রকাশ মাত্র।

ঠাকুরবাড়ির উৎসব অনুষ্ঠানে কবিগানের আসর বসত। ফলে খুব কাছের থেকে রবীন্দ্রনাথ এই গানগুলি শুনেছেন। পরে 'লোকসাহিত্য' বইয়ের ''কবি সংগীত'' প্রবন্ধে কবিগান সম্পর্কে নিজস্ব মতামত প্রকাশও করেছিলেন।[৪৬] সর্বসাধারণের জন্য গাওয়া হত বলে এই গানগুলির মধ্যে যে ভাবের গাঢ়তা এবং গঠনের পারিপাট্য ছিল না এবং এই গানগুলি যে 'হঠাৎ রাজার সভার উপযুক্ত গান'[৪৭] সেই দিকটি লক্ষ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কলঙ্ক এবং ছলনাই ছিল কবিওয়ালাদের গানের প্রধান বিষয়। এই উদ্দেশ্যে দেবচরিত্রগুলির চরিত্রের অবনমন ঘটাতেও তাঁরা দ্বিধা করেননি। দেবতাদের সিদ্ধ রূপ ভেঙে তাদের অন্য নতুন রূপ দেওয়ার এই ভঙ্গিটি রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করে থাকতে পারেন।

উনিশ শতক ছিল হিন্দু দেবদেবীদের জন্য বেশ কঠিন সময়। জনমানসে তাঁদের মাহাত্ম্য ক্ষীণ করার জন্য তখন একের পর এক প্রকাশিত হয়ে চলেছিল বাংলা খ্রিস্টসাহিত্য। এই সাহিত্যগুলি প্রকাশ করাই হয়েছিল হিন্দু দেবদেবীদের সম্পর্কে কুৎসা প্রচার করার জন্য। ১৮৪৩ সালে লেখা 'মঙ্গলোপাখ্যান পত্র'-এ স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে হিন্দুরা দেবপূজার মতো মহাপাপে দোষী। আবার, 'ত্রাণোপায়' নামের একটি পদ্যে সুললিত পয়ার ছন্দে হিন্দুদের জন্য একটি বিধি নির্দিষ্ট করা হয়েছিল— 'এখন ছাড় দেবদেবী সকল ঘৃণিত জানিয়া।' সমাজের গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ গিরি, লালবিহারী দে, রাধানাথ শীল প্রমুখ বিশিষ্ট বাঙালিরাও খ্রিস্টসাহিত্য রচনা করেছিলেন। হিন্দুধর্ম ও হিন্দু দেবীদের উদ্দেশে অপমানজনক মন্তব্যগুলি যে 'সহিষ্ণুতার সীমা বহির্ভূত ছিল', 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় ১ চৈত্র, ১৭৬৬ শকাব্দের প্রতিবেদনটি অন্তত সেই কথাই বলে।

এর পাশাপাশি রামমোহন রায়ের লেখা ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি রুচিবোধের দিক থেকে অনন্য হলেও হিন্দু বহুদেববাদের বিশ্বাসের ভূমিতে স্থায়ী ভাঙন ধরানোর জন্য ছিল যথেষ্ট। রামগতি ন্যায়রত্ন এই ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি সম্পর্কেই বলেছিলেন যে এই সঙ্গীত পাষাণকেও আর্দ্র, পাষণ্ডকেও ঈশ্বরানুরক্ত ও বিষয়মগ্ন মনকেও উদাসীন করে তুলতে পারে।[৪৮] এই সময় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'ব্রাহ্মধর্ম', অক্ষয়কুমার দত্তের 'ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তিভূমি' ইত্যাদি বই হিন্দুদেবদেবীদের প্রবল প্রতিপত্তি ম্লান করতেই সাহায্য করেছিল। রামগোপাল রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, নীলরত্ন হালদার, কৃষ্ণচন্দ্র বসু, নারায়ণ ভট্টাচার্য প্রমুখ লেখকরা সাকার উপাসনার প্রসঙ্গে দেবদেবীদের তথাকথিত মাহাত্ম্যের প্রতিকূলেই নিজেদের মত রেখেছিলেন। এই প্রসঙ্গে খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্রজমোহন দেবের লেখা 'পৌত্তলিক প্রবোধ' বইটি। এখানে 'পুত্তলিকার উপাসনা'কে নিন্দা করা হয়েছে এক প্রাজ্ঞ পৌত্তলিকের কথোপকথনের ভঙ্গিতে। উপাস্য দেবতাকে বস্ত্রে, অলঙ্কারে, পুষ্পে, আহারে সমৃদ্ধ করে যে পূজা তাকে খেলা মাত্র মনে করেছিলেন লেখক।[৪৯] আদর্শের দিক থেকে খ্রিস্টান মিশনারিদের ভিন্ন পথের পথিক হলেও ব্রাহ্ম লেখকদের লেখাতেও শোনা যেত একই সুর— 'পুত্তলিকার খেলা ত্যাগ।'

রক্ষণশীল বাঙালি ব্রাহ্মণ্য সমাজ যদিও তাঁদের প্রাচীন রক্ষণশীলতার স্বার্থে খ্রিস্টান মিশনারি এবং ব্রাহ্মদের বিরোধিতায় সরব হয়ে উঠেছিলেন, তবু জোরালো কোনো সাহিত্যিক নিদর্শন তাঁরা জনমানসে তুলে ধরতে পারেননি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা 'বাসুদেবচরিত'-এর মতো বলিষ্ঠ রচনা হিন্দু রক্ষণশীলদের কলম থেকে নিঃসৃত হয়নি বললেই চলে। প্রাচীন গ্রন্থগুলির পুনর্মুদ্রণ এবং হিন্দু তীর্থস্থানের মাহাত্ম্যকীর্তনের মাধ্যমে আর কতটুকুই বা জোরালো প্রতিবাদ সম্ভব ছিল? 'ধর্মসভা'র সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আবার পরম নিষ্ঠার বইগুলি তুলোট কাগজে ব্রাহ্মণ কম্পোজিটরকে দিয়ে মুদ্রিত করে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন বলে ভেবেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের শানিত যুক্তির পাশে 'অষ্টোত্তর শতনাম', 'গঙ্গা মাহাত্ম্য', 'শিবস্তব', 'কালী কৈবল্যদায়িনী', 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী' বা 'হরিভক্তি রসামৃত'— এর মতো রচনাগুলি মেধাহীন, নিষ্প্রভ অন্ধকারে আরো নির্বাসন দিয়ে দিল হিন্দুদের এককালের একমাত্র অবলম্বন দেবদেবীদের।

মধুসূদন দত্ত ও রবীন্দ্রনাথ

দেবনির্ভর বাঙালি মনের ঠিক প্রতিকূল স্রোতে গা ভাসিয়েছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্ররা। তাঁরা তাঁদের বুদ্ধির দীপ্তিতে, শাণিত যুক্তিবোধের সাহায্যে প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের জড়ত্ব, তারপর হঠাৎ করেই হিন্দুধর্মকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করলেন। হিন্দু কলেজকে কেন্দ্র

করে যে নতুন আলোর যুগ এসেছিল, তার পথপ্রদর্শক ছিলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। তাঁর অনুগামীরা ছিলেন 'ইয়ং বেঙ্গল'। বাংলায় 'কৃশ্চানি হুজুগ' বা ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল 'ইয়ং বেঙ্গল' এবং হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাঁদের চরম প্রতিবাদী ভাবাদর্শ। 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'-এর সভা এবং আলেকজাণ্ডার ডাফের বাড়িতে বসা আলোচনা সভায় হিন্দু কলেজের ছাত্রদের আনাগোনা ছিল। হিন্দু কলেজের ছাত্র মাধবচন্দ্র মল্লিকের মতো প্রকাশ্যে ঘোষণা না করলেও ইয়ং বেঙ্গলদের মধ্যে অনেকেই হিন্দুধর্মকে পৃথিবীর সবচেয়ে ঘৃণ্যবস্তু বলে ভাবতে শুরু করেছিলেন। হিন্দু কলেজের জনৈক ছাত্র সম্পর্কেই শোনা যায় কালীঘাটে গিয়ে দেবীপ্রতিমাকে 'গুড মর্নিং ম্যাডাম' বলার মতো কৌতূকপূর্ণ ঘটনাটি।[৫০] তারপর মহেশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপীনাথ নন্দী, উমেশচন্দ্র সরকার খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করায় হিন্দু পৌত্তলিক ধর্মকে গুরুত্বহীন ভাবতে শুরু করেন উনিশ শতকের তরুণ সম্প্রদায়। মধ্যযুগের অন্ধ দৈবনির্ভরতার ঠিক প্রতিকূলে বাঙালি শুরু করল এক নতুন সাহিত্যসাধনা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুরাণের যথার্থ মেলবন্ধনে বাংলা সাহিত্যের পৃথিবীতে আবার জন্ম নিলেন নতুন দেবসম্প্রদায়। এই পর্বের শুভ উদ্বোধন করলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। একদা হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং এক ধর্মান্তরিত হিন্দু মধুসূদন দত্তকে বাংলা রেনেসাঁসের প্রথম কবি বলে মনে করতে চেয়েছিলেন শিশিরকুমার দাশ।[৫১] বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের অকারণ অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করে পৌরাণিক বন্ধনমুক্ত নতুন ধারার সৃজন মাইকেল মধুসূদনই করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের পাঠ্যতালিকায় যে 'মেঘনাদবধ কাব্য'টি ছিল, তার উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিচারণায় বারবার করেছেন। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে মধুসূদনের যে সম্পর্ক ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের ভগ্নিপতি সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিশেষ আলাপ পরিচয় ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিচারণেও উঠে আসে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'র পাণ্ডুলিপি পাঠের স্মৃতি। রবীন্দ্রনাথের জন্মের আগেই প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল 'মেঘনাদবধ কাব্য'র দুটি খণ্ড। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' এবং 'কৃষ্ণকুমারী', 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্য ও নাটকগুলি কোনোটি নেহাত তাঁর শিশুকালে এবং কোনোটি তাঁর জন্মের আগে প্রকাশিত হয়েছিল। মধুসূদন যখন মারা যান, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র বারো। ফলে, দুই কবির মধ্যে ব্যক্তিগত কোনো ভাব বিনিময় যে হয়নি, সেকথা অনুমান করে নেওয়া যায়। লেখাপড়া চর্চার মধ্য দিয়ে মধুসূদনের ও রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয়।

যদিও মাইকেল মধুসূদন ছিলেন উনিশ শতকের ইয়ং বেঙ্গলদের যথাযথ উত্তরসূরি, তবু প্রাচ্য সংস্কারও তাঁর মনের গভীরে শিকড় মেলেছিল। ছেলেবেলায় মায়ের কাছে রামায়ণ, মহাভারত,

কবিকঙ্কন-চণ্ডী পড়তেন তিনি। বিজয়া সঙ্গীত তাঁর খুব প্রিয় ছিল। ব্যারিস্টারি করার সময় আইনি, পরামর্শ নিতে আসা এক ব্রাহ্মণের কাছে 'সখীসংবাদ' শুনতেন— এমন কথাও শোনা যায়। হিন্দু কলেজের পাশ্চাত্যমুখী শিক্ষার প্রভাবে শ্রী মধুসূদন কেমন করে মাইকেল মধুসূদন হয়ে উঠেছিলেন, সেই গল্প সকলের জানা। এই পরিবর্তন উনিশ শতকের পটভূমিতে এক আকস্মিক, কিন্তু প্রত্যাশিত ঘটনা ছিল। এক সময় রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠিতে জোর গলায় বলেছিলেন—"...I don't care a pin's head for Hinduism..."[৫২] কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাহিত্য জগতেও একে একে ভিড় জমিয়েছিলেন হিন্দু দেবদেবীরা, অবশ্যই নতুন ভাবে, নতুন ভঙ্গিতে।

১৮৪৯ সালে মাদ্রাজে থাকাকালীন দুটি দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন মধুসূদন— 'The Captive Lady' এবং 'Vision of the Past', একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'The Anglo Saxon and the Hindu' নামে। এই তিনটি রচনার ভিত্তিই ছিল হিন্দু পুরাণ। এই সময়ই তিনি গৌরদাস বসাকের কাছ থেকে শ্রীরামপুর সংস্করণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীদাসী মহাভারত চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। এরই পাশাপাশি চালিয়ে যাচ্ছিলেন হিব্রু, ল্যাটিন, গ্রিক, তেলেগু ইত্যাদি ভাষা এবং সংস্কৃত ভাষার চর্চা। এই বহুপাঠের প্রভাব পড়েছিল তাঁর সাহিত্য সাধনায়।

অন্তরের ভক্তি নয়, ব্যক্তিগত আবেগের প্রেরণায় মধুসূদন তাঁর সাহিত্যের দেবচরিত্রগুলি সৃজন করেছিলেন। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'-র প্রসঙ্গে তিনি অনায়াসে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন : 'I despise Ram and his rabble'।[৫৩] আবার, রাধা তাঁর কাছে ছিলেন 'poor lady of Braja'।[৫৪] 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' (১৮৬০) রচনার কয়েক মাস পরে, রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে কল্পনাপ্রবণ মানুষ মাত্রেই হিন্দুপুরাণের নবসৃজন করতে পারবেন।

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনই প্রথম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধনে অভিনব দেবচরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন। দেবী সরস্বতী মধুসূদনের দেবকল্পনার একটি আদর্শ নিদর্শন। ১৮৬৬ সালে লেখা 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র বেশ কিছু সনেটে সরস্বতীকে 'ভারতী' বলে সম্বোধন করেছিলেন মধুসূদন। এই কাব্যের ৩৮ সংখ্যক সনেটে 'কল্পনা'কে বলেছেন বাগ্দেবীর 'প্রিয়সহচরী'। ফরাসি দেশের ভার্সাই শহরে থাকার সময় এই সনেটগুলি রচনা করেছিলেন মধুসূদন। প্রবাসে থাকার মুহূর্তে তাঁর জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং দেশজননীকে অনায়াসে মিলিয়ে দিতে পেরেছিল তাঁর কবিকল্পনা। 'বিশ্ববিনোদিনী' সরস্বতীর মোহিনী মূর্তিও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মধুসূদনের কাব্যে। ব্রহ্মা ও সরস্বতীর প্রণয় সম্পর্ক ইঙ্গিতে

কবিতায় ব্যবহার করেছিলেন মধুসূদন দত্ত।[৫৫] এর পাশাপাশি স্বর্ণবীণার ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে পুরাণের শুভ্রা সরস্বতীর সঙ্গে মিলে যায় গ্রিক সঙ্গীতের দেবতা অ্যাপোলো, যাঁর হাতে থাকে স্বর্ণবীণা। ভারতীয় পুরাণের দেবী সরস্বতীর সঙ্গে দৈববাণীর কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু মধুসূদন 'মেঘনাদবধ কাব্য-এ 'আকাশসম্ভবা সরস্বতী'র[৫৬] কথা লিখলেন। এই দেবীর চোখ দিয়েই রামচন্দ্র ভবিষ্যৎ দেখবেন। আকাশদেশে সরস্বতীর 'মধুর নিদান'ই[৫৭] যে দৈববাণী, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রথম সর্গে দেবী সরস্বতীর ভূমিকা কথক-এর। অতীতেও বিস্তৃত থাকে তাঁর স্মৃতি। গ্রিক পুরাণের নয় জন মিউজ[৫৮] ছিলেন স্মরণশক্তির দেবী নিমোসিনি এবং দেবরাজ জিউসের মেয়ে। মায়ের সূত্রে এই নয় জন মিউজ পেয়েছিলেন স্মৃতির উত্তরাধিকার।[৫৯] মিউজদের সংস্কারও মিশে থাকে মধুসূদনের সরস্বতী কল্পনার আড়ালে। তাঁর সাহিত্যে সরস্বতীর নখদর্পণে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। কৃষ্ণাঙ্গ মধুসূদন আশৈশব নীলনয়না, বিদেশিনী, শুভ্রা সঙ্গিনীর স্বপ্ন দেখে এসেছেন। রেবেকা ও হেনরিয়েটার সান্নিধ্য পেয়েও ছিলেন তিনি। উনিশ শতকের প্রতিটি যুবকই তখন মনে মনে স্বপ্ন দেখতো 'Enlightened Partner'[৬০]-এর। ভারতীয় পুরাণে একমাত্র সরস্বতীই হলেন শুভ্র সৌন্দর্যের অধিকারিনী। সেই শুভ্র সৌন্দর্যও ছিল মধুসূদনের তাঁর প্রতি আকর্ষণের কারণ। জ্ঞান ও সৌন্দর্যের সহজ সম্মিলনে সেই কারণেই তিনি ছিলেন মধুসূদনের কাব্যের প্রেরণাদায়িনী দেবী।

প্রেমের দেবতা মদন মধুসূদনের সাহিত্যে একটি নতুন নাম পেয়েছিলেন— 'কামব্যাধ'।[৬১] শর্মিষ্ঠা নাটকের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে রাজা যযাতি মদনকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন যে 'হরকোপানলে' মদন নিজে ভস্ম হয়েছিলেন বলেই তিনি মানবজাতিকে এইভাবে দগ্ধ করেন।[৬২] এই প্রতিহিংসার ইঙ্গিতে মদনের দৈবী মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়, সন্দেহ নেই। 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ এই মদনভস্মের ঘটনাটিকে নিজের মতো করে, নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন মধুসূদন। এই কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে মদনকে 'মায়ার নন্দন' বলে চিহ্নিত করেছিলেন মধুসূদন, যেখানে তাঁর কোনো পৌরাণিক মাতৃপরিচয় জানা যায় না। এখানে মনে অনেক সংশয় নিয়ে দ্বিতীয় বার তপোভঙ্গের আয়োজন করেন মদন। ফুলশর নিক্ষেপের পর 'ভবানীর বক্ষঃস্থলে' তাঁর আশ্রয় নেওয়ার ভঙ্গিটি ছিল অভিনব। এই ভঙ্গিটির কল্পনা করে মধুসূদন খুব কৌশলে আমাদের মনের মধ্যে থেকে প্রাচ্যের পুরাণ অনুসারী মদনের যুবক মূর্তিটি সরিয়ে নিলেন। তার পরিবর্তে স্পষ্ট হয়ে উঠল রোমান কিউপিডের বালক মূর্তি। ভারতীয় পুরাণে মদনের ডানার কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ মদনের 'নীড় ছাড়ি উড়ে'[৬৩] যাওয়ার ঘটনাটি পাঠকের মনে যুগলপক্ষযুক্ত এরস ও কিউপিডের ছবিটি স্পষ্ট করে তোলে। 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) নাটকে

মদনের স্ত্রী রতি দেবতা মদনকে 'পোড়া স্বামী' বলে সম্বোধন করেন এবং তিনি যে আগুনে পুড়েও মরেন না, সেকথাও জানিয়ে দেন নির্দ্বিধায়।[৬৪]

অনেক বার প্রাচ্য, লৌকিক শিকড়ের অভিমুখেও ফিরে গিয়েছেন মধুসূদন। 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র ৪ সংখ্যক সনেটটিতে উঠে আসে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের 'কমলেকামিনী'র প্রসঙ্গ। '৩৫' সংখ্যক সনেটে উল্লেখ করেছেন ঈশ্বরী পাটনী ও দেবী অন্নপূর্ণার কথা। অন্নপূর্ণা সেখানে 'নবযুবতী'। 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি' এবং 'আশ্বিন মাস' কবিতাতেও দেবীর প্রসঙ্গ আসে। 'আশ্বিন মাস' সনেটের শেষ অংশটিতে পূর্ব ঘটনার স্মৃতিচারণ করে কবি বলেন, 'ফলিবে কি মনে পুনঃ সে দেব ভকতি?'[৬৫] বোঝা যায় তাঁর অতীত জীবনের দেবসংস্কার একেবারে হারিয়ে যায়নি।

মধুসূদনের সাহিত্যে দেবরাজ ইন্দ্রের বিবিধ ভূমিকা এবং বিচিত্র রূপ। 'ব্রজবৃত্তান্ত' নামের সনেটটিতে তিনি গোকুলকে বৃষ্টিতে নিমগ্ন করে দিলেন। এখানে পৌরাণিক ইন্দ্রের প্রতিহিংসাপ্রবণ রূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'মেঘনাদবধ কাব্য'র ইন্দ্র কিন্তু রাজকীয়। এখানে এক কূটনীতিজ্ঞ রাজার ভূমিকা তাঁর দেবচরিত্রের সহজ গরিমাকে গ্রাস করে নেয়। 'তিলোত্তমাসম্ভব'-এ আবার ইন্দ্র ছিলেন পরাজিত সংগ্রামী দেবতাদের নেতা।

১৮৬১ সালে লেখা 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের রাধা মধুসূদনের কাছে 'poor lady of Braja'। এই কাব্যের '১৬' সংখ্যক পদের নাম 'সখী'। এখানে কৃষ্ণ হলেন প্রেমিক, তাই তিনি 'রাধিকারঞ্জন'। এই পদের শেষ স্তবকের শেষ পঙ্‌ক্তিটি লক্ষ করার মতো— 'ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুসূদন?'[৬৬] খুব ব্যক্তিগত মনে হয় এই উক্তিটি। রাধার করুণ মুখের আড়াল থেকে ভেসে ওঠে মধুসূদনের স্ত্রী রেবেকার মুখ, যাকে ছেড়ে তিনি চলে এসেছিলেন। 'শ্রীমধুসূদন' অবশ্যই কৃষ্ণের আরেক নাম। কিন্তু অষ্টোত্তর শত নামের মধ্যে থেকে এই নামটি বেছে নেওয়ার অন্তরালে অবশ্যই ছিল তাঁর ব্যক্তিগত অভিপ্রায়। রাধাকৃষ্ণের সম্পর্ককে পুনর্জীবন দেওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি কাব্যে এঁকেছিলেন রেবেকার সঙ্গে পুনর্মিলনের স্বপ্ন।

উনিশ শতকের মহিমায় মধুসূদন হিন্দু দেবসম্প্রদায়কে যতই ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখুন না কেন, তাঁর সৃষ্টির পথে বার বার এসেছে হিন্দু দেবদেবীর প্রসঙ্গ। তা সে রাবণের রণসজ্জার বর্ণনার সময় দেবী চণ্ডীই হোন, অথবা রুদ্র-গৃহিণী হওয়ার আভিজাত্য নিয়ে 'হর শির নিবাসিনী হরপ্রিয়া জাহ্নবী'। দেবতাদের তুলনায় মধুসূদনের সাহিত্যে বেশি ক্রিয়াশীল ছিলেন। লক্ষ্মী, সরস্বতী, মায়া, পার্বতী,

ইন্দ্রাণী, জাহ্নবী প্রত্যেকে দেবতাদের নিয়ন্ত্রণ করেন, পরামর্শ দেন। ভারতীয় হিন্দু সমাজে, অন্তত সেই সময় এমন সক্রিয় নারীচরিত্র দুর্লভ ছিল। তাই, জোরের সঙ্গেই বলতে পারি, হিন্দু দেবীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য নারীদের স্বাধীন মনোবৃত্তি মিলিয়ে দিয়েছিলেন মধুসূদন।

আরো তিন জন দেবীর উল্লেখ না করলে মধুসূদনের সাহিত্যে দেবকল্পনার আলোচনা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। তারা হলেন নিশাদেবী, নিদ্রাদেবী এবং স্বপ্নদেবী। এই দেবীদের প্রাচ্যের পুরাণের সঙ্গে সংযোগ প্রায় নেই। ঋগ্বেদে রাত্রিদেবীর উল্লেখ থাকলেও মনে হয়, গ্রিক রাত্রিদেবী নিক্সের কথাই মধুসূদন মনে করেছিলেন বেশি। নিক্সের এক ছেলে হিপনোস ছিলেন ঘুমের দেবতা আর আরেক ছেলে মরফিউস ছিলেন স্বপ্নের দেবতা। হেসিওদের লেখা 'থিওগনি' গ্রন্থে এই দেবদেবীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রিকপুরাণের ভক্ত মধুসূদন সাহিত্যের প্রয়োজনে দেবতাদের দেবী করার মতো স্পর্ধা করেই ফেলেছিলেন। 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) নাটকে গ্রিক কলহদেবী ডিসকর্ডিয়ার পরিবর্তে মধুসূদন নিয়ে এসেছিলেন কলহপ্রবণ নারদকে। গ্রিক পৌরাণিক কাহিনি 'Apple of discord'-কে অবলম্বন করে লেখা নাটক 'পদ্মাবতী'। গ্রিকদেবী জুনো, প্যালাস এবং ভেনাসের জায়গায় শচী, মুরজা এবং রতিকে নিয়ে এসে মধুসূদন নাটকে এক প্রাচ্য আবহাওয়া তৈরি করেছিলেন। এই দেবীদের অনুপম সৌন্দর্য, অনিমেষ চক্ষু, ছায়াহীন দেহ এবং শরীরে পদ্মগন্ধের সঙ্গেই থাকে জটিল মানসিকতা। 'মায়াকানন' নাটকে বনদেবীর উল্লেখ মধুসূদনের খেয়ালি কল্পনার প্রকাশ মাত্র।

মধুসূদন সবরকম 'religious bias'-কে একপাশে সরিয়ে রেখে দেবচরিত্রগুলি সৃজন করেছিলেন। 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ তাই একভাবে রচনা করে ফেলেছিলেন এক উল্‌টো পুরাণ। 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে দেবতাদের বলেছিলেন 'দুষ্ট দস্যুদল'।[৬৭] 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) প্রহসনে মাতাল কালী দেবী কালিকার 'আসব পান'-এর প্রতি কটাক্ষ করে। 'বুড় সালিখের ঘাঁড়ে রোঁ' (১৮৬০) প্রহসনে লম্পট ভক্তপ্রসাদ 'দীনবন্ধো'কে ডাকে। কৃষ্ণ যে ব্রজে গোয়ালাদের মেয়েদের নিয়ে 'কেলি কত্যেন'[৬৮] —এই ধারণাটি ভক্তপ্রসাদ ও গদার লাম্পট্যে প্রেরণা জোগাতো। মধুসূদনের নাটকে হিন্দুদেবতার এই পরিণতি লক্ষ করার মতো। রাধা কৃষ্ণকে সাক্ষী মেনে অশ্লীল উক্তি, শিবমন্দিরের মধ্যে দুরাচার করার স্পর্ধা এবং ভগ্নশিবে শিবত্ব না থাকার ঘোষণার মধ্যে দিয়ে মধুসূদনের সাহিত্যে দেবতাভাবনার রূপরেখাটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়।

১৯১৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণে

মধুসূদন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, মাইকেল সাহিত্যে যুগান্তর আনার অনতিকাল পরে তাঁর জন্ম। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের এই যুগান্তকারী অবদানকে স্বীকৃতি দিলেও 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেননি মধুসূদন। 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী', 'আত্মবিলাপ', 'বঙ্গভূমির প্রতি' রবীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ করলেও মাইকেলের অন্য সাহিত্যগুলি সম্পর্কে প্রায় নীরব ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নীলকমল পণ্ডিতের কাছে 'মেঘনাদবধ কাব্য'টি পাঠের স্মৃতি তাঁর পক্ষে সুখকর ছিল না। কিন্তু ১৯০৬ সালে 'The National Council of Education' প্রতিষ্ঠা হলে পর পর দুবছর 'মেঘনাদবধ কাব্য' থেকে প্রশ্ন দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতনের প্রবেশিকা পরীক্ষাতেও মধুসূদন দত্তকে নিয়ে প্রশ্ন দিয়েছিলেন। 'ভারতী' পত্রিকায় 'মেঘনাদবধ'-এর যে সমালোচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাকে আর যাইহোক সদর্থক আলোচনা বলা যায় না। 'জীবনস্মতি'র প্রথম পাণ্ডুলিপির পাঠে পরে লিখেছিলেন যে এই সমালোচনা আসলে ছিল 'দাম্ভিক' এবং 'বালকসুলভ চপলতা' মাত্র। পরে এই কাব্যকে 'অমর কাব্য'-এর মর্যাদা দিলেও 'ভারতী' পত্রিকায় ভাদ্র, ১২৮৯ সালে লেখা 'মেঘনাদবধ কাব্য' নামে আর একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে মাইকেল মহাকাব্য রচনার যোগ্য কবি নন। আমরা অনুমান করে নিতে পারি, এর অন্তরালে শুধু যে রবীন্দ্রনাথের বালকসুলভ চাপল্য ছিল, তা নয়। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রচ্ছন্ন সমর্থনও এই বিরূপতার জন্য দায়ী ছিল।

যাইহোক, মধুসূদন রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের লেখায় বার বার ফিরে আসবেন। 'চিরকুমার সভা'র ব্যঙ্গ কবিতায় 'আর্তনাথ বধ' কাব্যের প্রেরণা যে 'মেঘনাদবধ' আমরা বুঝতে পারি। পরিণত বয়সে তিনি মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যের প্রথম দ্বারমোচনকারী মাইকেল মধুসূদন। 'বিশ্বভারতী' রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ৭৭ সংখ্যক পাণ্ডুলিপি থেকে দেখা যায়, 'মেঘনাদবধ কাব্য'র চতুর্থ সর্গের সীতাকাহিনি এবং চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর সম্পূর্ণ অনুবাদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তখন সময়টি ছিল ১৯১৫।

হেমচন্দ্রের দেবতাভাবনা ও রবীন্দ্রনাথ

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন উনিশ শতকের বিখ্যাত দুই লেখক। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের লেখার সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। কিন্তু প্রায় দেবপ্রসঙ্গ বিবর্জিত হওয়ায় আমরা সরাসরি প্রবেশ করব হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের পৃথিবীতে। উনিশ শতকের একজন বিশিষ্ট লেখক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। অনেক সভাতে দুজনের সাক্ষাৎও হয়েছে। ফলে হেমচন্দ্রের সাহিত্যে দেবচর্চার আঙ্গিকটিও রবীন্দ্রনাথের মগ্নচেতনে প্রভাব বিস্তার করে থাকতে পারে।

উনিশ শতকের পটভূমিতে এক প্রথা ভাঙার যুগপরিবেশে হেমচন্দ্রের কাব্যজীবনের শুরু। হেমচন্দ্র পেশায় ছিলেন উকিল, কাব্যরচনা ছিল তাঁর নেশা। মূলত 'বৃত্রসংহার' (১ম খণ্ড-১৮৭৫, ২য় খণ্ড-১৮৭৮)-এর কবি হিসাবেই ছিল তাঁর জনপ্রিয়তা, তাছাড়া, 'আশাকানন' (১৮৭৬), 'বীরবাহু' (১৮৬৪), 'দশমহাবিদ্যা' (১৮৮২) এবং বিভিন্ন ছোটো কবিতা সিদ্ধ হস্তে রচনা করেছিলেন হেমচন্দ্র। তাঁর সাহিত্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে ছিল দেবপ্রসঙ্গ। আমাদের আলোচনা এই দেবদেবীদের বিশিষ্টতা নিয়েই।

বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'দেবনিদ্রা' (ভাদ্র ১২৭৯), 'ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পূজা', (পৌষ ১২৭৯), 'অন্নদার শিবপূজা' (মাঘ ১২৭৯), 'দুর্গোৎসব' ইত্যাদি রচনাতেও দেবদেবীদের বিশিষ্টতা লক্ষ করা যায়।

হেমচন্দ্র অনেক সময়ই পুরাণ বৃত্তান্তের অবিকল অনুসরণ করেননি। 'বৃত্রসংহার'-এর প্রথম খণ্ডের বিজ্ঞাপনে তিনি নিজেই একথা জানিয়েছিলেন। সেই কারণে তিনি কৈলাসকে হিমালয় পর্বতের উপর না রেখে কল্পনার শক্তিতে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন অন্যত্র। 'বৃত্রসংহার' যদিও 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র অনুসরণে রচিত হয়েছিল, তবু দুই কবির মনের গড়নে মিল ছিল না কোনো। মধুসূদন রাবণকে এবং ইন্দ্রজিৎকে বলেছিলেন 'Grand fellow', হেমচন্দ্র সেখানে চিরাচরিত, সিদ্ধ ধর্মীয় গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। সেই কারণে দেবতাদের নয়, রাক্ষসদের পরাজয়— এই নীতিকথার মধ্যে দিয়েই 'বৃত্রসংহার'-এর পরিসমাপ্তি ঘটে। এর কারণ কিন্তু ছিল তাঁর আজন্মলালিত হিন্দু সংস্কার। হেমচন্দ্র মনে মনে রক্ষণশীল হিন্দুই ছিলেন। তাঁর হিন্দু সংস্কারপ্রবণ মনের প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া যায় ১৮৬৯ সালে লেখা 'Bramho Theism in India' নামের গ্রন্থে। সেই সময় কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে সারা দেশে ব্রাহ্মধর্ম এক আন্দোলনের স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। সেইখানে হেমচন্দ্রের এই মনোভাব দুঃসাহসী তো বটেই।

'বৃত্রসংহার' রচনার সময় অসুরদের জীবনের ঘটনাই তাঁর মুখ্য অবলম্বন ছিল। রুদ্রাপীড়ের ট্র্যাজেডি দেখাতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পরাজিত দেবতাদের করুণ ছবিও ধরা পড়ে তাঁর কাব্যে। ইন্দ্র এখানে তপস্বীর মতো একাগ্র, কিন্তু দিশেহারা। বিমর্ষ দেবতাদের কলহ, মনান্তরের প্রসঙ্গগুলি তাঁদের মহান হতে দেয় না। 'বিশ্বকর্মার শিল্পসদন নির্মাণ' অথবা পার্বতীর দার্শনিক তত্ত্বব্যাখ্যা কাব্যের প্রতি পাঠকের মনযোগকে ঘনীভূত হতে দেয় না। আবার, শচীর প্রতি ঐন্দ্রিলার ঈর্ষা ছিল বেশ মানবিক।

'আশাকানন' কাব্যে আশাকে এক বিশেষ দেবীর মর্যাদা দিয়েছিলেন হেমচন্দ্র। 'ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পূজা' নামের প্রবন্ধে দেবী সরস্বতীকে দেবতা এবং মর্ত্যমানব উভয়েই বন্দনা করতে আসেন। খুব আকস্মিক ভাবেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের সঙ্গে 'য়ুনানী নিবাসী' হোমার দেবীর পায়ের তলায় নিজেকে সমর্পণ করেন। এইটিকে কবির কষ্টকল্পনা বলেই মনে হয়। 'দশমহাবিদ্যা' রচনাটিতে পৌরাণিক বা দার্শনিক তত্ত্ব নয়, প্রেমিক শিবের অনুক্ত যন্ত্রণার কথাই এখানে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। দীর্ঘ ভাঙা ত্রিপদী ছন্দে মহাদেবের বিলাপ প্রসঙ্গটিও অত্যন্ত মানবিক।

পুরাণকে সাহিত্যের বিষয়বস্তু হিসাবে নির্বাচন করার মধ্য দিয়ে হেমচন্দ্রও হয়ে উঠেছিলেন 'উনিশ শতকীয়', হিন্দু কলেজের ছাত্র হয়েও হেমচন্দ্র নিজের মধ্যে হিন্দু সংস্কারকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। হয়তো তাই তখনকার রক্ষণশীল বাঙালি সমাজ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। ১৮৭৮ সালে 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা'য় রাজনারায়ণ বসু বলেছিলেন যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাধারণ দ্বারা সর্ব্বপ্রধান বলে পরিগণিত।'[৬৯]

১৮৯৩ সালে 'আর্য্য সাহিত্য সমিতি' থেকে 'জয়মঙ্গলগীত', 'মদনপূজা'র মতো রচনা প্রকাশ করেছিলেন হেমচন্দ্র। তাই, তাঁর সাহিত্যে যে হিন্দু দেবদেবীদের জয়জয়কার থাকবে, সেকথা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই। ১৮৫৭ সালে কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজের একটি তর্কসভায় হেমচন্দ্র 'শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত' বিষয়ে একটি ইংরেজি প্রস্তাব পড়েছিলেন। পরে, রেভারেন্ড লঙের উৎসাহে 'Life of Shrikrishna' নামে তা প্রকাশিতও হয়।

হেমচন্দ্রের সাহিত্যের দেবপ্রসঙ্গগুলি তাঁর মনের দ্বিধার দিকটি স্পষ্ট করে তোলে। একদিকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের চর্চা তাঁর মনে প্রথা ভাঙার ইচ্ছা জাগিয়ে তুলেছিল, আবার অন্যদিকে আজন্মলালিত হিন্দু সংস্কার তাঁকে প্রথা ভাঙতে সাহস দেয়নি। সেই কারণে উনিশ শতকের নবজাগ্রত প্রহরেও তাঁর সাহিত্যের দেবদেবীদের ওপর এসে পড়েছিল ফেলে আসা জীর্ণ যুগের শাস্ত্রীয় অবলেপ। হেমচন্দ্রের সামনে যেন সব সময় জেগেছিল প্রাচীন অনুশাসনের উদ্যত তর্জনী। সেজন্য তাঁর সাহিত্যের দেবচরিত্রগুলিকে দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের সংকীর্ণ পরিসরে বেশ মলিন ও প্রাণহীন বলে মনে হয়।

হেমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ একসঙ্গে বিভিন্ন সাহিত্য সভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে। হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক রি-ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ও হেমচন্দ্র একই সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। সেই সভাতে হেমচন্দ্রের কবিতা শুনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই বিদ্বজ্জন সভায় কয়েকটি নির্বাক জীবন্ত

প্রতিমা প্রদর্শিত হয়েছিল। সেই সবই ছিল 'সুন্দর, পৌরাণিক মনোরম এবং উজ্জ্বল'। রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলায় 'বিদ্বজ্জনসমাগম' সভার বৈঠকে হেমচন্দ্রের লেখা কবিতা পাঠ করা হত। হেমচন্দ্রের সাহিত্য সম্পর্কে পরিণত বয়সে কোনো ভাবপ্রকাশ না করলেও উনিশ শতকের এই বিশিষ্ট কবির লেখা দেবচরিত্রগুলি রবীন্দ্রনাথের দেবতাভাবনাকে আংশিক হলেও প্রভাবিত করেছিল।

নবীনচন্দ্রের দেবতাভাবনা ও রবীন্দ্রনাথ

নবীনচন্দ্র সেন উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধান কবি। নবীনচন্দ্রের রচনায় দেবতা কৃষ্ণের একাধিপত্য। তাঁর শ্রেষ্ঠ তিনটি কাব্যগ্রন্থ 'রৈবতক' (১৮৮৭), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩) এবং 'প্রভাস' (১৮৯৬)-কে কেন্দ্র করে দেবতা কৃষ্ণ নতুন ভাবে পাঠকমহলে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এই কৃষ্ণ শুধু বৈকুণ্ঠের দেবতা নন, তিনি হলেন 'মানবতার পূর্ণ আদর্শ'। নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণভাবনা পাণ্ডিত্যের কঠিন ঘেরাটোপে বন্দি নয়, অন্তরের সুগভীর প্রেরণার ফল। কবির মনের এই যুগান্তর এসেছিল ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে, যখন তিনি চট্টগ্রাম থেকে শ্রীক্ষেত্রে বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে বসেই তিনি ভারতের ব্রজলীলা এক নতুন আলোয় দেখতে পেয়েছিলেন। সেখানেই তাঁর মনে প্রথম কৃষ্ণভক্তি অঙ্কুরিত হয়েছিল।

নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল একটি পূর্ব প্রেক্ষাপট। সেই সময় 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে হিন্দুধর্মের বিষয়ে একটি পত্রযুদ্ধ চলছিল। পত্রলেখক দুজন ছিলেন রেভারেন্ড হেস্টি এবং রামশর্মা অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নবীনচন্দ্র এই পত্রযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে হিন্দুধর্মের একটি দার্শনিক ইতিহাস লেখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের তরফ থেকে কোনো রকম সাড়া না পেয়ে নিজেই লিখে ফেললেন 'রৈবতক' কাব্য। তার পরেই লিখেছিলেন 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'প্রভাস' কাব্য দুটি। এই কাব্যত্রয়ীর অনুপ্রেরণা হিসাবে তিনি এক 'মহাভাব', 'মহাআকাঙ্ক্ষা' ও 'মহাআবেগ'-এর কথা বলেছিলেন।[৭০] উনিশ শতকের বাঙালি মনে করত যে নবীনচন্দ্র তাঁর কাব্যে কৃষ্ণকে 'পুনর্জীবিত' করেছেন। নবীনচন্দ্র শুধু মহাভারতের নয়, ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের শ্রীকৃষ্ণকেও নতুন ছাঁচে গড়েছিলেন এবং প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন।

সেই সময় পাশ্চাত্য সমালোচকরা প্রায় রটিয়ে দিয়েছিলেন যে মহাভারত একটি অদ্ভুত গল্প, শ্রীকৃষ্ণ বলে কেউ ছিলেন না, থাকলেও তিনি এক কূটনীতিপরায়ণ এক রাজনীতিবিদ্ মাত্র ছিলেন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সৌজন্যে দেবতা শ্রীকৃষ্ণ প্রায় ভারতের বিসমার্ক হয়ে উঠেছিলেন। নবীনচন্দ্রের

দেবতাভাবনা ছিল এই সব মতের ঊর্ধ্বে। ১৮৮১ সালের এক শীতকালে, রাজগীরে বসে মহাভারত পড়তে পড়তে নবীনচন্দ্রের ধারণা হয়েছিল যে মহাভারত একটি ঐতিহাসিক মহাকাব্য। সব অন্তর্বিদ্বেষ এবং অন্তর্বিদ্রোহ-খণ্ডিত ভারতের আত্মহত্যা নিবারণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র ভারতে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, তারই নাম মহাভারত। অতিমানবিক শক্তির বলে এবং কৌশলে শ্রীকৃষ্ণ একসঙ্গে ধর্ম, রাজত্ব ও সমাজ সংস্কার করে নিষ্কাম তত্ত্বের ওপর এই মহাধর্মরাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এই কারণেই ভারতীয় শাস্ত্রে অন্য সকলে অবতার আর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।

নবীনচন্দ্র একসময় ব্রাহ্মসভায় যোগ দিয়েছিলেন। 'আমার জীবন' বইটিতে 'ব্রাহ্মধর্মত্যাগ' পরিচ্ছেদে এই সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন নবীনচন্দ্র। কিন্তু ব্রাহ্ম হওয়ার ঘটনাটি তাঁর জীবনে ছিল নিতান্তই এক আকস্মিক আবেগের তাৎক্ষণিক ফলশ্রুতি। সেই কারণে আন্তরিক তাগিদেই এই ধর্ম ত্যাগও করেছিলেন নবীনচন্দ্র।

ছেলেবেলায় তাঁর দেবদেবীর প্রতি ভক্তি ছিল। 'রঙ্গমতী'র বীরেন্দ্রের মতো তিনিও যে দশভূজাকে 'মা' মনে করতেন সেই কথাও জানা যায় তাঁর শৈশবের স্মৃতিচারণ থেকে। 'আবাহন' এবং 'শবসাধনা' কবিতায় শক্তির রূপ বর্ণনা করেছিলেন তিনি। 'Religion what treasure untold resides in that heavenly world'[৭১]— এই কথাগুলি নবীনচন্দ্রের বিশ্বাসের পৃথিবীতে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁর রক্ষণশীল হিন্দু মনের পরিচয় লুকিয়ে থাকে 'শ্রীমদ্ভাগবতগীতা', 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী'র পদ্যানুবাদ এবং 'আমার জীবন' নামের আত্মজীবনীর পাতায় পাতায়।

উনিশ শতকে নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণভাবনা অনেক ব্রাহ্মের মনে ভাবান্তর এনেছিল। অন্নদাচরণ খাস্তগীরের মতো কৃষ্ণবিদ্বেষী ব্যক্তি 'রৈবতক' পড়ে কৃষ্ণের উপাসক হয়ে গিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ নবীনচন্দ্র সম্পর্কেও বেশি মুখর হয়ে ওঠেননি কখনো। এমনকি নবীনচন্দ্রকে লেখা ঈশানচন্দ্রের চিঠি থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ 'রৈবতক' কাব্যটিকে ভালোভাবে গ্রহণ করেননি। নবীনচন্দ্র 'ভারতী' পত্রিকার কাছে 'রৈবতক' পাঠিয়েছিলেন। আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক 'রবিবাবু'র সমালোচনা শোনার ইচ্ছাও ছিল তাঁর।[৭২] এর প্রায় দুই বছর পরে 'ভারতী'-তে 'রৈবতক'-এর সমালোচনা প্রকাশিত হয় এবং কাব্যটিকে 'আগাগোড়া নচ্ছার' প্রমাণিত করার চেষ্টা লক্ষ করা যায়। সমালোচক রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না। ছিলেন ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই ঘটনার বেশ অনেকদিন পর রবীন্দ্রনাথ কুষ্ঠিয়া যাওয়ার পথে নবীচন্দ্রের বাড়িতে এসেছিলেন। 'রৈবতক'-এর সমালোচনার বিষয়ে বলেছিলেন যে তিনি বা স্বর্ণকুমারী দেবী এই সমালোচনার বিষয়ে কিছুই জানতেন না। রবীন্দ্রনাথ 'রৈবতক'-এর সমালোচক হিসাবে এক লেখিকার নাম করেছিলেন। কিন্তু কেন যে তিনি ঠাকুরদাসের নামটি উহ্য রেখেছিলেন, সেই বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। ঐদিন রবীন্দ্রনাথ 'রাধাকৃষ্ণ' লীলার বিষয়ে কিছু গান গেয়েছিলেন। 'এস এস ফিরে এস' কীর্তনটিকে লক্ষ করে রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চেয়েছিলেন নবীনচন্দ্র। কথার টানে সেদিন ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ বলেই ফেলেছিলেন যে মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয়, তিনিও 'পৌত্তলিক' কিনা।[৭৩] এইখানে স্পষ্ট হয়ে যায় রবীন্দ্রনাথের মনের সংশয়ের দিকটি। ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ এবং হিন্দু রবীন্দ্রনাথের এই দ্বন্দ্ব থেকেই নবীনচন্দ্র এবং হেমচন্দ্রের সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রসাহিত্যে এত মৌন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেও ত্যাগ করেছিলেন যে দুজন মনীষী, দেবেন্দ্রনাথের আদর্শ সন্তান রবীন্দ্রনাথের সাহস এবং ইচ্ছাও ছিল না সেই দুই জন মনীষী সম্পর্কে কলম ধরার। সেই কারণে দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের লুকিয়ে থাকা পৌত্তলিক মনটি ধরা পড়ে যায় 'অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসপ্রবণ কবি' নবীনচন্দ্রের কাছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের মানসলোকের দেবতাভাবনার অন্তরালে নবীনচন্দ্রের ঋণটিও মনে রেখে দিতে হয়।

বিহারীলালের দেবতাভাবনা ও রবীন্দ্রনাথ

ছোটবেলায় 'অবোধবন্ধু' পত্রিকা পড়তে পড়তে প্রথম বিহারীলালের কাব্যগুলির সঙ্গে পরিচয় হয় রবীন্দ্রনাথের। প্রথম কবিতা লেখার সময় বিহারীলালের লেখা নতুন ধরনের কবিতা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। তার সঙ্গে এসে মিলেছিল বিহারীলালের মতো কবি হওয়ার ইচ্ছা। এই ইচ্ছার অন্তরালে অবশ্যই ছিলেন কাদম্বরী দেবী। বিহারীলালের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব রবীন্দ্রনাথের মনে বিহারীলাল সম্পর্কে কৌতূহল ও মুগ্ধতা তৈরি করেছিলেন। পরে বিহারীলাল অনেকবার ঠাকুরবাড়িতে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও এসেছিলেন তাঁর আদর্শ কবির নিকট সান্নিধ্যে। অনেক পরে নিজের মেয়ে মাধুরীলতার সঙ্গে বিহারীলালের ছেলে শরচ্চন্দ্রের বিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ছোটোবেলার সেই মুগ্ধতার এক অন্য প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন।

বিহারীলালের সাহিত্যে দেবী সরস্বতীর ভূমিকা লক্ষ করার মতো। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে সরস্বতী ভাবনার আড়ালে বিহারীলালের 'সারদা'র প্রভাব অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই। মোহিতলাল মজুমদার খেয়াল করেছিলেন যে বিহারীলালের একনিষ্ঠ কবিহৃদয়ে সরস্বতী হলেন

‘অন্তরব্যাপিনী’, তাঁর কাব্যগুলিতে দেবী সরস্বতীরই প্রায় একাধিপত্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে সাধারণ পাঠকের মনে যেরকম ধারণা আছে, বিহারীলালের সরস্বতী তার থেকে স্বতন্ত্র।

১৮৭৯ সালে লেখা ‘সারদামঙ্গল’ কাব্যে ‘ত্রিবিধ সরস্বতী’র কথা বলেছেন বিহারীলাল। ১৯ অক্টোবর ১৮৮১ সালে রংপুর-নিবাসী অনাথবন্ধু রায়কে লেখা বিহারীলালের একটি চিঠি থেকে ‘সারদামঙ্গল’-এর সরস্বতীর সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। জানা যায়, মৈত্রীবিরহ, প্রীতিবিরহ এবং সরস্বতী বিরহ— এই তিন বিরহের কারণে ‘উন্মত্তবৎ’ হয়ে বিহারীলাল সারদামঙ্গল রচনা করেছিলেন।[৭৪] বাল্মীকি মুনি, তার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ের কল্পনা করে, তিন রকম সরস্বতীর কল্পনা করেছিলেন। এই চিঠির মারফৎ আমরা জানতে পারি যে বিহারীলালের সরস্বতী ‘চির আনন্দময়ী বিষাদিনী’।

এই সরস্বতী-কল্পনার আড়ালে যে কবির ব্যক্তিগত আবেগ জড়িয়ে আছে তা আমরা বুঝতে পারি। এই কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে মৈত্রী ও প্রীতি বিরহের তাৎপর্যটি সহজ ও সরল ভাবে বুঝতে পারা যায় না। হয়তো এই তাৎপর্যের অন্তরালে কবির অকথিত জীবন বৃত্তান্তের না বলা কোনো কাহিনি গোপনীয়তার আড়াল টেনে আছে। ছেলেবেলায় মায়ের এবং যুবক বয়সে প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু বিহারীলালের মনের মধ্যে এক বিরহ চেতনার জন্ম দিয়েছিল। হতে পারে তিনি তাঁর জীবনের দুই প্রধান নারীকে তাঁর কাব্যের সারদা সরস্বতীর মধ্য দিয়ে পুনর্জীবিত করেছিলেন।

বিহারীলালের সরস্বতী কল্পনা বেশ মৌলিক। কাব্যের প্রথম সর্গে যিনি ছিলেন ঊষা, পরে তিনিই দেখা দিয়েছিলেন ‘বীণাপানি’ মূর্তিতে। ১৮৭০ সালে ‘বঙ্গসুন্দরী’র নবম সর্গ ‘প্রিয়তমা’র তিরিশ সংখ্যক কবিতায় বিহারীলাল পৃথিবীর সব নারীর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন সারদাকে। চেনা-অচেনা মানবীর অবয়ব মিলে গিয়েছিল তাঁর সরস্বতী ভাবনার অন্তরালে।

শুধু মর্ত্যমানবীরা নয়, বেদ ও পুরাণের বেশ কিছু দেবী সরস্বতীর বিভিন্ন কল্পনার সঙ্গে মিলে মিশে থাকেন। দেবীদের মধ্যে লক্ষ্মী, উর্বশী, উমা যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন সারদার ভৈরবী মূর্তি।[৭৫] উনিশ শতকের কবি ছিলেন বিহারীলাল। অথচ, তিনি যেমন ভক্তির আবেগে ভেসে যেতে পারলেন না, তেমনি পারলেন না যুক্তির শাণিত ক্ষেত্রে দেবদেবীদের বিচারসভা বসাতে। রহস্যময়ী সরস্বতীকে তিনি দেখলেন প্রেমিকের দৃষ্টিতে। বিহারীলালের এই মানসপ্রতিমা যেন মায়ার ‘মোহিনী মেয়ে’। তাঁর হাতে ইন্দ্রধনুর বালা, গলায় তারার মালা, সীমন্তে জ্বল্ জ্বল্ করছে নক্ষত্র, কানে কিরণের ফুল, তাঁর মুখ ঢেকে যায় কালো চুলের রাশিতে। সরস্বতী হলেন কবির ‘বড়ো আদরের ধন।’[৭৬] কবি

এই দেবীর সামনে শুধু শ্রদ্ধায় নত হননি, তাঁকে প্রেয়সীর মতো জড়িয়ে নিয়েছিলেন নিজের কাব্যজীবনের সঙ্গে। দেবী সরস্বতীর সীমন্তে নক্ষত্র আর কবিপ্রিয়ার সিঁথির সিঁদুর কবির ভাবজীবনে একাকার হয়ে যায়। বিহারীলালের কাব্যেও একই কথা শোনা যায়—

এ মর্ত্যভুবন কমলকাননে নারী সরস্বতী বিরাজ করে।[৭৭]

রবীন্দ্রনাথ 'বিহারীলাল' প্রবন্ধটিতে বলেছিলেন যে, বিহারীলালের সরস্বতীর বিচিত্র ভাব। তিনি কখনো জননী, কখনো প্রেয়সী আবার কখনো কন্যা।

তিনি জগতের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন এবং দয়া স্নেহ প্রেমে মানবের চিত্তকে অহরহ বিচলিত করিতেছেন।[৭৮]

বিহারীলালের কাব্যে সরস্বতী যেন এক নতুন প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। বিষাদে, আনন্দে, অভিমানে উচ্ছ্বসিত দেবী কবির অন্তরের গভীর আবেগ থেকে তাঁর সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। বিহারীলালের দেবতাভাবনার এই বিশেষত্বটি সরাসরি গ্রহণ করবেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর সাহিত্যে, উনিশ শতকের শেষ দিকে।

উনিশ শতক এগিয়ে চলেছিল বিভিন্ন মত ও বিচিত্র ভাবাদর্শের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সংঘাতের মধ্য দিয়ে। একদিকে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীরা একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, আর অন্যদিকে চন্দ্রনাথ বসু, শশধর তর্কচূড়ামণিরা হিন্দুধর্মকে নতুন ভাবে প্রতিষ্ঠা দিতে আগ্রহী হয়ে পড়েছিলেন। বাঙালি সাহিত্যিকরা অনেক সময় দুটি ঘরানায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় আদর্শ নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছিল তাঁদের সাহিত্য জগতকেও।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের দেবতা ভাবনা ও রবীন্দ্রনাথ

উনিশ শতকের অন্যতম প্রধান সাহিত্যিক ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণ ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে উনিশ শতকে 'Prophet' মনে করা হত।[৭৯] শিশিরকুমার ঘোষের একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন যে রঘুনাথ ও রঘুনন্দনের ধারায় বাংলায় অত্যুজ্জ্বল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রেণির শেষ আদর্শ তিনি ভূদেববাবুর মধ্যে দেখেছিলেন।[৮০]

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলিই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। তবে, উনিশ শতকের দেবতাচর্চার পটভূমিতে আমাদের আলোচ্য কিন্তু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'পুষ্পাঞ্জলি'। ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত এই বইটির ভূমিকায় লেখক জানিয়েছিলেন— 'কতিপয় তীর্থদর্শন উপলক্ষে ব্যাস মার্কণ্ডেয় সংবাদস্থলে হিন্দুধর্মের যৎকিঞ্চিৎ তাৎপর্য কথন।'[৮১] এই রচনাটিতেই ভূদেব মুখোপাধ্যায় বেদ ও

পুরাণের দেবদেবীদের বাস্তব মূর্তিতে কল্পনা করেছিলেন। ভারতবর্ষকে দেবীরূপে কল্পনা করার প্রথম কৃতিত্ব তাঁর। বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক আগে 'পুষ্পাঞ্জলি' কাব্যের মধ্যে এই বিশিষ্ট দেবীকল্পনা লক্ষ করা যায়। তাছাড়াও আরো বিভিন্ন দেবপ্রসঙ্গ এই কাব্যটিতে খুঁজে পাওয়া যায়। 'পুষ্পাঞ্জলি'র অন্যতম চরিত্র ব্যাসদেবের কৌতূহল নিরসনের জন্য মার্কণ্ডেয় মুনি তাঁকে কুরুক্ষেত্র থেকে কন্যাকুমারিকায় তীর্থভ্রমণ করিয়েছেন। চলার পথে ভারতীয় বেদ ও পুরাণের সরস্বতী, অগ্নি, স্বাহা, শিব, পার্বতী, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, কার্তিক, গণেশ, ইন্দ্র, শচী, যম ইত্যাদি দেবদেবীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই ব্যাখ্যায় কিন্তু দেবদেবীদের প্রতি পক্ষপাত চোখে পড়ে যায়। দেবচরিত্রেরা কেউ হাজার বছর ধরে তপস্যায় মগ্ন, কেউ অদৃশ্য ভাবে বিচরণ করেন, কেউ আবার নিজের ইচ্ছামতো মানবিক মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কল্পনার শক্তিতে ভারতবর্ষ ভারত মায়ের নতুন চালচিত্রে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেন। এই দেবীর পরণে সবুজ বস্ত্র। সৌম্য এবং স্নিগ্ধ এই দেবী। 'নিরন্তর অপত্যবর্গ লইয়া সকলকে মাতৃভাবে অন্নপান প্রদান করিতেছেন।'[৮২] দেবী সরস্বতী, দেবী গঙ্গা, এমনকি 'মাধবপ্রিয়া'র সঙ্গে তাঁর মিল থাকলেও তিনি তাঁর নিজের সৌন্দর্যে বিশিষ্ট হয়ে যান।

'পুষ্পাঞ্জলি'র অষ্টম অধ্যায়ে দেবমূর্তির বর্ণনার অভিনবত্বের মধ্যে দিয়ে ভূদেবের দেবতা-কল্পনার বিশিষ্টতা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর কলমের ছোঁয়ায় গণেশ হয়েছেন স্থূলদেহ, পশুমুখবিশিষ্ট এবং লম্বোদর। তিনি যে সবার আগে ভক্তের প্রসাদ গ্রহণ করেন, এই পুরাণ নির্দিষ্ট সত্যের পক্ষে ভূদেব নিয়ে এসেছিলেন এক অভিনব যুক্তি— 'স্পন্দন শক্তি সম্পন্ন জড়ের প্রথমজাত ধর্ম্ম ভক্ষ গ্রহণ।'[৮৩] বিষ্ণু ও কার্তিক, এই দুই দেবতাকে অভিন্ন শক্তি হিসাবে দেখিয়ে, পাশাপাশি রাখলেন নিজস্ব ব্যাখ্যা। গুরুত্ব আরোপ করলেন মানুষের 'দ্বিতীয়জাতধর্ম্ম দাম্পত্য'-এর ওপর। একই ভাবে শিবের 'বার্দ্ধক্য' মূর্তিই যে প্রচণ্ড মহাকাল, ইন্দ্র ও শচী যে মেঘ ও বিদ্যুৎ, মহাদেব ও শক্তি যে শ্রমসাধ্য বিষয়গুলি নিষ্পন্ন করেন— এই ধরনের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। এর অন্তরালে অবশ্যই ক্রিয়াশীল ছিল তাঁর প্রবল হিন্দুত্ববাদী দেবসংস্কার এবং পারিবারিক বৈদিক আবহাওয়া।

রবীন্দ্রনাথকেও তিনি বলেছিলেন 'আর্যকবি'। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গান ও কবিতায় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের দেশমায়ের দেবীমূর্তির প্রভাব থাকতে পারে। তাছাড়াও 'পুষ্পাঞ্জলি'র মার্কণ্ডেয়

মুনির ভারতদর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং 'ঊনবিংশ পুরাণ'-এর 'অধিভারতী দেবী'র কল্পনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগতের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। ভারতমায়ের দেবী কল্পনার ধারা যে বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ'-এর পরে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়নি, একথা কেই-বা বলতে পারে। পাশ্চাত্য সভ্যতার গ্রাস থেকে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করা ভূদেবের সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, এই কথাটি অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই। এই সংকীর্ণ মানসিকতার থেকে রবীন্দ্রসাহিত্য শত হস্ত দূরে অবস্থান করলেও উনিশ শতকের এই দেবকল্পনার প্রভাব ক্ষীণভাবে হলেও রবীন্দ্রনাথের দেবলোককে প্রভাবিত করেছিল এই অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের দেবতাভাবনা ও রবীন্দ্রনাথ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্য সৃষ্টি করে যিনি 'সাহিত্য সম্রাট'-এর মর্যাদা পেয়েছিলেন তিনি হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ যখন ছেলেবেলায় বড়ো দাদার আলমারি খুলে একের পর এক বই পড়তেন, তখন তাঁর হাতে এসেছিল 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা। প্রতি মাসেই এই পত্রিকার নিয়মিত পাঠক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ভালো পড়ে শোনাতে পারতেন রবীন্দ্রনাথ। তাই মায়ের ঘরে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়ে শোনানোর মতো বউদি কাদম্বরী দেবীর ঘরে তাঁর ডাক পড়ত বঙ্কিমের উপন্যাস পড়ে শোনানোর জন্য। এই প্রথম পরিচয়ের সূত্র ধরে বঙ্কিমের লেখার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয়। এরপর রবীন্দ্রনাথ যে সমগ্র বঙ্কিম সাহিত্য গোগ্রাসে পাঠ করেছেন, সেকথা বলার জন্য কোনো প্রমাণের প্রয়োজন নেই। বঙ্কিমের সাহিত্যে বহু জায়গায় দেবপ্রসঙ্গ রয়েছে। সেই দিকটিও যে রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করে থাকবে, এই অনুমানটিও অমূলক নয়। তাছাড়া, ১৮৮৬ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মহাগ্রন্থ 'কৃষ্ণচরিত্র'। ১৯০৭ সালে বঙ্কিমকে স্বীকৃতি দিয়ে 'আধুনিক সাহিত্য' বইতে 'বঙ্কিমচন্দ্র' নামের প্রবন্ধও লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের দেবসংস্কারের অন্তরালে বঙ্কিমের ভূমিকা উপেক্ষা করার মতো নয়।

'ঊনবিংশ শতাব্দী'র শেষ তিনটি দশককে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন উজান স্রোতের কাল। উনিশ শতকের সূচনালগ্নে যেমন আচারসর্বস্ব হিন্দুধর্ম মানুষের মনে বিরক্তি তৈরি করেছিল, উনিশ শতকের শেষবেলায় তেমনি মানুষের ধর্মচিন্তা ও স্বাজাত্যবোধ হিন্দুধর্ম সম্পর্কে নতুন আগ্রহ তৈরি করে। এই প্রবল হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, চন্দ্রনাথ বসুর মতো প্রবল হিন্দুত্ববাদীরা। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে এই বিষয়ে আগ্রহী হলেও নিজস্ব উপলব্ধির জোরে সরে এসেছিলেন ওই গোষ্ঠী থেকে। নিজের সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন ছাঁচে দেবতার কল্পনা করেছিলেন

বঙ্কিমচন্দ্র। সেই কল্পনার ওপর যেমন ভর করেনি পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহ, তেমনি ছিল না প্রবল হিন্দুত্ব চাপিয়ে দেওয়ার রাজনীতি।

দেবতারা যে মানুষের আদলেই কল্পিত, 'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত' প্রবন্ধে এই মতটি প্রকাশ করেছিলেন বঙ্কিম। প্রাচীন কবিরা শ্রোতাদের মানসিকতার দিকে লক্ষ রেখেই দেবচরিত্রগুলিকে মানবিক করে তুলেছিলেন— এই ছিল দেবতা সম্পর্কে বঙ্কিমের নিজস্ব অভিব্যক্তি।

যুগের গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে বঙ্কিম ব্রাহ্ম হয়ে যাননি। কিন্তু প্রাচ্য সংস্কৃতির গভীর ও একাগ্র পাঠের শক্তিতে একেশ্বরের উপলব্ধি হয়েছিল তাঁর। যদিও 'গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি' প্রবন্ধে বাবাজি মূর্তিপূজার পক্ষেই নিজের মত রেখেছিলেন, তবু ব্যক্তি বঙ্কিম সাকার উপাসনায় বিশ্বাসী ছিলেন না। 'ভ্রমর' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বঙ্গে দেবপূজা' নামের প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেছিলেন বঙ্কিম। তিনি মনে করতেন সাকার পূজা সমাজের গতিরোধ করে।

বঙ্কিম 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম' প্রবন্ধে দেবতাকে ঋগ্বেদের সূক্তগুলির 'Subject' বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। 'যা উজ্জ্বল, তাই'— ঋগ্বেদের এই প্রাচীন সত্যটিকে মেনে নিয়েছিলেন তিনি। বেদের তেত্রিশ কোটি দেবতা যে অলীক কল্পনা মাত্র, সেকথাও তিনি যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করেছিলেন। নিজস্ব ভাবনার আলোয় দেবতাদের দেখেছিলেন। তাঁর মতে, আকাশ যখন অনন্ত তখন তিনি অদিতি, বৃষ্টিকারী আকাশ ইন্দ্র এবং আকাশ সর্বাবরণকারী হলেন বরুণ। তিনি অনুভব করেছিলেন ঈশ্বর ছাড়া অন্য দেবতা নেই।[৮৪] এই যে বহুদেববাদের বিশৃঙ্খল ভাবনার জগতে ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠা করার ভঙ্গি, তা একান্তভাবেই উনিশ শতকীয়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন হিন্দুধর্মের এক নতুন ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই সূত্রে বিপিনচন্দ্র পালের কথা মনে করা যায়। তিনি বলেছিলেন যে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের নতুন ব্যাখ্যার দ্বারা হিন্দুধর্ম এবং ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন।

বঙ্কিমের নিজের কথা থেকেই জানা যায় যে প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন নাস্তিক।[৮৫] ১৮৮২ সালের বঙ্কিম-হেস্টি বিতর্ক শুধু নয়। গৃহদেবতা রাধামাধব, ভক্তিমতী স্ত্রী রাজলক্ষ্মী, সমাজের হিন্দুধর্মের চর্চা এসবের দ্বারাই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। এইসব আধ্যাত্মিক প্রভাব হয়তো 'কৃষ্ণচরিত্র' রচনার আড়ালে গোপনে ক্রিয়াশীল হয়েছিল।

১৮৮৪ সাল থেকে 'প্রচার' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'কৃষ্ণচরিত্র'। এর

আগেই প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে 'ধর্মতত্ত্ব'। যুক্তির শানিত ক্ষেত্রে বঙ্কিম স্থাপিত করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে। বৃন্দাবনের বহুবল্লভ কৃষ্ণ নয়, মহাভারতের অদ্বিতীয় রাজনীতিবিদ্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছিলেন তিনি।

১৮৮২ সালে হেস্টি যেমন প্রবল উদ্যমে মহারাজা হরেকৃষ্ণ বাহাদুরের পারিবারিক পুতুল গডের নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন, বঙ্কিম তেমনি সন্তর্পণে হিন্দুদের দেববিগ্রহগুলিকে বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা দিতে লাগলেন। ছেলেবেলায় 'দুর্গোৎসব' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। সেখানে দেবীর দশ হাতে ধরে থাকা দশটি অস্ত্র এবং সিংহের উপর বসে থাকা দেবী দুর্গাকে ব্যঙ্গ করেছিলেন বালক বঙ্কিম।[৮৬] এই দেবীই ধীরে ধীরে 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ দিগ্‌ভূজা নানা প্রহরণ প্রহারিণী, শত্রুমর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী দেবীতে পরিণত হবেন।

বঙ্কিমের উপন্যাসগুলিতেও এই মাতৃকল্পনা লক্ষ করা যায়। 'কপালকুণ্ডলা'য় যখন কপালকুণ্ডলা নবকুমারের বন্ধনমোচন করার জন্য খড়্গ হাতে দাঁড়ায় তখন তার শরীরের শুভ্র বর্ণও পাঠকের মনে আসা কালীমূর্তির কল্পনাকে বাধা দিতে পারে না। 'মৃণালিনী' উপন্যাসে বঙ্কিম দেশমাতৃকার মূর্তি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। 'আনন্দমঠ'-এর প্রথম খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে সেই অন্বেষণ শেষ হল, বিষ্ণুর কোলে যে দেবীমূর্তি লক্ষ্মী সরস্বতীর চেয়েও ঐশ্বর্যময়ী তাঁকেই দেশমাতৃকা বললেন বঙ্কিম। নিজস্ব এই দেবভাবনাকে প্রকাশ করার জন্য বঙ্কিম ইচ্ছা মতো ব্যবহার করেছিলেন ভারতীয় দেবসমাজকে। সেই কারণে মহেন্দ্র মায়ের তিনটি মূর্তি দেখেছিলেন— 'মা যা ছিলেন', 'মা যা হইয়াছেন' এবং 'মা যা হইবেন'। এই তিনটি পর্যায়ে যথাক্রমে জগদ্ধাত্রী, কালী এবং দুর্গার রূপ মহেন্দ্রকে নতুন এক উপলব্ধির স্তরে পৌঁছে দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের এই দেবীকল্পনা দশমহাবিদ্যার মতো বারে বারে রূপ বদল করতে থাকে। এই দেবী কখনো কাঞ্চনবর্ণে কমলার মতো সুন্দরী, মণিময় ঝাঁপি এবং ধানের শিস হাতে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। আবার কখনো তাঁর কোলে বীণা, হাতে লেখনী, কখনো তাঁর তৃতীয় নয়ন থেকে বিচ্ছুরিত হয় জ্ঞানের আলো। ভারতীয় পুরাণের চালচিত্রে জেগে ওঠেন বঙ্কিমচন্দ্রের দেশমাতৃকা। রবীন্দ্রনাথের দেশমায়ের কল্পনাও এই একই ছাঁচে গড়া। 'দেবী চৌধুরাণী'র প্রফুল্ল, 'সীতারাম'-এর শ্রীর তেজস্বিনী চরিত্র সিংহবাহিনী দেবী— দুর্গার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

বঙ্কিমসাহিত্যের কোথাও দেবচরিত্রগুলির প্রতি অতিভক্তি লক্ষ করা যায় না। তিনি সাহিত্যের প্রয়োজনে চরিত্রগুলিকে ইচ্ছা মতো ব্যবহার করেছিলেন। 'ইংরেজ স্তোত্র'-এ ইংরেজদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু,

ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ এমনকি যম রূপেও কল্পনা করে আশ্চর্য দক্ষতায় তীব্র ব্যঙ্গের আঘাত হেনেছিলেন। প্রয়োজনে দেবদেবীদের মস্করার পাত্রে পরিণত করতেও ছাড়েননি বঙ্কিম। 'সুবর্ণগোলক' নামের রম্যরচনাটিতে মহাদেবের চেয়ে গৌরী আড়ি মারতে পটু এবং তার প্রমাণ যে মর্ত্যে তাঁর পূজা, সেকথা অনায়াসে প্রচার করে ফেলেন বঙ্কিম। অনেক সময় তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা স্বপ্নেও দেবচরিত্রদের সঙ্গে আত্মীয়তা তৈরি করে। 'ইন্দিরা' উপন্যাসের নামচরিত্রটির সুপুরুষ স্বামী পাওয়ার কামনা স্বপ্নে পরিতৃপ্ত হয়ে রতিপতিকে নিজের স্বামী হিসাবে প্রতিস্থাপিত করে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসেও বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত আফিমের ঝোঁকে স্বপ্ন দেখে রোহিনী ইন্দ্রের শচী হয়ে মহাদেবের গোয়াল থেকে ষাঁড় চুরি করতে গিয়েছে।

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের একাদশ পরিচ্ছেদে বঙ্কিম সরস্বতীর দুই রকম রূপের কথা বলেছিলেন। একটি রূপে তিনি কালিদাসকে বর প্রদান করেছিলেন, অন্য রূপে তিনি 'বটতলা বিদ্যাপ্রদীপ তৈল প্রদায়িনী'।[৮৭] 'মৃণালিনী' উপন্যাসে মনোরমা গঙ্গাকে বলেছিল 'প্রেমপ্রবাহ স্বরূপ', 'মৃত্যুঞ্জয় জটাবিহারিণী'। 'রাজসিংহ' উপন্যাসের নামচরিত্রটিকে ঘিরে থাকে কৃষ্ণের চালচিত্র। 'কমলাকান্ত' নামটি বিষ্ণুর ইঙ্গিতবহ। তবু প্রসন্নের প্রসঙ্গটি কৃষ্ণের কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রসন্ন যেন ব্যঙ্গচ্ছলে রাধা। কমলাকান্তের জবানিতে সে দধিদুগ্ধ ক্ষীর-নবনীত বেষ্টিতা গোপকন্যে।

'মৃণালিনী' উপন্যাসের চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 'ধাতুমূর্ত্তির বিসর্জন' অংশে যখন পশুপতির অতি যত্নের মন্দিরটিতে আগুন লেগে মনোরমা প্রাণ হারায়, তখন পশুপতি ধাতুমূর্তির বিসর্জন দিতে চায়। প্রিয়জনের মৃত্যু দেবমূর্তির প্রতি বিশ্বাসকে যে টলিয়ে দিতে পারে তা পশুপতির মন্তব্যের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে যায়—

> ...আমি তোমাকে স্থাপন করিয়াছিলাম— আমি তোমাকে গঙ্গার জলে বিসর্জন করিব।[৮৮]

বাংলা সাহিত্যের নিবিষ্ট পাঠক মাত্রেরই এই প্রসঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকে রঘুপতির কালীমূর্তি বিসর্জনের ঘটনাটি মনে পড়তে বাধ্য। এইভাবেই উনিশ শতকের দেবকল্পনার রিক্থ প্রবাহিত হয়ে চলেছিল একটি ঐতিহ্যকে বহন করে। বঙ্কিমসাহিত্যে দেবতাভাবনার এই বিশেষ ধারাটিকে উত্তরাধিকার সূত্রে আত্মস্থ করবেন রবীন্দ্রনাথ।

গিরিশচন্দ্রের দেবতাভাবনা ও রবীন্দ্রনাথ

উনিশ শতকে বাংলা নাটকে দেবদেবীকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তাঁর সাহিত্যে

পুরাণের নবজন্ম ঘটেছিল এবং এক আশ্চর্য ভক্তিস্রোতের প্লাবনে ভেসে গিয়েছিল বাঙালি। গিরিশচন্দ্রের জীবন বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ধর্মের কাছে নত হয়েছিল। যৌবনের শুরুতে অভিভাবকহীন হয়ে তিনি প্রবল স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠেন। তাছাড়া, সেই সময় শিক্ষিত সমাজে ঘনিয়ে এসেছিল ধর্মবিপ্লবের দিন। নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবারের অংশ হয়েও প্রথম জীবনে গিরিশচন্দ্রের হিন্দুধর্মের প্রতি যে কোনো শ্রদ্ধা ছিল না, নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। একবার শুধুমাত্র সাময়িক ক্রোধে দেবী প্রতিমা খণ্ডবিখণ্ড করতেও তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হননি— তাঁর জীবন ইতিহাস থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়।

গিরিশচন্দ্র কিছু দিন আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর মনে যে কৌতূহল ঘনিয়ে উঠেছিল, সেই সব প্রশ্নের কোনো সদুত্তর নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা থেকে তিনি পেতে পারলেন না। এই বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দোলাচলতা অতিক্রম করে গিরিশচন্দ্রই পরিণত হবেন শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য ভক্তভৈরবে। জীবনের এই পরিণতি গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করবে তাঁর সাহিত্যজীবনেও। গিরিশচন্দ্র 'অকালবোধন' (১৮৭৭), 'দোললীলা' (১৮৭৮), 'নলদময়ন্তী' (১৮৮৭), 'কমলেকামিনী' (১৮৯৬), 'পাণ্ডবগৌরব' (১৯০০), 'হরগৌরী' (১৯০৫), 'আগমনী' (১৮৭৭), 'দক্ষযজ্ঞ' (১৮৮৯), 'রাবণবধ' (১৮৮৬), 'তপোবল' (১৯৬৬) ইত্যাদি নাটকে একের পর এক পৌরাণিক দেবদেবীকে নাটকের চরিত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন।

এই দেবচরিত্রগুলি কিন্তু হুবহু পুরাণের ক্ষেত্র থেকে আবির্ভূত হননি। তাঁদের ওপর ভর করেছিল সময় এবং সমাজ মনস্তত্ত্ব। এই প্রসঙ্গে মনে করা যায় 'গিরিশ মানস' বইটিতে উৎপল দত্তের মন্তব্য। তিনি বলেছিলেন যে 'কালস্রোত' এই অত্যাধুনিক ধারণার কেন্দ্রবিন্দু দেবতাদের অনিবার্য মৃত্যুর কার্যকারণ, তাদের অবিনশ্বরতার পরিসমাপ্তি।[৮৯] গিরিশ ঘোষ প্রাচীন মিথের থেকে দেবচরিত্রগুলিকে নির্বাচন করে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

'শ্রীবৎসচিন্তা' নাটকে শনিদেবতা ও দেবী লক্ষ্মীকে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে ধ্বংস ও অর্থের দ্বৈরথের কথাই মনে হয়। 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকে প্রজাপতি দক্ষ আদিম সমাজের ঐক্য এবং সুখ সম্পাদনে মগ্ন হয়ে থাকেন। উৎপল দত্ত দক্ষের শিবনিন্দার উৎস হিসাবে মৃত্যুভয়কে চিহ্নিত করেন। আবার যখন 'অভিমন্যু বধ' নাটকে স্বপ্নদেবী ও রজনীর সংলাপকে এগিয়ে নিয়ে যান নাটককার তখন পাশ্চাত্য পুরাণের দ্বারা প্রভাবিত উনিশ শতকের দেবতাকল্পনার এক পরিচিত ছবি মনে আসে। ধর্ম

বা আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে প্রথম দিকে গিরিশচন্দ্রের মন দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। তবু, পৌত্তলিকতা বিরোধী ব্রাহ্ম এবং খ্রিস্টান সমাজের প্রতিকূলেই দাঁড় করানো যায় গিরিশচন্দ্রের নাটকের দেবচরিত্রগুলিকে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কিশোর বয়সে লেখা সমালোচনায় গিরিশচন্দ্রের নাটকের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা'য় গিরিশ ঘোষের লেখা 'রাবণ বধ' এবং 'অভিমন্যু বধ'-এর সম্পর্কে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি মধুসূদনের সৃষ্ট দেবচরিত্রগুলির প্রতিকূলে গিরিশচন্দ্রের দেবচরিত্রগুলিকে স্থাপন করেছিলেন। সাধারণের কল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে দেবচরিত্র সৃজন করেছিলেন বলেই হয়তো শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'মনে আঘাত দেননি।'[৯০] তাঁর মতে, 'শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র একজন প্রকৃত কবি— একজন প্রকৃত ভাবুক।'[৯১] রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য পাঠ করে 'প্রীত' হয়েছিলেন। সেই কারণে, গিরিশ ঘোষের সৃষ্ট দেবচরিত্রগুলি যে রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করবে সেই অনুমান অসঙ্গত নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, নিবেদিতার দেবতাভাবনা ও রবীন্দ্রনাথ

আমরা দেখলাম উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে দেবতাভাবনা এবং রবীন্দ্রনাথের পড়া প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে দেবতাভাবনার ইতিহাসটি। বাংলা সাহিত্যে দেবচর্চা যেমন রবীন্দ্রনাথের তরুণ মনের গহনে রেখাপাত করেছিল, তেমনি বাঙালি মননের দেবসংস্কারও রবীন্দ্রনাথের ভাবনার জগৎকে প্রভাবিত করে থাকবে। সেই কারণে, সাহিত্যিক নন, তবু এক মনীষীর উল্লেখ ছাড়া আমাদের আলোচনাটি অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। তিনি হলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন আবির্ভূত হলেন তখন হিন্দুদের মনে যুগের প্রভাবে সত্যিকারের ধর্মসঙ্কট চলছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ধর্মভাবনা উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবী মহলেও আলোড়ন তৈরি করল। তিনি ঈশ্বরকে মাতৃভাবে সাধনা করতেন। সাকার বা নিরাকার সাধনা সম্পর্কে তাঁর মনে কোনো গোঁড়া সংস্কার ছিল না। তাঁর প্রভাবে অনেক ব্রাহ্ম নেতা মূর্তিপূজা সম্পর্কে নিজেদের মত বদলাতে বাধ্য হয়েছিলেন। যেমন কেশবচন্দ্র সেন, 'সানডে মিরর' পত্রিকায় তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে হিন্দুর মূর্তিপূজা একেবারে বর্জনীয় বা উপেক্ষণীয় নয়। কেশবচন্দ্রের প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজের নববিধানে ঈশ্বরের মাতৃভাব লক্ষ করা যায়। শিবনাথ শাস্ত্রী নিজে ব্রাহ্ম ছিলেন। কিন্তু তিনিও বলেছিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভাবের ধারণা মূর্তি বা প্রতীককে অতিক্রম করে অনন্তের পথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছিল। কেশবচন্দ্রের একান্ত অনুগত প্রতাপ মজুমদার এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আনুগত্যও পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

উনিশ শতকের তথাকথিত ইউরোপীয় ভাবাপন্ন, অর্ধনাস্তিক এবং শিক্ষিত যুক্তিবাদীরাও যে এই অর্ধশিক্ষিত, মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী এক হিন্দুর প্রভাব অস্বীকার করতে পারলেন না, একথা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। ফলে রবীন্দ্রনাথও যে শ্রীরামকৃষ্ণের দেবচর্চা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন এবং প্রভাবমুক্ত ছিলেন এমন কথা বলা যায় না। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্কে কোনোদিনই অবহেলার ভাব দেখাননি। পিতার আদর্শ সন্তান হিসাবে রবীন্দ্রনাথও তাই প্রবল শ্রদ্ধার ভাব না দেখালেও অশ্রদ্ধার ভাবটিও দৃষ্টিগোচর হয় না।

সমকালের প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে বেশি মুখর ছিলেন না— এই ছিল তখনকার শিক্ষিত মহলের দৃঢ় ধারণা। এই ধারণার অন্তরালে ব্রাহ্ম-হিন্দু দ্বন্দ্বের জটিল মনস্তত্ত্ব থাকতে পারে। কিন্তু ১৯৩৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন যে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্তি করেন। তিনি বলেছিলেন যে ধর্মনৈতিক ধ্বংসবাদের যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের আধ্যাত্মিক সম্পদ উপলব্ধি করে তার সত্যতা প্রমাণ করেছেন। তাঁর প্রশস্ত মন পরস্পর বিরোধী সাধন পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করেছিল। সরলতা দিয়ে তিনি পাণ্ডিত্য ও ঐশ্বর্যের আড়ম্বরকে ধিক্কার দিয়েছেন। পরিণত বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে এই বক্তব্য রাখলেও জীবনের শুরুতে হয়তো উনিশ শতকের এই গুরুত্বপূর্ণ মানুষটির গুরুত্ব সেই ভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। ১৮৮৩ সালের ২ মে নন্দনবাগানে 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ'-এর কাশীশ্বর মিত্রের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের দেখা হয়েছিল। কিন্তু সেদিন রবীন্দ্রনাথের তরফ থেকে শীতলতাই লাভ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। পিতা দেবেন্দ্রনাথের মতোই রবীন্দ্রনাথ সেদিন মূর্খ ঐ দার্শনিকের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধাদ্বন্দ্বে বিক্ষত ধারণার প্রকাশ দেখা যাবে তাঁর সাহিত্যে। সে 'মালঞ্চ' উপন্যাসে শ্রীরামকৃষ্ণের আলোকচিত্রের মধ্যে দিয়েই হোক বা 'রাজর্ষি' উপন্যাস অথবা 'বিসর্জন' নাটকে রঘুপতির মাতৃসাধনার মধ্যে দিয়েই হোক।

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মীয় ভাবনার উত্তরাধিকার নিয়ে যিনি সেই ধর্মমতকে পৃথিবীর দরবারে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। নাস্তিক নরেন্দ্রনাথ কেমন করে বিবেকানন্দে পরিণত হলেন তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। উনিশ শতকের দেবচর্চার ধারায় তাঁর অবদান এবং রবীন্দ্রসাহিত্যে তার প্রভাব আমাদের আলোচনার বিষয়। বিবেকানন্দের ইষ্টদেবতা ছিলেন শিব। তাঁর লেখা 'শিবস্তোত্রম্'-এ খুঁজে পাওয়া যায় সেই শিবভক্তির ইঙ্গিত। 'অম্বাস্তোত্রম্'-এ দেবীর কল্যাণময়ী মাতৃমূর্তি স্পষ্ট হলেও শিবকেই তিনি পৃথিবীর নিয়ন্ত্রক বলে মনে করতেন। সেই জন্য শিব জ্ঞানে জীব সেবার

কথা বলে উনিশ শতকের পটভূমিতে তিনি মানবদেবতাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন।

মানুষে মানুষে মিলেই যে মহাদেবতা, তাই জীব, তাই শিব— এই ছিল বিবেকানন্দের বিশ্বাস। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে কর্মী, জ্ঞানী ও ধ্যানীর আসনে নবপ্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ। তাঁর সাধনা ছিল দ্বৈত থেকে অদ্বৈতে উত্তরণের।

একসময় তাঁর মনে মহাকালীর ধ্যানও জেগে ওঠে। অভয়া মূর্তি নয়, মায়ের সৃষ্টি স্থিতি বিনাশিনী প্রলয়ঙ্করী রূপটিই বিবেকানন্দের দিব্যকল্পনায় প্রধান হয়ে উঠেছিল। প্রথম বার আমেরিকা থেকে ফিরে এসে দেবী কালীর প্রভাব বিবেকানন্দের মনে প্রবল হয়ে উঠেছিল। 'The Master as I Saw Him' গ্রন্থের 'ক্ষীরভবানী' অধ্যায়ে নিবেদিতা এই প্রেরণার কথা উল্লেখ করেছিলেন। এই দিব্য প্রেরণার ফলেই বিবেকানন্দ লিখেছিলেন 'Kali the Mother' নামের কবিতাটি। পরে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'মৃত্যুরূপা মাতা' নামে কবিতাটির অনুবাদ করেছিলেন। বিবেকানন্দের লেখা 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতাটিতেও মৃত্যুরূপা কালীর কথা রয়েছে। তিনি শুধু সাধক ছিলেন না, তাঁর রচনাগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হয়।

সমসময়ের লেখক রবীন্দ্রনাথ ধর্মভাবনার ক্ষেত্রে প্রতিকূল স্রোতের মানুষ ছিলেন। কিন্তু উনিশ শতকের পাঠ্য ও অপাঠ্য সব গ্রন্থ যিনি পড়ে ফেলেছিলেন সেই মানুষটি যে বিবেকানন্দের লেখা পড়ে প্রভাবিত হননি একথা বলা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কাছাকাছি থাকার সূত্রে সিমুলিয়ার দত্তবাড়ি এবং জোড়সাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েরা পরস্পরের সম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল ছিলেন। স্বামীজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়েছিল ব্রাহ্মসমাজের গানের আসরে এবং অন্যত্রও। রবীন্দ্রসঙ্গীত বিবেকানন্দের কণ্ঠে প্রায় শোনা যেত। নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গেও দেখা করে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তির পথ কখনোই রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেননি। কিন্তু মানবদেবতার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মিলে গিয়েছিল দুই মনীষীর বিশ্বাসের পৃথিবী।

শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের সাধনার ধারা পরম ভক্তিতে যিনি গ্রহণ করেছিলেন, তিনি হলেন ভগিনী নিবেদিতা। এই মহীয়সী নারীর দেবতাভাবনা উনিশ শতকের বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলকে প্রভাবিত করেছিল, নিবেদিতার দেবদেবী বিষয়ক বক্তৃতাগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাবনার জগতে এক আলোড়ন তৈরি করেছিল। অ্যালবার্ট হলে কালী ও কালীপুজো সম্পর্কে দেওয়া প্রাঞ্জল বক্তৃতা সেই সময়কার ব্রাহ্ম, হিন্দু এবং বিদেশিদের পর্যন্ত সমৃদ্ধ ও মুগ্ধ করেছিল। হিন্দুদের মূর্তিপূজা যে বিশেষ প্রতীককে

অবলম্বন করে মনকে তন্ময় করার পদ্ধতি, সেই কথা নিবেদিতা বলেছিলেন। পশুবলির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন আত্মোৎসর্গের জটিল তাৎপর্যকে। 'Kali the Mother'[৯২] বইতে মহাকালীর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই বিদেশিনী। স্বদেশি আমলে এই বইটি বিপ্লবীদের প্রেরণা ছিল। এই বইটির 'Voice of the Mother' অধ্যায়ে নিবেদিতা মাতৃমূর্তিতে প্রতিষ্ঠা দিলেন কালীকে, যিনি পুরুষকে পৌরুষ এবং নারীকে নারীত্ব দান করেন। যার হাতের মুঠিতে রাখা থাকে জয়। এই শক্তিময়ী দেবী রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের রচনাগুলিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা পাবেন।

এমনটা হতেই পারে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-নিবেদিতার কালীসাধনার ধারাটি সঞ্চারিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের শক্তিময়ী দেবী কল্পনার অন্তরালে। ব্যক্তিগত জীবনে নিবেদিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গভীর সখ্য তৈরি হয়েছিল। নিবেদিতাও ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের এবং বিবেকানন্দের একটি সহজ সম্পর্ক তৈরি করতে চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৯৯ সালের ২৮ জানুয়ারি এক ঐতিহাসিক সন্ধ্যায় চা-পানের আসরে মুখোমুখি হয়েছিলেন বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু নিবেদিতাই পরে বলেছিলেন, '...there was some cloud.'[৯৩] সেই মেঘ রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দের সম্পর্ককে কোনো পরিণতি না দিলেও রবীন্দ্রনাথ-নিবেদিতার সখ্য নিয়ে কোনো প্রশ্নের জায়গা নেই।

'ভগিনী-নিবেদিতা' প্রবন্ধে নিবেদিতাকে 'সতী' বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। স্বামীজির মহাপ্রয়াণের পরে লেখা 'মরণমিলন' কবিতায় শিব ও উমার রূপকল্পে ব্যাখ্যা করেছিলেন বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার সম্পর্ককে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ধর্ম সম্মেলন উনিশ শতকের এক যুগান্তকারী ঘটনা— সেকথা অস্বীকার করা যায় না। রোমা রোঁলা মনে করেছিলেন এই ঘটনা ছিল ত্রিশ কোটি নরনারীর দুহাজার বছরের আধ্যাত্মিক জীবনের একটা চূড়ান্ত সার্থকতা। বাংলা সাহিত্যের দেবচর্চার ইতিবৃত্তে এই ঘটনা বিশেষ রেখাপাত করেছিল। রবীন্দ্রসাহিত্যও আদৌ সেই প্রভাবমুক্ত ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ ছিলেন পরস্পরের বিষয়ে আশ্চর্য উদাসীন। শঙ্করীপ্রসাদ বসু রবীন্দ্রনাথকে 'কালীবিরোধী' বলে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে ঠাকুর পরিবারের চরম কালী বিরোধীর নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের ক্ষেত্রে এই 'কালাপাহাড়ী উত্তেজনা'[৯৪] আংশিক সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। স্বদেশ পর্যায়ের বিভিন্ন গান ও কবিতায় দেবী কালীর মূর্তি অতি যত্নে এঁকেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই দেবীর ললাট নেত্র আগুন বরণ, তবু দুই নয়নে প্রেমের হাসি। ফলে বুঝতে অসুবিধা হয় না শ্রীরামকৃষ্ণ-

বিবেকানন্দ-নিবেদিতার মাতৃ সাধনার প্রতি আপাত উদাসীনতার আড়ালে রয়ে গিয়েছিল প্রচ্ছন্ন শ্রদ্ধার বোধ। রবীন্দ্রসাহিত্যে দেবলোককে এই শ্রদ্ধার বোধ নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের বিস্তৃত পাঠের পরিধিতে পাঠ্য ও অপাঠ্য কোনো বিষয়ই বাকি ছিল না। সেই সব প্রাচীন, মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক সাহিত্যের দেবতাভাবনার ইতিহাস আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা যেমন ছুঁতে পারলাম বাংলা সাহিত্যে দেবচর্চার ধারাটিকে তেমনি আভাস পেলাম রবীন্দ্রমনে দেবসংস্কারের ধরনটিকেও। রবীন্দ্রনাথের মনের এক নির্মাণপর্ব চলছিল প্রচলিত দেববিশ্বাস এবং আরোপিত ব্রাহ্মধর্মের পরস্পর বিপরীতমুখী আকর্ষণে তাঁর দেবসংস্কারের পৃথিবী বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। পারিবারিক সূত্রে তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম। কিশোর বয়সে যেমন তিনি পিতার ঔপনিষদিক ব্রাহ্মধর্মের অপৌত্তলিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তেমনি একই সঙ্গে মায়ের জীবনে দেখেছিলেন পৌত্তলিক ধর্মাচরণের নিষ্ঠা। শুধু তাই নয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের লোকসংস্কার এবং লোকপুরাণ আর পূর্বজ সাহিত্যিকদের দেবকল্পনার উত্তরাধিকার, ছেলেবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল। আবাল্য ব্রাহ্ম আবহাওয়ায় পালিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পরিণত বয়সে তাঁকে আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রাতিষ্ঠানিক ভাবাদর্শ প্রচারের পাশাপাশি উপাসনা মন্দিরের আচার্যের বেদিতে ধর্মোপদেষ্টার ভূমিকাও গ্রহণ করতে হয়েছিল। সেইজন্য তথাকথিত দেবসংস্কার তাঁর না থাকারই কথা। কিন্তু এই রবীন্দ্রনাথই নবীনচন্দ্রের বাড়িতে সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে ভেবেছিলেন যে তিনি 'অপৌত্তলিক' কিনা।

আসলে, পারিবারিক সূত্রে অর্জিত চিরাভ্যস্ত অপৌত্তলিক মানসিকতার গভীরে রবীন্দ্রনাথের মনে দৃঢ়মূল হয়েছিল পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির শতাব্দীবাহিত যৌথ নির্জ্ঞান। আর, মগ্নচেতনের এই স্মৃতিলোককে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের কবিমানস। জেগে উঠেছিলেন দেবদেবীরা বিচিত্র ভঙ্গিতে। বিবিধ প্রভাবে তাঁর দেবলোক হয়ে উঠেছিল একান্তভাবেই রাবীন্দ্রিক।

তথ্যসূত্র

১. আমার বাল্যকালে বাংলা সাহিত্যের কলেবর কৃশ ছিল, বোধ করি তখন পাঠ্য অপাঠ্য বাংলা বই যে কটা ছিল সমস্তই আমি শেষ করিয়াছিলাম।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ঘরের পড়া', জীবনস্মৃতি, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আগস্ট, ১৯৮৯, পৃ. ৩৯

২. তাঁহার সেই-সব কবিতা সরল বাঁশির সুরে আমার মনের মধ্যে মাঠের এবং বনের গান বাজাইয়া তুলিত।

তদেব, পৃ. ৪০

৩. এ সম্বন্ধে স্বর্ণকুমারী দেবী লিখেছেন: 'মনে আছে বাড়িতে মালিনী বই বিক্রী করিতে আসিলে মেয়ে মহল সেদিন কিরকম সরগরম হইয়া উঠিত। সে বটতলার যত কিছু নূতন বই, কাব্য, উপন্যাস, আষাঢ়ে গল্প অন্তঃপুরে আনিয়া দিদিদের লাইব্রেরীর কলেবর বৃদ্ধি করিয়া যাইত। ... বড় হইয়া সে-কালের বইগুলি যথেষ্ট নাড়াচাড়া করিয়াছি— মানভঞ্জন, প্রভাস মিলন, দূতী সংবাদ, কোকিল দূত, রুক্মিনীহরণ, পারিজাতহরণ, গীতগোবিন্দ, প্রহ্লাদচরিত্র, রতিবিলাপ, বস্ত্রহরণ, অন্নদামঙ্গল, আরব্যোপন্যাস, পারস্যোপন্যাস, চাহার দরবেশ, হাতেমতাই, গোলেক, লায়লা মজনু, বাসবদত্তা কামিনীকুমার ইত্যাদি।' মনে হয় এর সবগুলি না হলেও, বেশির ভাগই রবীন্দ্রনাথও পাঠ করেছিলেন।

প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, প্রথম খণ্ড, আনন্দ, প্রথম সংস্করণ : ১ বৈশাখ ১৩৮৯, পৃ. ১৩৩

৪. বিদ্যাপতির দুর্বোধ বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত। আমি টীকার উপর নির্ভর না করিয়া নিজে বুঝিতে চেষ্টা করিতাম। বিশেষ কোনো দুরূহ শব্দ সেখানে যতবার ব্যবহৃত হইয়াছে সমস্ত আমি একটি ছোট বাঁধানো খাতায় নোট করিয়া রাখিতাম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ঘরের পড়া', 'জীবনস্মৃতি', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ১৯৮৯, পৃ. ৪১

৫. এখন আমরা দেখিয়াছি, ঋগ্বেদে আছে যে দেবতা তেত্রিশটি, কবি, ভক্ত বা ঠাকুরাণী দিদিদের গল্পে গল্পে তেত্রিশকোটি হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম, *বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : দোল পূর্ণিমা ১৩৩৬; ত্রয়োদশ মুদ্রণ : মাঘ ১৪১১, পৃ. ৭১৫

৬. ঋষিগণ সমস্বরে
অই সামগান করে
চমকি উঠিছে আহা! হিমালয় গিরি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রকৃতির খেদ' (১৮৭৫ সালে তত্ত্ববোধনী পত্রিকায় ১৪ বছরের কবির কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল।

পম্পা মজুমদার, *রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৭৯, পৃ. ৫০

৭. পম্পা মজুমদার, *বৈদিক সাহিত্য : সংহিতা, রবীন্দ্র সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস*, 'দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৭২, পৃ. ৫৭

৮. বৈদিক কবিরাও জলে স্থলে প্রাণকে দেখিয়াছেন, হৃদয়কে দেখিয়াছেন। নদী মেঘ উষা অগ্নি ঝড়, বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে নহে, ইচ্ছাময় মূর্তিরূপে তাঁহাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কবি য়েটস্', পথের সঞ্চয়, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ৫৫৩

৯. ধনু হাতে করি রাম যারে এড়ে বাণ।
ত্রিভুবনে তাহার নাহিক পরিত্রাণ।।' (আদিকাণ্ড)

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), *রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৮৮৯, তৃতীয় মুদ্রণ : আগস্ট ১৯৫৭, পৃ. ৫৭

১০. ইন্দ্রেরে বান্ধিয়া আনি যদি নিজ ধাম (আদিকাণ্ড)

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), *রামায়ণ* কৃত্তিবাস বিরচিত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: তৃতীয় মুদ্রণ জুলাই ১৮৮৯, আগস্ট ১৯৫৭, পৃ. ৩৩

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভাষা ও ছন্দ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, কবিতা (পরিশিষ্ট), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১২৮৭

১২. সেকালে এমন কোনো ভট্টাচার্য ছিলেন না, যিনি বাংলা পদ্যে গীতার অনুবাদ না করিয়াছেন।

(ভগবদ্‌গীতা বিষয়ে বক্তৃতা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৯৮, চৈত্র)

পম্পা মজুমদার, ভগবদ্‌গীতা, *রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৭৯, জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১৪০

১৩. বৈষ্ণব সাহিত্য ও উপনিষৎ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনের হাওয়া তৈরি করিয়াছে। নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনে যেমন মেশে তেমনি করিয়াই মিশে।...

(রবীন্দ্রনাথের পত্র, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে লেখা, ১৪ কার্তিক, ১৩২৮)

তদেব, পৃ. ৩৩১

১৪. রাধাগোবিন্দ নাথ (সম্পা.), *গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন*, সপ্তম পর্ব (রসতত্ত্ব), প্রাচ্যবাণী মন্দির, প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৬০, পৃ. ২৭০৯

১৫. মহাভাব স্বরূপা শ্রী রাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ খনি কৃষ্ণ কাণ্ডা শিরোমণি।। (আদিলিলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং সুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পা.), শ্রীল কৃষ্ণদাস বিরচিত *শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত*, বি.সি. মজুমদার, বি.পি.এম'স প্রিন্টিং প্রেস, ২৪ পরগনা, মে ১৯৯৭, পৃ. ৩৬

১৬. রাধা নিখিল নায়িকাগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা নায়িকা রূপে পরিগণিতা এবং শ্রীকৃষ্ণের যোগ্যতমা লীলাসঙ্গিনী।

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), *উজ্জলনীলমণি*, ভারতী প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ৭২

১৭. কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে। (আদিলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং সুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পা.), শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ *শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃতম্*, বি.পি.এস. প্রিন্টিং প্রেস, ২৪ পরগনা, মে ১৯৯৭, পৃ. ৩৭

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বৈষ্ণব কবিতা', সোনার তরী, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৪৬১

১৯. বরাবর আমার বৈষ্ণবকবি এবং সংস্কৃত বই আনি। এবার আনি নি, সেইজন্যে এই দুটোরই আবশ্যক বেশি অনুভব হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পত্র ৮৬, ১৮৯৩ মার্চ ৩, *ছিন্নপত্রাবলী*, বিশ্বভারতী, নূতন সংস্করণ : চৈত্র ১৩৯৯, পৃ. ১৩৪

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্বপ্ন', শ্যামলী, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১৪৬

২১. এই গীতগোবিন্দে গীত থাকিতে পারে, কিন্তু গোবিন্দ আছেন কি না আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বলেন্দ্র-রচনাবলী*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মাঘ ১৩৬৯, পৃ. ২৯১

২২. জয়দেবের ভূত এখনো কাঁধে বসে ছন্দের সার্কাস করছে, কানের দখল ছাড়েনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সে', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯০৮, পৃ. ৬৯০

২৩. পাণিগ্রহণে পুলকিতং বপুরৈশং ভূতিভূষিতং জয়াতি।
অঙ্কুরিত ইব মনোভূর্যস্মিন ভস্মাবশেষোহপি।।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী (সম্পা.), *আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ*, সান্যাল অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ : রাসপূর্ণিমা ১৩৭৮, পৃ. ২৯০

২৪. সুখয়তিতরাং ন রক্ষতি পরিদয়লেশং গণাঙ্গনেব শ্রীঃ।
কুলকামিনী নোহ্যাতি বাগ্দেবী জন্মজন্মাপি।
(৬৭৮ সংখ্যক আর্যা, সকার ব্রজ্যা)

শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী (সম্পা.), *আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ*, সান্যাল অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ : রাসপূর্ণিমা ১৩৭৮, পৃ. ২৯৬

২৫. একং মহিষশিরঃ স্থিতং পরং সানন্দং সুরগণপ্রণতম্।
গিরিদুহিতুঃ পদযুগলং শোণিতমণিরাগরঞ্জিতং জয়তি।।

শম্ভুনাথ কুণ্ডু, *প্রাচীন বঙ্গে পৌরাণিক ধর্ম ও ভাবনা*, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪০২, পৃ. ৮৩

২৬. অরেরে বাহিতি কাহ্ন নাব।
ছোড়ি ডগমগ কুগই ন দেহি।।
তুঁহ এখনই সন্তার দেই।
জো চাহসি সো লেহি।।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, প্রথম খণ্ড, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ : ১৯৯৫, পৃ. ১২৬

২৭. শম্ভুনাথ কুণ্ডু, *প্রাচীন বঙ্গে পৌরাণিক ধর্ম ও দেবভাবনা*, বর্ধমান, প্রথম প্রকাশ : ১৪০২, পৃ. ৮৫

২৮. হেন শুনী ঈসত হাসিয়া ততিখনে।
ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে।।
ত্রহি দুই কেশ হইবে বসুলের ঘরে।
হলী বনমালী নাম দৈবকী উদরে।।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সম্পা.), *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র*, জন্মখণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ : অগ্রহায়ণ ১৪০৬, পৃ. ১৮৩

২৯. মনসা মহাদেবের কন্যা, জরৎকারু ঋষির পত্নী এবং বাসুকীর ভগিনী বনিয়া গেলেন, অনার্য ব্যাধের দেবী চণ্ডী শিবের অর্ধাঙ্গিনী উমা পার্বতীর সঙ্গে এক হইয়া গেলেন; ধর্মঠাকুর কোথাও বিষ্ণুর অবতার, কোথাও বুদ্ধ, কোথাও বা শিবের অনুচর রূপ মাহাত্ম্য লাভ করিলেন।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, দ্বিতীয় খণ্ড, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ : পুনর্মুদ্রণ : ১৯৯৬, ১৯৬২, পৃ. ৬৪

৩০. কপট করিয়া সাঁচা মিথা কথা কই।

আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ : বইমেলা ১৯৯৮, পৃ. ৩৩৭

৩১. হেমন্ত ঋষির বেটির গর্ব হল চূর্ণ।
মনসার মনোবাঞ্ছা হৈল সম্পূর্ণ।।
বিষদানে মরিল মহেশ মোর বাপ।
চণ্ডিকা রাণ্ডিয়া হৈল ঘুচিল সন্তাপ।।

তদেব, পৃ. ৩৩৯

৩২. মনে মনে কালকেতু করেন যুকতি।
ধনঘড়া নিয়ে পাছে পলায় পার্বতী।। (কালকেতুর ধনপ্রাপ্তি, নরখণ্ড)

সনৎকুমার নস্কর (সম্পা.), *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী* (কালকেতু পালা), রত্নাবলী, দ্বিতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ২৫৬

৩৩. আজি গণেশের মাতা রান্ধ মোর মত।
নিমে সিমে বেগুনে রান্ধিয়া দিবে তিত।।
সুকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর।
কুমড়া বার্ত্তাকু দিয়া রান্ধিবে প্রচুর।।
নটীয়া কাঁঠাল বিচি সার গোটা দশ।
ফুলবড়ি দিবে তাহে আর আদা রস।। (হরগৌরীর কলহারম্ভ, দেবখণ্ড)

তদেব, পৃ. ১৫২

৩৪. দুগ্ধ উথলিতে গৌরী নাহি দেহ পানি।
সখী সঙ্গে খেল পাশা দিবস রজনী।। (গৌরীর সঙ্গে মেনকার কলহ, দেবখণ্ড)

তদেব, পৃ. ১৪৯

৩৫. হাস্যা হাস্যা হর আস্যে যাত্যে ঘর পানে।
দেবী দিল দাবড়ি, রাখিল সেইখানে।।

পঞ্চানন চক্রবর্তী, *রামেশ্বর রচনাবলী*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: অগ্রহায়ণ ১৩৭১, পৃ. ৪৭৫

৩৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায় এবং সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), *ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৫০, চতুর্থ সংস্করণ : ফাল্গুন ১৩৬৯, পৃ. ১৫৯

৩৭. ধর্ম আর দেবতাঘেরা সাহিত্যে গোপন সুড়ঙ্গপথ রচনা করলেন ভারতচন্দ্র।

শিশিরকুমার দাস, *মধুসূদনের কবিমানস*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৯৮৯, পৃ. ১

৩৮. কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসান, প্রকৃতপক্ষে অধর্মেরই জয়গান। এই কাব্যে অন্যায়কারিণী ছলনাময়ী নিষ্ঠুর শক্তির হাতে শিব পরাভূত। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, এই পরাভবগানকেই মঙ্গলগান নাম দেওয়া হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাতায়নিকের পত্র, কালান্তর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯১০, পৃ. ৬২২

৩৯. ভাত খাঞা পুনরপি কৃড়া করসিঞা।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য এবং সুমঙ্গল রাণা (সম্পা.), *শ্রীকৃষ্ণবিজয়*, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০৩, পৃ. ১৮৭

৪০. মরি দুঃখেতে শঙ্করী, শঙ্কর ভিখারী, উপজীব্য ভিক্ষা করা, সদা বলি মা গিরিকে, আনগে গৌরীকে, কত কষ্ট উমার কৈলাসপুরে।

অমরেন্দ্র রায় (সম্পা.), শাক্ত পদাবলী (চয়ন), কলিকাতা, বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৭), পৃ. ৩১

৪১. দ্বিভূজা বালিকা আমার উমা ইন্দুবদনী।
কক্ষে লয়ে গজানন গমন গজগামিনী।। (দাশরথী রায়)

অমরেন্দ্র রায় (সম্পা.), শাক্ত পদাবলী (চয়ন), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭, পৃ. ১৯

৪২. তাহাতে কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তাহাদের শিখররাজি আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গ্রাম্যসাহিত্যে', লোকসাহিত্যে, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ, ১৯৮৯, পৃ. ১৯৯

৪৩. যেদিন বাংলাদেশে প্রগাঢ় অন্ধতা, কৃত্রিমতা, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার মধ্যে রামমোহন রায়ের আগমন হল সেদিন এই বিমুখ দেশে তিনিই একলা ভারতের নিত্য পরিচয় বহন করে এসেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতপথিক রামমোহন রায়, 'চারিত্র পূজা', *রবীন্দ্রনারচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : অগস্ট ১৯৮৯, পৃ. ১৯৫

৪৪. কালীপ্রসন্ন সিংহ, অরুণ নাগ (সম্পা.), *সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৫৭

৪৫. ১৮৩৯-এ আলেকজাণ্ডার ডাফ তাঁর 'ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইন্ডিয়া মিশনস' গ্রন্থে হিন্দুধর্মকে সরাসরি 'মিথ্যাধর্ম' বলে অভিহিত করলেন। খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে এর তুলনা করে বললেন, "Unlike christianity, which is all spirit and life, Hinduism is all letter and death." হিন্দু দেবদেবীদের সম্পর্কে অশ্রদ্ধেয় উক্তি করতেও তাঁর বাধেনি। তাঁর চোখে কালীর রূপ : "The supreme delight of this divinity, therefore consists in cruelty and torture, her ambrosia is the flesh of living votaries and sacrifice victims, and her sweetest hectar, the copious effusion of their blood."

স্বপন বসু, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ : অক্টোবর ২০০০, পৃ. ৬২

৪৬. আমাদের বর্তমান সমালোচ্য এই 'কবির গান'গুলিও গান, কিন্তু ইহাদের মধ্যে সেই ভাবের গাঢ়তা এবং গঠনের পারিপাট্য নাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কবি-সংগীত', লোকসাহিত্য, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ, ১৯৮৯, পৃ. ১৮৯

৪৭. নূতন হঠাৎ রাজার মনোরঞ্জনার্থে এই এক অপূর্ব নূতন ব্যাপারের সৃষ্টি হইল।

তদেব, পৃ. ১৮৯

৪৮. তাঁর ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি পাষাণকেও আর্দ্র, পাষণ্ডকেও ঈশ্বরানুরক্ত ও বিষয় নিমগ্ন মনকেও উদাসীন করে তুলতে পারে বলে রামগতি ন্যায়রত্ন সার্টিফিকেট দিয়েছেন।

স্বপন বসু, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ: অক্টোবর, ২০০০, পৃ. ২৩৫

৪৯. প্রাজ্ঞ পৌত্তলিকের কথোপকথন ছলে লেখা পাঁচটি প্রকরণে বিভক্ত এই বইটিতে প্রাচীন পূজাকে 'ঘুষ' দেওয়া বলেই ক্ষান্ত হন নি, সুর আরো চড়িয়ে বলেছেন : 'তাহাকে জগতের কারণ ও বিশ্বের নিয়ন্তা ইত্যাদি প্রকার ভাবনা করিয়া উপাসনা কর্ত্তব্য হয়, সুতরাং এই-রূপ শ্রবণ মননকে তাঁহার উপাসনা জানিবে, কিন্তু আইস তুমি বইস তুমি বস্ত্র ও অঙ্গুরি প্রভৃতি গ্রহণ কর, পুষ্পের আঘ্রান লও, আহার কর, পশ্চাৎ বিদায় হও, এই রূপ খেলা যাকে তোমরা উপাসনা কর, সে পুত্তলিকার উপাসনা বটে, কিন্তু পরমেশ্বরের উপাসনা নহে।'

তদেব, পৃ. ২৩৭

৫০. ১৪ মে ১৮৩১-এর 'সমাচার দর্পণ'-এ 'সংবাদ প্রভাকর' থেকে 'কস্যচিৎ কালীকিঙ্করস্য' পত্র পুনর্মুদ্রিত হয়। এতে জনৈক হিন্দু কলেজের ছাত্রের অভিনব আচরণ প্রকাশিত। কলকাতায় এক

গৃহস্থ ছেলেকে নিয়ে কালীঘাটে গিয়েছিলেন, সেখানে তাঁর ছেলেটি কালীকে প্রণাম না করে, 'কেবল বাক্যের দ্বারা সম্মান রাখিল যথা গুড মর্নিং ম্যাডম।'

তদেব, পৃ. ৩৭

৫১. মধুসূদন রেনেসাঁসের প্রথম কবি।

শিশিরকুমার দাস, *মধুসূদনের কবিমানস*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৯৮৯, পৃ. ৩

৫২. রাজনারায়ণ বসুকে লেখা '৫৭' সংখ্যক পত্র, ক্ষেত্রগুপ্ত (সম্পা.), *মধুসূদন রচনাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, সংশোধিত পরিবর্ধিত সংস্করণ : জুন ১৯৯৯, পৃ. ৫৪৭

৫৩. রাজনারায়ণ বসুকে লেখা ৭৬ সংখ্যক পত্র, তদেব, পৃ. ৫৩৯

৫৪. তদেব, 'মধুসূদন দত্ত : সাহিত্যসাধনা', পৃ. ৩৮

৫৫. দেবী ভাগবত অনুসারে ব্রহ্মার স্ত্রী সরস্বতী। ব্রহ্মার মুখ থেকে সরস্বতীর আবির্ভাব হয়। কিন্তু ব্রহ্মা দেবীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। মধুসূদন সনেটটিতে ব্রহ্মা ও সরস্বতীর সেই পৌরাণিক সম্পর্কটির প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। 'মোহিতে ব্রহ্মার মনঃ'— এই পঙ্‌ক্তিটি লক্ষ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

৫৬. ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পা.), *মেঘনাদবধ কাব্য*, ষষ্ঠ সর্গ বধ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৫, পরিবর্ধিত ও সংশোধিত সংস্করণ : ১৯৯৯, পৃ. ৮২

৫৭. তদেব।

৫৮. গ্রিক স্মরণশক্তির দেবী নিমোসিন ও দেবরাজ জিউসের কন্যাবৃন্দ। মিউজরা সাহিত্য ও শিল্পকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং এরা সংখ্যায় নয় জন।

ফরহাদ খান, *প্রতীচ্য পুরাণ*, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, বাংলাদেশ, পুনর্মুদ্রণ : অক্টোবর ২০০১, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ১৯৮৪, পৃ. ৬৬৭

৫৯. তপোব্রত ঘোষ, স্মৃতিযাত্রায় রবীন্দ্রনাথ, শিবাশিস দত্ত, পার্থ চক্রবর্তী ও অন্যান্য (সম্পা.), অবভাস, *প্রসঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ*, পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ, ২০০৬, পৃ. ৮-৯

৬০. ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত তরুণরা মূর্খ বালিকা সাঙ্গিনীর চেয়ে শিক্ষিতা, সমরুচিসম্পন্না জীবনসঙ্গিনী স্বপ্ন দেখত। এই স্বপ্নের সঙ্গিনীরাই উনিশ শতকের 'Enligntened Partner'। এই শব্দগুচ্ছটি আবার মধুসূদনের নারীশিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত।

৬১. আমি কি মৃগয়া করতে গিয়ে স্বয়ং কামব্যাধের লক্ষ হয়ে এলাম। এটি 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক রাজার উক্তি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫, পরিবর্ধিত ও সংশোধিত সংস্করণ ১৯৭৪, পৃ. ২৫

৬২. হে প্রভো অনঙ্গ, তুমি হরকোপানলে দগ্ধ হয়েছিলেন বলে, কি প্রতিহিংসার নিমিত্তে মানবজাতিকে কামাগ্নিতে সেইরূপ দগ্ধ কর? এটি 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক রাজার উক্তি।

তদেব।

৬৩. চলি গেলা মীনধ্বজ, নীড় ছাড়ি উড়ে
বিহঙ্গমরাজ যথা মুহুর্মুহু চাহি
সে সুখ সদনে।

তদেব, পৃ. ৫২

৬৪. রতি। রাজনন্দিনী আমার পোড়া স্বামীর কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন? তিনি আগুনে পুড়েও মরেন না। আর যেখানে সেখানে পান, কেবল লোকের মন মজিয়ে বেড়ান।

(পদ্মাবতী, মধুসূদন দত্ত)

তদেব, পৃ. ২৭২

৬৫. তদেব, পৃ. ১৬৩

৬৬. তদেব।

৬৭. বক। দুষ্ট দস্যুদল তবে দৈত্যদেশ আক্রমণে উদ্যত হল নাকি?

(মধুসূদন দত্তের লেখা 'শমিষ্ঠা' নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক)

তদেব, পৃ. ২০৭

৬৮. মধুসূদন দত্ত, *বুড় শালিখের ঘাড়ে রোঁ*, প্রথমাঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্ক, তদেব, পৃ. ২৫৪

৬৯. মনীষী রাজনারায়ণ বসু তাঁর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায় ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে এই মন্তব্য করেছিলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সাহিত্যসাধক চরিতমালা*, তৃতীয় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, চতুর্থ সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৬৮, প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৫০, পৃ. ৪৪

৭০. নবীনচন্দ্র সেন, আমার জীবন, রৈবতক কাব্য, সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), *নবীনচন্দ্র রচনাবলী*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ২৫ বৈশাখ ১৩৬৬, পৃ. ৪৬২

৭১. তদেব, পৃ. ১০৬

৭২. রবিবাবু যদি সরল অন্তঃকরণে 'রৈবতক'-এর প্রকৃত দোষ দেখাইয়া দেন, তবে অন্তত ব্রাহ্মধর্মটা ... কি, তাহা বুঝিব, কারণ রবিবাবু আদি ব্রাহ্ম সমাজ সম্পাদক।

রৈবতক কাব্য, আমার জীবন, তদেব, পৃ. ৪৬২

৭৩. তদেব, পৃ. ৪৬৩

৭৪. মৈত্রীবিরহ, প্রীতিবিরহ সরস্বতীবিরহ— যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া আমি সারদামঙ্গল সঙ্গীত রচনা করি।

(এইটি ১৯ অক্টোবর ১৮৮১ তারিখে রংপুর নিবাসী অনাথবন্ধু রায়কে লেখা বিহারীলালের পত্র)

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সাহিত্যসাধক চরিতমালা*, দ্বিতীয় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৬২, পৃ. ২৯

৭৫. কখন গেরুয়া পরা
ভীষণ ত্রিশূল ধরা
পদভরে কাঁপে ধরা, ভূধর অধীর

(তৃতীয় সর্গ, সারদামঙ্গল)

বিহারীলাল চক্রবর্তী, শ্রী প্রমথনাথ বিশী (সম্পা.), *বিহারীলাল রচনাসম্ভার*, মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ: ফাল্গুন ১৩৬৮, পৃ. ১৩৩

৭৬. অয়ি সরস্বতী! এস বুকে এস,
বড় আদরের ধন আমার,
অযতনে হায় হেন ম্লান বেশ,
করিয়ে রেখেছি আমি তোমার।
(বঙ্গসুন্দরী চিরপরাধিনী-র চতুর্থ কবিতা)

তদেব, পৃ. ৬৯

৭৭. তদেব, নবম সর্গ, পৃ. ৯৫

৭৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিহারীলাল, আধুনিক সাহিত্য, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃ. ৬৩৯

৭৯. অনেকে তাঁহাকে 'Prophet' মনে করিত, এবং এখন ব্যক্তি সম্পূর্ণ বা প্রায় সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া গেলেন, ব্যাপারটা কি?

ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী (সম্পা.), *ভূদেব রচনাসম্ভার*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: অগ্রহায়ণ ১৩৬৪, পৃ. ৫

৮০. তদেব।

৮১. ভূদেব মুখোপাধ্যায়, পুষ্পাঞ্জলি, প্রথম অধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী (সম্পা.), *ভূদেব রচনাসম্ভার*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৬৪, পৃ. ৩৭৩

৮২. তদেব।

৮৩. তদেব, পৃ. ৪০৮

৮৪. অর্থাৎ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। যে অন্য দেবতাকে ভজনা করে সে অবিধিপূর্ব্বক ঈশ্বরকেই ভজনা করে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দেবতত্ত্ব ও হিন্দু ধর্ম, যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ : দোলপূর্ণিমা ১৩৩১, ত্রয়োদশ মুদ্রণ: বৈশাখ ১৪০৫, পৃ. ৭৫০

৮৫. আগে আমি নাস্তিক ছিলাম। তাহা হইতে হিন্দুধর্মে আমার মতিগতি অতি আশ্চর্য রকমের। কেমন করিয়া তাহা হইল জানিলে লোকে আশ্চর্য হইবে।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচর্চা*, অশোক কুণ্ডু (সম্পা.), বঙ্কিম মৃত্যুশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, দি নিউ বুক স্টল, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৯৪, পৃ. ৩৭০

৮৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দুর্গোৎসব, যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.), *বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : দোলপূর্ণিমা ১৩৬১, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪০৫, পৃ. ৮৩

৮৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'দুর্গেশনন্দিনী', যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.), *বঙ্কিম রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ঊনবিংশ মুদ্রণ : মাঘ ১৪০৭, পৃ. ১৮

৮৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মৃণালিনী, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : ধাতুমূর্তি বিসর্জন, তদেব, পৃ. ২০২
'কালস্রোত' এই অত্যাধুনিক ধারণার কেন্দ্রবিন্দু দেবতাদের অনিবার্য মৃত্যুর কার্যকারণ, তাদের অবিনশ্বরতার পরিসমাপ্তি।

৮৯. উৎপল দত্ত, *গিরিশমানস*, এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৮৩, পৃ. ২৩৫

৯০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চদশ ক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রকাশ: ফাল্গুন ১৪০৬, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃ. ৬৩৯

৯১. তদেব, পৃ. ৬৪০

৯২. 'Kali the Mother' নিবেদিতার লেখা গ্রন্থ। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে Sonnenschein & Co. Ltd London থেকে পকেট সাইজে। ভারতীয় জীবনে এইটিই নিবেদিতার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ।

৯৩. Shankari Prasad Basu, (collected and Edited) Letters of Sister Nivedita, Vol.1, Letter No. 17 (dated Jan 30th 1899), Nababharat Publishers, Calcutta First Published: April 1982, p. 43

৯৪. এতেও ক্ষান্ত হননি শঙ্করীবাবু। রবীন্দ্রনাথের কাল সম্পর্কে ধারণাকে তিনি 'কালাপাহাড়ী উত্তেজনা' বলে অভিহিত করেছেন।
তুহিনশুভ্র ভট্টচার্য, *রবীন্দ্রনাথ চাইলেও বিবেকানন্দ মেশেন নি*, কারিগর, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ১২০

দ্বিতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক পরিমণ্ডলে দেবতত্ত্বচর্চার ধারা

রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ছিলেন। পুতুল পুজোয় তাঁর বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গে এক নিভৃত আলাপচারিতায় তিনি বলেছিলেন যে মাঝে মাঝে তাঁর মনে সংশয় জাগে যে তিনি 'পৌত্তলিক'[১] কিনা। এই বৈপ্লবিক মন্তব্যটি তাঁর দ্বিধাদ্বন্দ্বেভরা হিন্দুমনটিকে চিনতে সাহায্য করে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শ সন্তান হিসেবে এই কথাটি তাঁর মুখে নেহাতই বেমানান ছিল। ব্রাহ্ম পিতার সন্তান হওয়ার সুবাদে রবীন্দ্রনাথ এক নির্দিষ্ট ধর্মচর্চার আবহাওয়ায় বড়ো হয়ে উঠেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চুয়াল্লিশ এবং সারদাদেবীর পয়ঁত্রিশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। এই সেই সময়, যখন দেবেন্দ্রনাথের মনে বিষয়বৈরাগ্য এবং তার ফলে সারদাদেবীর অন্তরে ধর্মসঙ্কট জেগে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের জন্মের সময় থেকেই ব্রাহ্ম দেবেন্দ্রনাথ শুরু করেছিলেন বহু বছরের পৌত্তলিক ধর্মাচরণ থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্ম উপাসনার চেষ্টা। গৃহদেবতার পুজো বন্ধ করে পরিবারের মধ্যে শুরু করেছিলেন সমবেত ব্রহ্মোপাসনার রীতি। ফলে, ঠাকুরবাড়ির চণ্ডীমণ্ডপের প্রতিমার পীঠস্থানে তৈরি হয়েছিল উপাসনার বেদি আর ব্রাহ্মধর্মের বীজমন্ত্র শ্বেতপাথরের ভিতের ওপর প্রোথিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের জন্মের পর ঠাকুরপরিবারে জাতকর্ম থেকে আরম্ভ করে সকল অনুষ্ঠান অপৌত্তলিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন হতে শুরু করেছিল— সৌদামিনী দেবীর লেখা 'পিতৃস্মৃতি' থেকে এমন কথাও জানা যায়।[২] রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে নিজেকে 'ব্রাত্য' বলবেন। এই মন্তব্যের প্রেক্ষাপট যাইহোক না কেন, রবীন্দ্রজীবনের ক্ষেত্রে একথা আংশিক হলেও সত্য। তাঁর জন্মভূমি বাংলাদেশ, তাঁর পূর্বপুরুষের বংশধারা, তাঁর পরিবারের ধর্মীয় ও ব্যবহারিক আচরণ যে 'ব্রাত্য' বিশেষণে বিশেষিত হতে পারে এমন কথা বলেছিলেন প্রশান্তকুমার পাল।[৩] ঠাকুরপরিবারের বংশধারা আলোচনা করলে খুঁজে পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষদের ধর্মসঙ্কটের ইতিবৃত্ত। যশোর জেলার চেঙ্গুটিয়া পরগনার জমিদার হয়েও কেমন করে তাঁরা পিরালী বংশের সমাজচ্যুত ব্রাহ্মণে পরিণত হলেন, সেই ইতিহাস আলোচনার জন্য ফিরে যেতে হবে ঠাকুরবংশীয়দের ফেলে আসা জীবনচর্চায়।

রঘুনাথ আচার্যের বংশধর ছিলেন জয়কৃষ্ণ। তাঁর দুই ছেলের মধ্যে একজন ছিলেন দক্ষিণানাথ। দক্ষিণানাথের আবার চারটি ছেলে— কামদেব, জয়দেব, রতিদেব এবং শুকদেব। সামান্য এক রসিকতার ভয়াবহ পরিণতি হিসেবে কামদেব ও জয়দেবকে কামাল খাঁ এবং জামাল খাঁ নাম নিয়ে

মুসলিম সমাজের অঙ্গ রূপে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছিল। সেই সময় মানুষের মনে ভ্রান্ত ধর্মসংস্কার ও নিষ্ঠুর সমাজ কতটা ভর করেছিল, এই ঘটনাটি ছিল তারই নিদর্শন। খান জাহান আলি যশোর জেলার চেঙ্গুটিয়া পরগনার কর্তৃত্ব লাভ করার পর, তার সঙ্গে তাহের খাঁ নামের এক ব্যক্তি আসেন। তিনি ছিলেন ধর্মান্তরিত মুসলমান। নবদ্বীপের কাছে পিরল্যা গ্রামে কোনো এক সময় বসবাস করেছিলেন বলে সকলের কাছে তিনি পিরল্যা খাঁ বলে পরিচিত ছিলেন। কিংবদন্তী অনুসারে তাহের রোজা চলাকালীন একটি লেবুর ঘ্রাণ নেওয়ায় কামদেব তামাশা করে তাহেরের রোজা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা বলেন। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে কামদেব ও জয়দেবকে গোমাংসের গন্ধ এবং স্বাদ দুটিই অনুভব করানো হয়। ঘোষণা করে দেওয়া হয় তাঁরা নাকি এই পদ্ধতিতেই মুসলমান হয়ে গিয়েছেন। চিরকালের গোঁড়া হিন্দুসমাজ শুধু তাদের নয়, তাঁদের জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলকেই পিরালী থাকের ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিগণিত করে তবে তৃপ্তি পেয়েছিল। 'পির' অর্থাৎ মুসলমান সংসর্গ হয়েছিল তাই পিরালী ব্রাহ্মণ, আবার অনেকে মনে করেন পিরল্যা খাঁয়ের সংসর্গের জন্য এই ধরনের নামকরণ করা হয়েছিল। শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'যেসব পরিবার কুলাচার্যগণের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া সমাজে পতিত থাকিয়া গেল, তাঁহাদেরই অন্যতম হইতেছে পীরালী ব্রাহ্মণগণ।'[৪] ঠাকুরপরিবার যে সুদূর অতীতেও সমাজের চিরাচরিত রীতির সঙ্গে আপোষ করেনি কামদেব ও জয়দেবের কামাল খাঁ ও জামাল খাঁ হয়ে যাওয়ার ঘটনাটিকে তারই নিদর্শন হিসাবে গণ্য করা উচিত। কামদেবের অন্য দুই ভাই রতিদেব ও শুকদেব দক্ষিণডিহির বাড়িতে থাকতেন। এই ঘটনার জেরে, সামাজিক অত্যাচারের কারণে তাঁরা গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হন। বহু কষ্টে, অনেক ছল-চাতুরীর আশ্রয় করে, অনেক অর্থব্যয় করে পরিবারের মেয়েদের বিয়ে দেন। এইভাবেই শুকদেবের মেয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন পিঠাভোগের জমিদার জগন্নাথ কুশারীর সঙ্গে। পিরালীদের সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়ায় তিনিও যথারীতি সমাজের রোষদৃষ্টিতে পড়েন এবং অবশ্যম্ভাবীভাবে সমাজে পতিত হন। ফলে, তাঁকে পিঠাভোগ ত্যাগ করে দক্ষিণডিহিতে শ্বশুরবাড়ি চলে আসতে হয়। এই জগন্নাথ কুশারীই ছিলেন ঠাকুরগোষ্ঠীর আদিপুরুষ। তাঁর দ্বিতীয় সন্তানের নাম ছিল পুরুষোত্তম। তারিখহীন এক চিঠিতে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্ঞানদানন্দিনীকে জানিয়েছিলেন যে এই পুরুষোত্তম নাকি এক মুসলমান রাজকুমারীকে বিয়ে করে সমাজে পতিত হয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁদের পিরালী হওয়ার অন্তরালে এই কাহিনিটির অস্তিত্ব অনুমান করতেন।[৫] পুরুষোত্তমের প্রপৌত্র রামানন্দের দুই সন্তান ছিলেন মহেশ্বর ও শুকদেব। তাঁরা দুজনে জ্ঞাতিদের মধ্যে অশান্তির কারণে বিরক্ত হয়ে নিজেদের গ্রাম ত্যাগ করে কলকাতা গ্রামের দক্ষিণে গোবিন্দপুরে এসে থাকতে শুরু করেন এবং এখানেই

গৃহদেবতা হিসাবে শিব প্রতিষ্ঠা করেন। গঙ্গাতীরে জমি কেনা এবং বাড়িতে শিব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তাঁদের পৌত্তলিক ব্রাহ্মণ পরিচয়টিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুসলমান সংসর্গ তাঁদের মনের হিন্দু ব্রাহ্মণ সংস্কারের বিলুপ্তি ঘটাতে পারেনি। এইসময় ইংরেজদের বাণিজ্যতরী এসে ভিড়ত গোবিন্দপুরের গঙ্গায়। কুশারীদের এক উত্তরপুরুষ পঞ্চানন কুশারী, ইংরেজ কাপ্তেনদের এইসব জাহাজে মালপত্র ওঠানো নামানো ও খাদ্যপানীয় সংগ্রহের কাজে প্রবৃত্ত হন। এইসব শ্রমসাধ্য কাজে তথাকথিত নিম্নশ্রেণির লোকেরা তাঁর সহায় ছিল। নিম্নশ্রেণির এইসব মানুষদের আন্তরিক সম্বোধনে পঞ্চানন এবং তাঁর বংশধরেরা 'ঠাকুরমশাই' হিসেবে পরিচিত হলেন। পরবর্তীকালে 'কুশারী' পদবীর পরিবর্তে 'ঠাকুর' পদবীই গ্রহণ করলেন তাঁরা। পঞ্চাননের দুই ছেলের নাম ছিল— জয়রাম এবং জয়সন্তোষ। জয়রামের চার ছেলে আনন্দীরাম, নীলমণি, দর্পনারায়ণ এবং গোবিন্দরাম ১৭৬৪ অব্দে কলকাতা গ্রামে পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে জমি কিনে বসতবাড়ি তৈরি করেন এবং বাবার নির্দেশে তেরো হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ কিনে গৃহদেবতা শ্রী শ্রী রাধাকান্ত জিউ-এর নামে ব্রহ্মত্র করে দেন। ঐ টাকার সুদে দেবপূজার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু পাথুরিয়াঘাটার এই একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন একদিন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল নীলমণি ও দর্পনারায়ণের মনোমালিন্যের কারণে। পরিণতি নীলমণি নগদ এক লক্ষ টাকা ও লক্ষ্মী জনার্দনের ভার নিয়ে পাথুরিয়াঘাটার বাড়ি আর ব্রহ্মত্র সম্পত্তি ছোটো ভাইকে ছেড়ে দিলেন। তিনি জোড়াবাগানের বৈষ্ণবচরণ শেঠের কাছ থেকে বর্তমান জোড়াসাঁকোর বাড়ির এক বিঘা জমি ব্রহ্মত্র হিসেবে লাভ করেন। তখন এই পল্লীর নাম জোড়াসাঁকো ছিল না। 'মেছুয়াবাজার' হিসেবেই অঞ্চলটি বিখ্যাত ছিল এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে নীলমণি ঠাকুরের বংশধরদের সকলে 'মেছুয়াবাজারের গোঁড়া' বলে সম্বোধন করতেন। অর্থাৎ, পিরালী থাকের ব্রাহ্মণ হয়েও রাধাকান্ত জিউ, লক্ষ্মীজনার্দন বা শালগ্রামশিলার নিষ্ঠাবান সেবায়েত হিসেবেই ঠাকুরপরিবার সমাজে সদ্য মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমল থেকে ঠাকুর পরিবারে শুরু হয়েছিল এক নতুন সময়। সদ্যজাগ্রত উনিশ শতকের চালচিত্রে ঠাকুরবাড়ির ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় কিছু পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ঘটনা ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনের ধর্মসংস্কার আলোচনা করতে বসে আমাদের লক্ষ করতে হবে তাঁর পূর্বপুরুষদের ধর্মভাবনার ধারণাটিকে, যার প্রভাবে প্রথম উন্মোচিত হয়েছিল তাঁর ধর্মদৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের শৈশবের দিনগুলি কেটেছিল ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে। কখনো ভৃত্যশাসনের কঠোর গণ্ডিতে আবার কখনো পরিবারের নারীদের স্নেহ-ছত্রছায়ায়। ঠাকুরবাড়ির ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রেও একটি

দ্বিমুখী স্রোত লক্ষ করা যায়। একদিকে দেবেন্দ্রনাথ এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্ররা অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি দৃঢ় করতে সদাজাগ্রত চোখ মেলে রেখেছিলেন বাইরের জগতে, আর অন্যদিকে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল গোপনে, তাঁদের অজান্তে বজায় রেখেছিল পৌত্তলিক আবহাওয়া। শিল্প এবং সাহিত্যচর্চার সঙ্গে সঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে অনেক চেষ্টাতেও নির্মূল হয়নি দেবভাবনা। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথের মনের গহনে আশ্চর্য এক মিশেল ঘটেছিল পৌত্তলিক এবং অপৌত্তলিক সংস্কারের। তাঁর পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের দেবসংস্কার আলোচনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের দেবভাবনার স্বরূপটি জানার চেষ্টা করা যেতে পারে। আলোচনা শুরু করা যাক ঠাকুরবংশের প্রবাদপ্রতিম পুরুষদের দেবভাবনার প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে।

দ্বারকানাথ

দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন রামমণির সন্তান, কিন্তু সুলক্ষণযুক্ত দ্বারকানাথকে রামলোচন এবং অলকাদেবী দত্তক নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর প্রিন্স দ্বারকানাথ হয়ে ওঠার কাহিনি কারো অজানা নয়। তিনিও যে প্রথম জীবনে আচারনিষ্ঠ হিন্দুই ছিলেন, একথা জোরের সঙ্গে বলা যায়। তিনি প্রতিদিন দু'ঘন্টা ধরে জপধ্যান করতেন। প্রথমবার বিলেত গিয়ে যে বাড়িতে থাকতেন, সেই বাড়ির একটি ঘরে গঙ্গামাটির প্রলেপ দিয়ে নিয়মিত ইষ্টমন্ত্র জপ করতেন। তাঁর আচারনিষ্ঠা সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত আছে। একদিন বিলেতে থাকাকালীন ডাচেস অফ সাদারল্যান্ড তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে অপেক্ষায় বসেছিলেন, কিন্তু দ্বারকানাথ জপ শেষ না করে ওঠেননি। দেশে থাকাকালীন সন্ধ্যারতির সময় নিয়মিত ঠাকুরদালানে যেতেন প্রতিমাকে প্রণাম করতে। ১৮১৫ সালে একেশ্বরবাদী হিন্দু ধর্মবিষয়ে আলোচনার জন্য রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আত্মীয়সভা। দ্বারকানাথ নিষ্ঠাবান মূর্তিপূজক হয়েও এইসব আলোচনায় যোগ দিতেন এবং ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে সমর্থনও করেছিলেন। যদিও ব্রাহ্মধর্ম সেইসময় একটি দার্শনিক ধারণা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। রামমোহনের আধুনিক অপৌত্তলিক চিন্তাভাবনার সহযোগী এবং পৃষ্ঠপোষক হওয়া সত্ত্বেও তিনি জোড়াসাঁকোর অন্দরমহলে কঠোর বৈষ্ণবীয় প্রথাকে বজায় রেখেছিলেন। নিয়মিত নিরামিষ খাওয়া ছাড়াও নিজের হাতে গৃহদেবতার নিত্যসেবা করতেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। তাঁর আমলে মহা আড়ম্বরে পালন করা হত দুর্গা পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা এবং সরস্বতী পূজা। বাড়িতে কুমোর এনে প্রতিমা গড়া হত। বাড়ির জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মুখ গড়া হত দ্বারকানাথের পত্নী দিগম্বরী দেবীর মুখের আদলে। পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে উপনিষদ ও বেদান্তদর্শন পড়তে শুরু করেন

তখন দ্বারকানাথ যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'আমি তো বিদ্যাবাগীশকে ভাল বলিয়া জানিতাম, কিন্তু এখন দেখি যে, তিনি দেবেন্দ্রর কানে ব্রহ্মমন্ত্র দিয়া তাকে খারাপ করিতেছেন।'[৬] অথচ, এই দ্বারকানাথ ঠাকুরই সঙ্গদোষে তাঁর ধর্মাচরণের অভ্যাস পরিবর্তন করে ফেলেছিলেন। সেই কারণে স্ত্রী দিগম্বরীর সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য সম্পর্কে ভাঙন ধরেছিল— সেই ইতিবৃত্ত সকলেরই জানা। দ্বারকানাথ পত্নীর বিশ্বাসে আঘাত না করে বৈঠকখানা বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। ১৮৪৬ সালে লন্ডনের কাছে সারেতে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ করলে দেখা যায়, তাঁর তথাকথিত ভ্রষ্টাচার কিন্তু ঠাকুরবাড়ির বৈষ্ণবীয় আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি।

দেবেন্দ্রনাথ

ঠাকুরবাড়ির পৌত্তলিক ধর্মবিশ্বাসের ভিত যিনি নাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি আর কেউ নন, ঠাকুরবংশের কলকাতাবাসী পঞ্চম পুরুষ— দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভাবলে অবাক লাগে যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একসময় ছিলেন ঘোর পৌত্তলিক। পিতামহী অলকাদেবীর সঙ্গে নিয়মিত কালীঘাটে যেতেন দেবেন্দ্রনাথ। বিদ্যালয়ে যাবার পথে প্রতিদিনই ঠনঠনিয়া সিদ্ধেশ্বরী কালীমূর্তিকে প্রণাম করে যেতেন। ছেলেবেলার স্মৃতিচারণে দেবেন্দ্রনাথ প্রথম জীবনের পৌত্তলিক সংস্কারের কথা অকপটে স্বীকার করেছিলেন। বলেছিলেন 'প্রথম বয়সে উপনয়নের পর যখন গৃহেতে শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা দেখিতাম, প্রতি বৎসর যখন দুর্গাপূজার উৎসবে উৎসাহিত হইতাম, প্রতিদিন যখন বিদ্যালয়ে যাইবার পথে ঠনঠনিয়া সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া পাঠের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য বর প্রার্থনা করিতাম, তখন মনের এই বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বরই শালগ্রাম শিলা, ঈশ্বরই দশভুজা দুর্গা, ঈশ্বরই চতুর্ভুজা সিদ্ধেশ্বরী।'[৭] এইসময় তাঁদের বাড়িতে মহাসমারোহে দুর্গা, জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি শাক্তদেবীদের পুজো হত। সৌদামিনী দেবীর লেখা 'পিতৃস্মৃতি' থেকে জানা যায় অল্পবয়সে দেবেন্দ্রনাথ একবার সরস্বতী পূজা করিয়েছিলেন। এত অর্থব্যয় হয়েছিল যে সেই পার্বণে গাঁদাফুল ও সন্দেশ দুর্লভ হয়ে পড়েছিল। প্রতিমাও এত বিশাল হয়েছিল যে বিসর্জনের সময় নানা কৌশলে তা বাড়ি থেকে বার করতে হয়।[৮] দ্বারকানাথের আমলের দুর্গাপুজোর সমারোহ দেবেন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে মহাসমারোহে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে রামমোহনের মতোই একেশ্বরবাদী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবেন, একথা কেই-বা জানত। ১৮৩৮ সালে পিতামহী অলকাদেবীর মৃত্যু দেবেন্দ্রনাথকে যেন এক নতুন পথের সন্ধান দিয়ে গেল। অনাস্বাদিত এক স্বর্গীয় অনুভূতি এবং ঈশোপনিষদের তাৎপর্যপূর্ণ একটি শ্লোক[৯] ছুঁয়ে গেল তাঁর মনকে। রামমোহনের মতোই দেবেন্দ্রনাথের মন থেকেও প্রতিমা পূজার প্রতি বিশ্বাস উঠে গেল। সেইসময়

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে নিয়মিত উপনিষদ অধ্যয়ন করে নিজের মনের অজস্র প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। সুকিয়া স্ট্রিটে বাড়ি ভাড়া করে ১৮৩৯ সালে প্রতিষ্ঠা করে ফেললেন তত্ত্ববোধিনী সভা। সম্ভবত দ্বারকানাথের বিরক্তি এবং বিরোধিতায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ির বাইরেই সভার কাজ চালাতেন। তবে, ভাইদের নিয়ে সেইসময় তিনি একটি দল বেঁধেছিলেন। সঙ্কল্প করেছিলেন যে পুজোর সময় পূজার দালানে কেউ যাবেন না। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা আরতির সময় দ্বারকানাথের ভয়ে তাঁদেরও দালানে যেতে হত। কিন্তু সকলে যখন ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতেন তখন দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীরা প্রণাম না করেই দাঁড়িয়ে থাকতেন। আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর অপৌত্তলিক হওয়ার কারণ উল্লেখ করেছিলেন— 'যখন আমি বুঝলাম যে ঈশ্বরের শরীর নাই, তাহার প্রতিমা নাই, তখন হইতে আমার পৌত্তলিকতার উপর ভারি বিদ্বেষ জন্মিল।'[১০] বিদেশে থাকাকালীন দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়। দ্বারকানাথের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গার তীরে তাঁর 'কুশপুত্তলিকা' নির্মাণ করে দাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কিন্তু অপৌত্তলিক পদ্ধতিতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করার মধ্য দিয়ে দেবেন্দ্রনাথ দৃঢ়ভাবে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করলেন এবং বৈষ্ণব কট্টর পৌত্তলিক জ্ঞাতিরা সেই কারণে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে পরিত্যাগ করলেন। এই প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে জ্ঞাতি বন্ধুরা তাঁকে ত্যাগ করলেও ঈশ্বর তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মের জয়ে তিনি যে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন, এছাড়া তিনি আর কিছুই চাননি।[১১] ধর্মভীরু গিরীন্দ্রনাথ কিন্তু প্রচলিত রীতিকে অনুসরণ করেই পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেছিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ নিজের বয়োজ্যেষ্ঠ কোনো জ্ঞাতির অনুরোধেই বৃষোৎসর্গের যূপকাষ্ঠ স্পর্শ করেননি। এই নিয়ে তুমুল পারিবারিক আন্দোলনের সূচনা হল এবং বেশিরভাগ আত্মীয়স্বজন তাঁকে এড়িয়ে চলতে শুরু করলেন। দেবেন্দ্রনাথ দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর গৃহদেবতার পূজা পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন। চণ্ডীমণ্ডপে শুরু হল নিয়মিত ব্রহ্মোপাসনা এবং ব্রাহ্মধর্মের বীজমন্ত্র শ্বেতপাথরে গেঁথে রাখা হল। দেবেন্দ্রনাথ অধিকাংশ পূজা পার্বণ লুপ্ত করে মাঘোৎসব, নববর্ষ, দীক্ষাদিন প্রভৃতি উৎসবের সূচনা করিয়ে প্রাচীন পালাপার্বণের অভাব দূর করার চেষ্টা করেছিলেন। সৌদামিনী দেবীর লেখা স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যখন পাঁচ-ছয় বছর বয়স তখন তিনি শালগ্রামশিলা নিয়ে খেলতে বসেছিলেন। সে যাত্রা অনেক শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে ঠাকুর পরিবার তাঁদের পৌত্তলিক ধর্মরক্ষা করেছিল। কিন্তু পরিণত দেবেন্দ্রনাথের এই ধর্মবিদ্রোহে ঠাকুরবাড়ির পৌত্তলিক দেবসংস্কার ছত্রখান হয়ে যায়। ১৮৫০ সালে জগদ্ধাত্রী পূজা উঠে গেলেও আত্মীয়স্বজনদের প্রবল আপত্তিতে দেবেন্দ্রনাথ দুর্গাপূজা তুলে দিতে পারলেন না। সেইজন্য প্রতি বছর পুজোর সময় দেবেন্দ্রনাথ দেশভ্রমণে যেতেন।

তাঁর এই কঠোর অপৌত্তলিক আচরণ যে পরবর্তীকালে তাঁর সন্তানদের প্রভাবিত করবে একথা বলাই বাহুল্য। সামাজিক এবং পারিবারিক এই দুই ক্ষেত্রেই দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন গোঁড়া অপৌত্তলিক। সেই কারণে কেশবচন্দ্রের 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'-এর মধ্যে নতুন ধরনের পৌত্তলিকতার আভাস পেয়ে দেবেন্দ্রনাথ তাঁকেও সামাজিকভাবে পরিত্যাগ করেন। ১৮৪৮ সালে 'ব্রাহ্মধর্ম' রচনার মধ্য দিয়ে নিজের ধর্মবিশ্বাসের এক বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটালেন।

দ্বারকানাথ ব্যভিচারের স্রোতে গা ভাসিয়ে তাঁদের পরিবারের বৈষ্ণবীয় আবহাওয়ার অমর্যাদা করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ আবার নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠার জন্য সদ্য হিন্দুসমাজে মাথা তুলে ওঠা ঠাকুরপরিবারকে প্রায় নির্বাসিত করে দিয়েছিলেন মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন এক দ্বিধাগ্রস্ত ধর্মচেতনার অন্ধকারে। দ্বিধা দেবেন্দ্রনাথের অন্তরেও ছিল। সেই কারণেই দ্বারকানাথের শ্রাদ্ধের আগের রাতে দেবেন্দ্রনাথের স্বপ্নে আসেন তাঁর মা দিগম্বরী দেবী, যিনি পৌত্তলিক আচার পালনের জন্য সেই যুগে স্বামীকেও ত্যাগ করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী থেকেই জানা যায়, স্বপ্নে মা তাঁর ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণকে সমর্থন করেছিলেন।[১২] স্বপ্নে মায়ের সমর্থন পেয়ে দেবেন্দ্রনাথের মনের দ্বিধা দূর হয়। আমরা জানি, স্বপ্ন আমাদের মনের ইচ্ছার প্রতিফলন মাত্র। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিজের স্বপ্নের অন্তরালে নিজের আবাল্য সংস্কার ও ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়ার বাসনার দ্বন্দ্বকে আড়াল করতে চেয়েছিলেন। নিষ্ঠাবতী মায়ের সমর্থন এইভাবে স্বপ্নে আদায় করে পৌত্তলিক পিতার শ্রাদ্ধের দিনটিকে বেছে নিয়েছিলেন নিজের ধর্মমত প্রতিষ্ঠার মাহেন্দ্রক্ষণ হিসেবে। দেবন্দ্রেনাথের জীবনাবসান হয় ১৯০৫ সালে। এই দীর্ঘ জীবনে তিনি তাঁর খ্যাতিমান পুত্রদের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় কোনোভাবেই তাঁর প্রভাবমুক্ত হতে পারেননি। দেবেন্দ্রনাথের আরোপ করা অপৌত্তলিক সংস্কার যেন তাঁর সন্তানরা বহন করতে বাধ্য ছিলেন। আবার মগ্নচেতনে বয়ে যাওয়া হিন্দু পৌত্তলিক সংস্কার যে ব্যক্তিগত জীবনে তাঁদের দ্বিধাগ্রস্ত করেছিল, ইতিহাসে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহচর্যে রবীন্দ্রনাথ বড়ো হয়ে উঠেছিলেন। এঁদেরকে ঘিরেই বিকশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ভাববিনিময়ের জগৎ। সেই কারণে তাঁদের দেবসংস্কারের ইতিবৃত্ত-ও আমাদের আলোচনাকে সমৃদ্ধ করবে। দ্বিজেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা থেকে তাঁর আমলের ঠাকুরপরিবারের জীবনচর্যা সম্পর্কে জানা যায়। যদিও দেবেন্দ্রনাথ দুর্গাপূজায়

অংশগ্রহণ না করে 'বিদেশ পর্যটনে' যেতেন, তবু পুজোর আনন্দে কোনো ফাঁক থাকত না। দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজেও যে এই পুজো অত্যন্ত উপভোগ করতেন, সেকথাও তাঁর স্মৃতিচারণের ভঙ্গি থেকে অনুমান করা যায়। অপৌত্তলিক বাড়ির সন্তান হয়েও তিনি গর্বের সঙ্গে জানিয়েছিলেন, 'বোধহয় আমাদের প্রতিমা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে সুন্দর হইত।'[১৩] পুজোর বহু আগে থেকে দর্জি এবং মুহুরীদের আনাগোনায় যে আনন্দের বিস্তার ঘটত, সেই আনন্দকে উপভোগ করতে দ্বিজেন্দ্রনাথ দ্বিধাগ্রস্ত হননি, যদিও তিনি ব্রাহ্ম সমাজের অংশ ছিলেন। প্রতিমাপূজা যে একটি 'বৃহৎ সামাজিক উৎসব' তা মেনে নিতে তার শিক্ষিত মন কোনোভাবেই দোটানায় পড়েনি। দেবেন্দ্রনাথের পুজোর সময় না থাকা এবং মহাসমারোহে পূজা চালিয়ে যাওয়ার মধ্যে আদৌ যে কোনো বিরোধ আছে তা অন্তত দ্বিজেন্দ্রনাথের মন্তব্যের মধ্যে ধরা পড়ে না—

> ...আমার পিতৃদেব ব্রাহ্মধর্মানুরাগ বশতঃ পূজার সময় বাড়ি থাকিতেন না। তিনি কিছু আগে হইতেই বিদেশ পর্যটনে বাহির হইতেন। ... কিন্তু তাই বলিয়া পূজার উৎসবের কোনো ত্রুটি কোনো ব্যতিক্রম হইত না।[১৪]

আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। তিনি ছিলেন উপবীতত্যাগী ব্রাহ্ম, কিন্তু ১৮৭৮ সালের ৩০ নভেম্বর তাঁর ছেলে দ্বিপেন্দ্রনাথের বিয়েতে আচার্যের কাজ করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। তিনি উপবীতত্যাগী ব্রাহ্ম হলেও বিয়ের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছিলেন উপবীত ধারণ করেই। এই নিয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রবল বাদানুবাদ হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ থিওসফি বা দিব্যপ্রেরণার ফলে ঈশ্বরকে জানার বিষয়েও উৎসাহী ছিলেন। তিনি বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটির সদস্যও ছিলেন। ছকে বাঁধা কোনো ধর্মমতের আওতায় দ্বিজেন্দ্রনাথ যে পড়তেন না, তাঁর খামখেয়ালি ব্যক্তিত্বই তা প্রমাণ করে। নির্জনে লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রবাহিত হত তাঁর জ্ঞানচর্চার ধারা, সেখানে অন্য কোনোভাবে তাঁর দেবসংস্কার বিকশিত হয়েছিল কিনা জানা নেই।

সত্যেন্দ্রনাথ

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের আরেক কৃতী সন্তান। প্রয়োজনে দেবেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কথা বলতেও দ্বিধাগ্রস্ত হননি তিনি। সেই কারণে, জোরের সঙ্গেই বলা যায় ব্রাহ্ম পিতার কট্টর অপৌত্তলিকতা তাঁর উপর প্রভাব ফেললেও তাঁকে গ্রস্ত করতে পারেনি। নয় বছর বয়সে সত্যেন্দ্রনাথের উপনয়ন হয়, তখনও পর্যন্ত তাঁদের পরিবার নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবার হিসাবে সমাজে চিহ্নিত ছিল। তাঁর স্মৃতিচারণেও ভেসে আসে পুতুলপূজার প্রসঙ্গ— 'আমাদের বাড়ি দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী এই দুই পুজা হত। দুর্গোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হত।'[১৫] আবার এই প্রশস্তির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্ম পিতার সন্তান হিসাবে তাঁর অপৌত্তলিক স্বরটিও শোনা যায়। 'যাকে ইংরাজিতে বলে Iconoclast আমি তাই ছিলুম—

তার কারণ পৈত্রিক সংস্কারই বল আর যাই বল।'[১৬] একসময় যখন তাঁদের বাড়িতে সরস্বতী পূজা হত, তখন একদিন হাতের দক্ষিণার টাকা দেবীর ওপরে সজোরে নিক্ষেপ করে দেবীর মুকুট ভেঙে দিয়েছিলেন। মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে এই যে তাঁর শৈশবের জেহাদ ঘোষণা, তা যে হঠাৎ আরোপিত ব্রাহ্মধর্মের ক্ষণিক উত্তেজনার প্রকাশমাত্র সেকথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ১৮৫৮ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁর সঙ্গে পরিচিতির সূত্রেই কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের ছত্রচ্ছায়ায় আসেন। দেবেন্দ্রনাথ ওই বছর পুজোর সময় যখন সিংহল ভ্রমণে গিয়েছিলেন তখন সত্যেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের লেখা থেকেই আমরা জানতে পারি যে ব্রাহ্মসমাজের বেদী থেকে দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়বেদী উপদেশ ও প্রার্থনা এবং তাঁদের রচিত নতুন নতুন ব্রহ্মসঙ্গীত মিলে সমাজে সাপ্তাহিক উপাসনার মধ্যে এক নতুন শ্রী, নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছিল। যে ব্রাহ্মধর্ম তার তাত্ত্বিকরূপ পরিহার করে একটি আনুষ্ঠানিক ধর্মমতের চেহারা পেয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথ সেই ব্রাহ্মধর্মের প্রতিই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পরবর্তীকালেও সত্যেন্দ্রনাথ যখন যখন কলকাতায় আসতেন, তখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দায়িত্বপালন করতেন নিষ্ঠার সঙ্গে। আবার, তাঁর ধর্মভাবনাও যে দ্বিধামুক্ত ছিল এমন কথা বলা যায় না। ১৮৬৮ সালের ২৮ নভেম্বর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'সেদিন কীর্তনের বিষয়টা কি তাহা লিখি নাই— কালীয়দমন— কৃষ্ণ সেই সাপকে দমন করিয়া তাহার মাথার উপর নৃত্য করিয়াছিলেন। দেবতাদের মধ্যে কৃষ্ণকে আমি দেখিতে পারি না ও কৃষ্ণচরিত্র কিছুই ভাল লাগে না।'[১৭] অথচ, এই সত্যেন্দ্রনাথই অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ সম্পাদনা করেছিলেন ভগবদ্গীতা। অনেক বছর পরে রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথের অভিষেক সম্পন্ন করিয়েছিলেন গোপীনাথের আর্শীবাদ মাথায় দিয়ে। সত্যেন্দ্রনাথের মনে দেববিশ্বাসের জমি তৈরির একটা ইঙ্গিত এই ঘটনাগুলি, যার অন্তরালে থাকতে পারে পত্নী জ্ঞানদানন্দিনীর প্রভাব, যা আমরা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করব।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনে সবচেয়ে বেশি। বাইরের পৃথিবীতে দেবেন্দ্রনাথের অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্মকে গুরুত্ব দিলেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্তরেও যে একটি পৌত্তলিক ভাবনার প্রবাহ ছিল, সেকথা জানা যায় বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' থেকে। বসন্তকুমার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে কথপোকথনের মধ্য দিয়েই নিজস্ব উপলব্ধির কথা লিখেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কথার টানে দুর্গা প্রতিমা তৈরির প্রতিটি ধাপ নিপুণভাবে বর্ণনা

করেছিলেন। প্রথম যখন গোরুর গাড়ি করে প্রতিমা তৈরির কাঠামো এসে পৌঁছাতো তখন থেকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহের সূচনা হত। এরপর যখন ধাপে ধাপে প্রতিমা গড়ে উঠত, তখন যেন 'আনন্দের আর সীমা থাকিত না।'[১৮] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাকি পটুয়াদের পানের খিলি জুগিয়ে মনে মনে গৌরব অনুভব করতেন। পুজোর সময় অনুষ্ঠিত যাত্রাপালায় জীবন্ত দুর্গা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শিল্পী মনকে বিমুগ্ধ করত। '...আর মুকুটভূষিতা আলুলায়িতাকেশা দুর্গা যে সাজিত সে যেন রূপে আলো করিয়া আসিত।'[১৯] প্রতিমা বিসর্জনের পর বাড়ি ফিরে মনখারাপের স্মৃতি তাঁর চিরাচরিত হিন্দু পৌত্তলিক মনটিকে চিনিয়ে দেয়। বলিদান সমর্থন না করলেও প্রতিমা পূজায় চিত্রশিল্প, ভাস্কর্যবিদ্যার উন্নতি এবং হৃদয়ের কোমলতার বিকাশ যে সুষ্ঠুভাবে ঘটত, সেকথা অকপটে স্বীকার করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। একই সঙ্গে ১১ মাঘের ব্রাহ্মোৎসবের স্মৃতিচারণেও মুখর আনন্দের কথা বলেছিলেন তিনি। সেখানে প্রতিমার উপাসনা নয়, মিঠাইয়ের পিরামিড, বৈঠকখানা ঘরের ব্রহ্মসঙ্গীত, গুণীজন সমাগমে এক 'পবিত্র স্বর্গীয় আনন্দে' তাঁদের মন ভরে উঠত। ব্রাহ্ম জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অবশ্য দুর্গাপূজার আনন্দের ঊর্ধ্বে ব্রাহ্মোৎসবের পরিতৃপ্তিকে স্থান দিয়েছিলেন। ১৮৬৯ সালের এপ্রিল মাস থেকে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। যদিও ব্যক্তিগত কারণে ১৮৮৪ সালে তিনি পদত্যাগ করেছিলেন, তবু, তাঁর রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি ব্রাহ্মসমাজের সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। আবার, এই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গীতাচর্চা করেছিলেন নিবিষ্ট মনে। লোকমান্য তিলকের 'গীতারহস্যে'র সুন্দর ও সাবলীল অনুবাদ প্রকশিত হওয়ার মূলে ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সক্রিয় আগ্রহ। যদিও পিতার বাধ্য সন্তান এবং গোঁড়া ব্রাহ্ম ছিলেন তিনি, তবু একদিন যে শিল্পীর চোখ দিয়ে দেবীপ্রতিমাকে অনুভব করেছিলেন, বৃদ্ধ বয়সের স্মৃতিচারণেও সেই ভাবটি ভুলে যাননি। এইখানেই ব্রাহ্মবিশ্বাসের আড়াল থেকে খুঁজে পাওয়া যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পৌত্তলিক মনটিকে।

অবনীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের সমকালে অবনীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, নীতিন্দ্রনাথ বা রথীন্দ্রনাথের মতো কনিষ্ঠ সদস্যদের দেবসংস্কারও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভরা বিচিত্র ধরনের ছিল। যার ছায়া রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনের ওপর বিস্তৃত হয়ে থাকতে পারে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন গিরীন্দ্রনাথের বংশধর। পারিবারিক পৌত্তলিক পরিমণ্ডলেই বড়ো হয়েছিলেন তিনি। তিনি ছেলেবেলার কথা বলতে বসে দেবেন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের পৌত্তলিক আচরণের কথা বলেছিলেন। পুজোয় আনন্দ করবেন বলে দেবেন্দ্রনাথ যে দ্বারকানাথকে না বলেই দুটি টাকার তোড়া নিয়ে নিয়েছিলেন, সেকথা অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ

থেকেই জানা যায়। তাঁর উদ্যোগে ঠাকুরবাড়ির তরফ থেকে অনেক দেবদেবীর ছবি আঁকা হয়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন লোকের চোখের সামনে দেবদেবীদের যেন একটা করে ক্যারেক্টার থাকে। তিনি নিজেও কৃষ্ণচরিত্র এঁকেছিলেন, যদিও নাকি তার দেবতার ছবি 'ভালো আসে না'।[২০] তিনি ছিলেন স্বভাবশিল্পী। প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের 'অবনীন্দ্রচরিতম্' বইটিতে অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে দেবতার কল্পনা করতে গেলেও সে কল্পনা নাকি তাঁর রাধু চাকরের মানব কাঠামোর বাইরে গিয়ে সম্ভব নয়। 'রাধুর চিম্‌সে শরীরটাকে dummy খাড়া করে তাঁরা এপোলো গড়ে ফেলবেন। ওর মধ্যে প্রখর করে দেওয়া হবে গতি আর ছন্দ।'[২১] এই সহজ সাবলীল দেবকল্পনা কিন্তু যেকোনো ধর্মীয় গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে। এই ভাবনা রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করে থাকতেও পারে। ঠাকুরবাড়ির কনিষ্ঠ সদস্যদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি ছিলেন বলেন্দ্রনাথ এবং নীতিন্দ্রনাথ। দুজনের অকালমৃত্যু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বেদনাদায়ক ছিল। তাঁরা দুজনেই ছিলেন পারিবারিক ব্রাহ্মধর্মের পরিপোষক। কিন্তু 'শিব' বিষয়ে বলেন্দ্রনাথ প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন রবীন্দ্রনাথ। সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ইন্দিরাদেবীকে চিঠিতে লিখেছিলেন, তিনি তাঁর নিজের ছেলেদের চেয়ে সুরেন্দ্রনাথকে বেশি ভালোবেসেছিলেন।[২২] ফলে, তাঁর ধর্মাচরণের পরোক্ষ প্রভাব রবীন্দ্রনাথের মনকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। পরিবারের ঐতিহ্যের কাছে নত হয়ে সুরেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম কর্তা হয়েছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের বর্ণাশ্রম প্রথার তিনি বিরুদ্ধতা করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ এবং সরলাদেবী নিবেদিতা ও বিবেকানন্দের একান্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন এবং কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতও করেন। রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁকে শিলাইদহের জমিদারি পরিচালনার ভার অর্পণ করেছিলেন তখন গোপীনাথের আশীর্বাদ এবং ধান দূর্বায় ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ ক্ষণিকের জন্য হলেও পৌত্তলিক হয়েছিলেন। হতে পারে এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল সুরেন্দ্রনাথের মনের পৌত্তলিক সংস্কারের ফলে।

রথীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের ছেলে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। একসময় তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ছায়া সঙ্গী। ছোটোবেলায় মায়ের স্নেহে, বাবার তত্ত্বাবধানে কেমন করে উন্মোচিত হল তাঁর ধর্মদৃষ্টি, সেই প্রসঙ্গটি আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবার ব্রাহ্ম হলেও ৫ নম্বর ঠাকুরবাড়িতে পৌত্তলিক আচার পালন করা হত ঘটা করে। পুজোর সময় যেহেতু অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে মহর্ষির নিষেধ ছিল, তাই এ বাড়ির বারান্দা থেকে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে যতটুকু দেখতে বা শুনতে পেতেন তাঁরা,

তাতেই 'মনের আক্ষেপ' মেটাতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু একবার আশ মিটিয়ে কথকতা শোনার স্মৃতিচারণ করেছেন রথীন্দ্রনাথ 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে। মাসখানেক ধরে রামায়ণপাঠ যে তাঁর শিশুমনের ওপর অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। মা মৃণালিনী দেবী তখন মূল সংস্কৃত রামায়ণ থেকে তর্জমা করে সংক্ষিপ্ত আকারে রামায়ণ লিখছিলেন। মাঝে মাঝে মায়ের মুখে রামায়ণের দেবদেবীর গল্প শুনতেন। তিনি নিজে বলেছিলেন, '...বালক বয়স থেকে আমরা এই কয়েকটি বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়েছিলুম— মহর্ষির ধর্মনিষ্ঠ আদর্শ, দ্বিজেন্দ্রনাথের একাধারে পাণ্ডিত্য ও সরলতা, সত্যেন্দ্রনাথের সংস্কারমুক্ত আধুনিকতা ও গগনেন্দ্রনাথদের বাড়ির শিল্পচর্চার আবহাওয়া।'[২৩] ফলে কোনো বিশেষ ধর্মমতের প্রভাব হয়তো রথীন্দ্রনাথের ওপর পড়েনি। পৌত্তলিক ধর্মাচরণের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছেলেবেলা থেকেই ছিল। একবার পাবনায় নৌকাবাইচ দেখতে গিয়েছিলেন রথীন্দ্রনাথ। কিন্তু বিজয়া দশমীর প্রতিমা ভাসান দেখতে দেখতে মশগুল হয়ে সকলকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। রথীন্দ্রনাথ একবার শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য সদানন্দ স্বামীর সঙ্গে হিমালয়ে গিয়েছিলেন। এই যাত্রার সময় অমূল্য মহারাজের স্নেহের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন রথীন্দ্রনাথ। এই অমূল্য মহারাজ পরে হয়েছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট স্বামী শঙ্করানন্দ। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ নিজে যতই রামকৃষ্ণের পৌত্তলিক মত ও পথের প্রতিকূলতা করুন না কেন, নিজের সন্তানকে কোনো বিশেষ ধর্মীয় বন্ধনে বেঁধে রাখতে চাননি। এই হিমালয় ভ্রমণ রথীন্দ্রনাথের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেকথা তাঁর স্মৃতিকথা পড়লেই বোঝা যায়। রথীন্দ্রনাথ বিয়ের পরে নববধূসহ শিলাইদহে এসে প্রথমেই গোপীনাথের আশীর্বাদ গ্রহণ করেছিলেন, মাথায় লালডি বেঁধে বিগ্রহকে প্রণাম করে চরণামৃত খেয়েছিলেন। এর অন্তরালে অবশ্যই ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রচ্ছন্ন সমর্থন।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছিলেন যে তাঁর জন্মের পূর্বেই তাঁর পরিবার সমাজের নোঙর তুলে বাঁধা ঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ নিজের ধর্মমতকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য অগ্নিসাক্ষী ও শালগ্রাম শিলা বাদ দিয়ে দ্বিতীয়া কন্যা সুকুমারীর বিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর যখন ব্রাহ্মমতে পিতৃশ্রাদ্ধ করেন, তখন জ্ঞাতি, কুটুম্ব, পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবংশ সকলেই তাঁর পরিবারকে বর্জন করেন। দেবেন্দ্রনাথ গৃহদেবতার পুজো বন্ধ করার উদ্যোগ নিতেই গিরীন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী লক্ষ্মীজনার্দনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং সপরিবারে বৈঠকখানা বাড়িতে বসবাস করতে শুরু করলেন। তাঁদের বাড়িতে লক্ষ্মীনারায়ণ শিলার পুজো হত, দোল-দুর্গোৎসব হত। সামাজিকভাবে ৫ নম্বর এবং ৬ নম্বর ঠাকুরবাড়ির সদস্যরা নিজেদের এড়িয়ে চললেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক হয়ে যেতেন। ফলে, তাদের

মধ্যে ভাব বিনিময়ের সুযোগ যথেষ্টই ছিল। রবীন্দ্রনাথের মতো আবেগপ্রবণ মানুষকে যে কখনো পৌত্তলিক হিন্দুধর্মের সদর্থক দিকগুলি ছুঁয়ে যায়নি, সেকথা আমাদের মনে হয় না। দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ঠাকুরবাড়ির পুরুষসদস্যদের মনে যতই ব্রাহ্মধর্ম শিকড় মেলে দিক না কেন, অন্দরমহলে নীরবে, গোপনে প্রবাহিত হয়ে চলেছিল চিরাচরিত হিন্দু পৌত্তলিক ধর্মের স্রোত। রবীন্দ্রনাথের ভাবুক মন সেই পৌত্তলিক প্রভাব থেকে কোনোভাবেই অব্যাহতি পায়নি।

অলকাসুন্দরী

দেবেন্দ্রনাথের পিতামহী অলকাসুন্দরী দেবী যখন ঠাকুরপরিবারের গৃহবধূ হয়ে আসেন, তখন সেখানে গোঁড়া বৈষ্ণব পরিমণ্ডল। 'মেছুয়াবাজারের গোঁড়া'দের গৃহবধূ হিসাবে ধর্মীয় গোঁড়ামি তাঁর মধ্যেও বর্তায়। শোনা যায়, নাতিদের পর্যন্ত নিরামিষ খাওয়াতেন তিনি। পূজাপার্বণে, গৃহদেবতার সেবায়, অন্দরমহলের পবিত্র পৌত্তলিক আবহাওয়া বেশ বজায় রেখেছিলেন অলকা দেবী। অলকাসুন্দরীর দীক্ষানেত্রী ছিলেন কাত্যায়নী দেবী অর্থাৎ মা গোঁসাই। প্রতিদিন গঙ্গাস্নানে যেতেন অলকাসুন্দরী। বাড়ির লক্ষ্মীজনার্দনের জন্য প্রতিদিন মালা গাঁথতেন। কখনো আবার সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সূর্যকে অর্ঘ দিতেন মাঝে মাঝে তাঁদের বাড়িতে বসত হরিবাসর, সারারাত কথা এবং কীর্তন হত। সুযোগ পেলে দেখে আসতেন রাধাকান্ত গোপীনাথকে। কালীঘাট শুধু নয়, জগন্নাথ ক্ষেত্র থেকে বৃন্দাবন কিছুই বাদ রাখেননি ব্রাহ্ম দেবেন্দ্রনাথের পিতামহী। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনেও তাঁর প্রভাব আশ্চর্যরকমের ছিল। একসময় পিতামহীকে সঙ্গ দিতে নিয়মিত কালীঘাটে পর্যন্ত গিয়েছেন তিনি। যদিও বৈষ্ণব পরিবারের এই গৃহকর্ত্রীর মৃত্যু গঙ্গাতীরে 'হরিবোল' বলতে বলতে ঘটেছিল, তবু দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রথম সঞ্চার ঘটে এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই।

দ্বারকানাথের নিজের দিদি রাসবিলাসীও ছিলেন এক অসাধারণ ভক্তিমতি মহিলা। তাঁর স্বামী ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। অনেক পরে ঠনঠনিয়া কালীবাড়িতে ছেলেদের ডেকে পাঠিয়ে স্বতন্ত্র গৃহনির্মাণের উপদেশ দিয়েছিলেন ভোলানাথ। তখন দ্বারকানাথের বাড়ির পূর্বদিকে রাসবিলাসীর নতুন স্বতন্ত্র গৃহ তৈরি হয়। নিজের বাড়িতে প্রতিমা এনে পুজো করিয়েছিলেন রাসবিলাসী। তবে বলিপ্রথা তিনি কোনোদিন সমর্থন করেননি।

দিগম্বরী

দিগম্বরী দেবীর ধর্মাচরণের কথা আজ কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। দিগম্বরী দেবী ছিলেন দ্বারকানাথ

ঠাকুরের স্ত্রী। স্বভাবগতভাবেই তিনি ধার্মিক ছিলেন, তার উপর দ্বারকানাথের অধার্মিক আচরণ তাঁকে আরো ধর্মপথগামী করে তোলে। ভোর চারটে থেকে দিগম্বরী দেবী পুজো শুরু করতেন। লক্ষ হরিনামের মালা জপ করা ছাড়াও নিয়মিত পড়তেন ভাগবত রাসপঞ্চাধ্যায়ের বাংলা পুথি। দয়া বৈষ্ণবী তাঁকে পড়ে শোনাতেন নানারকম ধর্মগ্রন্থ। পরাণ ঠাকুর তাঁর পুজোর উপকরণ ও রান্নার উপাচার রাখতেন গুছিয়ে। স্বপাকে আহার করতেন, একাদশীতে খেতেন সামান্য ফলমূল। একটা সময় ছিল যখন দ্বারকানাথ ও দিগম্বরী যৌথভাবে গৃহদেবতার সেবা করতেন। কিন্তু যেদিন থেকে দ্বারকানাথের পানাহারের পরিবর্তন দিগম্বরী দেবী নিজের চোখে দেখলেন, সেদিন থেকেই স্বামীকে প্রায় ত্যাগ করলেন তিনি। ধর্মীয় নিষ্ঠা তাঁর কাছে এতটাই বড়ো ছিল। দূর থেকে দ্বারকানাথের সেবা করতেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে ছোঁয়া লাগলে স্নান করে শুদ্ধ হতেন। দ্বারকানাথও পত্নীর প্রখর ব্যক্তিত্বের কাছে নত হয়ে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলকে তাঁর অধর্মাচরণ থেকে মুক্ত রেখেছিলেন। 'দ্বারকানাথের জীবনী' গ্রন্থে ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন যে দিগম্বরী দেবীকে সকলে 'লক্ষ্মীর অবতার' বলত। বাড়ির জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মুখগড়া হত তাঁরই মুখের আদলে। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও নীরব শাসনে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে এক পবিত্র বন্ধন বজায় ছিল। তাঁর এই ধর্মনিষ্ঠাকে এক লহমায় নস্যাৎ করা স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। হয়তো সেই কারণেই পিতার শ্রাদ্ধের আগের রাতে স্বপ্নে মাকে দেখেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অপৌত্তলিক পদ্ধতিতে পিতার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার বিষয়ে মায়ের অনুমতির চিন্তার প্রতিফলনই ঘটেছিল তাঁর স্বপ্নে। এই স্বপ্ন দর্শন ছাড়া দেবেন্দ্রনাথের মানসিক দ্বিধা আদৌ কাটত কিনা সন্দেহ আছে।

সারদাসুন্দরী

এইবার আসা যাক রবীন্দ্রনাথের মা সারদাসুন্দরী দেবীর কথায়। প্রচলিত মত অনুসারে মাত্র ছয় বছর বয়সে তাঁর ঠাকুরবাড়িতে গৃহবধূ হয়ে আসা। তখন অলকাসুন্দরী দেবী এবং দিগম্বরী দেবীর স্নেহছত্রচ্ছায়ায় বড়ো হয়ে ওঠেন তিনি। ধর্মপ্রাণা শাশুড়িদের প্রভাবে দেবভক্তি তাঁর মনের সহজাত সংস্কারের মতো হয়ে গিয়েছিল। একসময় ঠাকুরবাড়িতে মহাসমারোহে দুর্গা পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা এবং সরস্বতী পূজাও দেখেছিলেন, আন্তরিকভাবে সেবা করেছিলেন গৃহদেবতার। তারপর একদিন যখন স্বামী দেবেন্দ্রনাথ দৃঢ়ভাবে তাঁর একেশ্বরবাদী বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা দিতে চাইলেন, যখন একে একে সব জ্ঞাতি, আত্মীয় পরিজনেরা তাঁদের ত্যাগ করতে শুরু করলেন, তখন সারদা দেবীর মানসিক সঙ্কটটি সত্যিই লক্ষ করার মতো। একদিকে তাঁর নিজের আজন্মলালিত দেবসংস্কার আর অন্যদিকে

দেবেন্দ্রনাথের নতুন ধর্মমত। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠিতে দেবেন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন যে তাঁর ধর্মীয় মতবদলের কারণ জ্ঞাতি, কুটুম্ব সকলেই তাঁকে পরিত্যাগ করেন। ঠাকুরপরিবারের সদস্যদের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তাঁর চিরদিনের অভ্যাস ও ভক্তিলালিত দেবপূজা স্বামীর কথায় ত্যাগ করেছিলেন সারদা দেবী। কিন্তু, তিনি স্বামীর ধর্মব্যাখ্যাও শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনতেন, আবার বেদীতে বসে নিজের ইষ্টমন্ত্রই জপ করতেন। গোপনে, স্বামীর অজান্তে রমানাথ ঠাকুরের বাড়ির পুরোহিত কেনারাম শিরোমণির হাতে কালীঘাটে এবং তারকেশ্বরে পুজোর ফুল পাঠাতেন। দেবেন্দ্রনাথ প্রতি দুর্গাপূজাতেই বাইরে থাকতেন। পূজার উৎসবে বাড়ির সকলে যখন আনন্দে মাতোয়ারা, তখন সারদা দেবীর দিন কাটত নির্জনে, সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। নিজের ব্যক্তিগত সংস্কার এবং স্বামীর আদর্শ— এই দুইয়ের টানাপোড়েনে প্রতিমুহূর্তে ক্ষতবিক্ষত হতেন সারদা দেবী। গ্রহাচার্যরা স্বস্ত্যয়ন করার প্রলোভন দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে অর্থ নিয়ে যেত— সৌদামিনী দেবীর স্মৃতিকথা থেকে এই তথ্য জানা যায়।[২৪] জ্ঞানদানন্দিনী দেবীও তাঁর স্মৃতিচারণে একই ঘটনার কথা বলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য অনুসারে, সারদা দেবী দেবেন্দ্রনাথের কুশল সংবাদ জানবার জন্য দৈবজ্ঞদের পয়সা দিতেন। তার জন্য কৃপণতা করে বাজারের টাকা থেকে কিছু বাঁচিয়ে রাখতেও দ্বিধা করতেন না।[২৫] কখনো আবার এক আচার্যানী ও তাঁর ছেলেকে মুক্ত হস্তে দান করতেন স্বামীর মঙ্গলকামনায়। তাঁর লেখাপড়ার জগৎও পুরাণকেন্দ্রিক ঠাকুরদেবতা চর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' থেকেও সারদা দেবীর পুরাণ-প্রিয় অনুরাগী পাঠক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। সারদা দেবীর মতো ধর্মসঙ্কটের মধ্যে ঠাকুরবাড়ির আর কোনো নারী পড়েননি। দেবেন্দ্রনাথ নতুন ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন তাঁর মেধা দিয়ে মনন দিয়ে। জোর করে তা আরোপ করতে চেয়েছিলেন নিজের পরিজনদের মধ্যে। সারদা দেবীর স্বল্পজ্ঞানের পরিধি দিয়ে একেশ্বরবাদী ধর্মের জটিল তত্ত্ব উপলব্ধি করা আদৌ সম্ভব ছিল না। তাই বাহ্যিকভাবে স্বামীকে অনুকরণ করার চেষ্টা করলেও আন্তরিকভাবে আজীবন আঁকড়ে ছিলেন পৌত্তলিক ধর্মবিশ্বাসকে, যে বিশ্বাসের জোরে তাঁর শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের দিনগুলি পরিপূর্ণ ও আনন্দময় ছিল।

ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল বরাবর হিন্দু পৌত্তলিক ধর্মকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। কখনো গোপনে আবার কখনো প্রকাশ্যে। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা কখনো কখনো স্বামীর সূত্রে নত হয়েছিলেন হিন্দু পৌত্তলিক ধর্মের কাছে। এই বংশের গৃহবধূরা তাঁদের ফেলে আসা জীবনচর্যা থেকে বয়ে এনেছেন দেবপূজার প্রবৃত্তি। আবার পৌত্তলিক অনুষ্ঠানের জাঁকজমকের আকর্ষণও দেবেন্দ্রনাথের আড়ম্বরহীন,

বাহুল্যবর্জিত ঈশ্বর সাধনার সঙ্গে তুলনীয় হয়েছে অনেক সময়। ফলে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে অনেক অপৌত্তলিক আয়োজন সত্ত্বেও জেগেছিল পৌত্তলিক সংস্কার, যাকে নিজের অজান্তেই মনের গহনে গ্রহণ করবেন রবীন্দ্রনাথ, যার প্রকাশ ঘটবে অনেক পরে। গিরীন্দ্রনাথের স্ত্রী যোগমায়া ধর্মনিষ্ঠা এবং ব্যক্তিত্বের জোরে গৃহদেবতার সম্মান বাঁচিয়েছিলেন। এই বিদ্রোহ যে একেবারে আলোড়িত করেনি ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলকে সেই কল্পনা অর্থহীন। গণ্ডিবদ্ধ জীবনে খাঁচার পাখির মতো যে মেয়েগুলির দিন কাটত, তাদের একমাত্র আশ্রয় গৃহদেবতার অভাব নিশ্চয়ই তাদের জীবনে এক শূন্যতা তৈরি করেছিল। সেই কারণে ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা গোপনে শুরু করেছিলেন পুতুলপুজো।

সৌদামিনী

সারদা দেবীর মৃত্যুর পর বড়ো মেয়ে সৌদামিনী দেবীর হাতে সংসারের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর একদিন এক তারিখহীন চিঠিতে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখেছিলেন, 'সৌদামিনী একা ছিলেন আমাদের জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি।'[২৬] 'পিতৃস্মৃতি' লেখা ছাড়াও কিছু ব্রহ্মসঙ্গীতও লিখেছিলেন সৌদামিনী দেবী। কিন্তু তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় অকপটে বর্ণনা করেছিলেন তাঁর পুতুল পূজার ইতিবৃত্ত। একসময় যখন তাঁদের বাড়িতে পূজা অনুষ্ঠান হত তখন শিবপূজা, ইতুপূজা যা দেখতেন তারই অনুকরণ করতেন। দুর্গোৎসবের সময় প্রতিমার কাছে অঞ্জলি দিয়ে তবে জলগ্রহণ করতে পারতেন। তারপর যখন ঠাকুর পরিবারের বৈঠকখানা বাড়িতে পুতুলপুজো নিষিদ্ধ হয়ে গেল, তখন তিনি নিজের ঘরের কৃষ্ণের ছবিতে গোপনে ফুল জল দিতেন এবং ভক্তির সঙ্গে সেই ছবির পুজো করতেন।[২৭] এই ভক্তি অন্তরের সম্পদ, কোনো আরোপিত সংস্কার তাকে দূর করতে পারেনি, তা দেখা গেল।

প্রফুল্লময়ী

অন্দরমহলের ইতিহাস সবসময়ই গোপন অদৃশ্য প্রাচীরের আড়ালে থাকে। তবু, ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা কিছু স্মৃতিকথা থেকেই উঠে আসে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের ধর্মচর্চার বৃত্তান্ত। বলেন্দ্রনাথের মা প্রফুল্লময়ী দেবী প্রথম তাঁর ব্রাহ্ম শ্বশুরবাড়িতে এসেছিলেন দুর্গাপ্রতিমার স্তব শুনে। তারপর অনেক ঘাতপ্রতিঘাতের পর, স্বামী সন্তান হারিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন পৌত্তলিক হিন্দুধর্মের কাছেই। গীতা, উপনিষদ পাঠ তাঁকে যে শান্তি দিতে পারেনি, সেই শান্তি তিনি লাভ করেছিলেন পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণের পরে। অনেক পরে জ্ঞানদানন্দিনীর পুত্রবধূ সংজ্ঞাও অসীমানন্দ সরস্বতীর কাছে দীক্ষা নেবেন। দেবেন্দ্রনাথের মেয়ে শরৎকুমারীর সন্তান ছিলেন সুপ্রভা। সুকুমার

হালদারের সঙ্গে বিয়ের পর তথাকথিত অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম দীক্ষিতা এই মেয়েটি সেই দীক্ষার বন্ধন ছিন্ন করে পৌত্তলিক গুরুর কাছে মন্ত্রগ্রহণ করলেন এবং তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে শিবপুজোও করতেন। সৌদামিনী দেবীর মেয়ে ইরাবতীও শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে শিবদুর্গার সেবা করতেন। আমরা সৌদামিনী দেবীর দেবসংস্কারের কথা আলোচনা করেছি, ফলে ইরাবতীর অন্তরের এই দেবভক্তি যে সহজাত ছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু সুপ্রভা এবং ইরাবতীর মধ্যে আচরণগত পার্থক্য ছিল। ইরাবতী তাঁর ব্রাহ্মবাড়িতে এসেছিলেন বিয়ের ষোল-সতেরো বছর পরে আর সুপ্রভা জোড়াসাঁকোয় আসা যাওয়া দিব্যি বজায় রেখেছিলেন। ব্রাহ্মবাড়ির সংস্কার ভেঙেছেন বলে এতটুকু অপ্রতিভ হননি।

জ্ঞানদানন্দিনী

রবীন্দ্রনাথের জীবনে একসময় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে তিনি ছিলেন মূর্তিমতী বিদ্রোহ। পরবর্তীকালে নিজের লেখা স্মৃতিচারণায় নিজের দেবসংস্কারের কথা অকপটে বলেছিলেন তিনি। ছোটোবেলায় নাকি তাঁর যখনই কোনো কিছু পাওয়ার ইচ্ছা হত, তখন মা কালীর কাছে জোড়াপাঁঠা আর মদ মানত করতেন। তাঁর মায়েরও এই ধরনের দেবপ্রীতির কথা তাঁর স্মৃতিচারণা থেকেই জানতে পারা যায়। হাতে ধুনো পোড়ানো আর বুক চিরে রক্ত দেওয়ার মতো দুঃসাহসী সংস্কারের কথাও আমরা জানতে পারি জ্ঞানদানন্দিনীর স্মৃতিকথা থেকে।[২৮] ব্রাহ্ম স্বামী এবং ব্রাহ্ম শ্বশুরবাড়িও জ্ঞানদানন্দিনীর মনের ঐ দেবসংস্কারের স্মৃতি মুছে দিতে পারেনি। একবার গ্রামের এক সধবা নারী তাঁকে কুমারী সাজিয়ে পুজো করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কীর্তন, দেবপ্রসঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর পত্রবিনিময়ও হত। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ যে সুরেন্দ্রনাথকে অভিষেক সম্পন্ন করিয়েছিলেন হিন্দু পৌত্তলিক পদ্ধতিতে, তা নিশ্চয়ই জ্ঞানদানন্দিনীর প্রশ্রয়েই সম্ভব হয়েছিল। ইন্দিরাদেবীও কিন্তু কট্টর অপৌত্তলিক ছিলেন না। 'স্মৃতিসম্পুট' গ্রন্থে ইন্দিরা দেবী স্বীকার করেছিলেন অনুষ্ঠানপ্রিয়তা তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য।[২৯] সেই কারণে গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠান এবং দরজায় মঙ্গলঘট স্থাপন করার মধ্য দিয়ে তিনি নিজের হিন্দুপৌত্তলিক সংস্কারপ্রবণ মনটিকে প্রকাশ করেছিলেন পরিণত বয়সে। আবার সরলাদেবীর স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায় প্রথম চৌধুরীর সঙ্গে ইন্দিরা দেবীর যখন সদ্য বিয়ে হয়েছে, তখন তাঁরা সকলে মিলে বেনারস গিয়েছিলেন। সেইসময় একদিন বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে প্রসিদ্ধ আরতি দেখতে গিয়েছিলেন। বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখে যে তাঁদের 'চিত্ত পুলকিত' হয়েছিল এবং ভক্তদের ভক্তিতরঙ্গে মিশে তাঁরাও যে বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশে প্রণত হয়েছিলেন, সরলা দেবী দ্বিধাহীনভাবে সেকথা স্বীকার করেছিলেন 'জীবনের ঝরাপাতা' গ্রন্থে।[৩০]

সরলা দেবী কিন্তু বারবার পৌত্তলিকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ ছিলেন। তাঁর ফরমাসে জাপানী শিল্পী ইয়াকোআনা কালী এবং সরস্বতীর ছবি এঁকেছিলেন। ছবি দুটিকে সরলা দেবী তাঁর বসবার ঘরে সাজিয়েও রেখেছিলেন। বিবাহসূত্রে পাঞ্জাবে গিয়ে তিনি গুরুত্ব দিয়ে পুতুলপুজোর মাহাত্ম্য অনুভব করেছিলেন। দুর্গাপূজায় কুমারীপূজার বিধি যে আসলে দেবীপ্রতিমার চোখে হিন্দুভারতে কন্যাকে দেখার ভঙ্গি— সেকথা বুঝতে পেরেছিলেন সরলা দেবী। পাঞ্জাবে লক্ষ্মীপূজার অনুষ্ঠানও দেখেছিলেন খুব কাছ থেকে। স্মৃতিকথাতেই তিনি জানিয়েছিলেন, 'আমার আধ্যাত্মিক পিপাসা আমার শৈশবের গতানুগতিক ব্রাহ্মধর্ম থেকে অনেক দূরের পথে নিয়ে চলেছিল।'[৩১]

কাদম্বরী

রবীন্দ্রনাথের জীবনে যে দুই নারীর প্রভাব সবচেয়ে বেশি ছিল, তাঁরা হলেন কাদম্বরী দেবী এবং মৃণালিনী দেবী। অথচ তাঁদের প্রকৃত আন্তরিক দেবসংস্কার সম্পর্কে কিছু অনুমান নির্ভর কথামাত্র বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের শৈশব এবং কৈশোর যে নারীর সাহচর্যে সমৃদ্ধ সেই কাদম্বরী দেবীর দেবচর্চার ইতিবৃত্ত তাঁর জীবনের অন্যান্য দিকগুলির মতোই কুয়াশাচ্ছন্ন। ব্রাহ্ম স্বামীর ব্যক্তিত্ব এবং ব্রাহ্ম শ্বশুরবাড়ির অপৌত্তলিক আবহাওয়ায় প্রকাশ্যে পূজাপার্বণে অংশগ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কিন্তু ছেলেবেলায় জ্ঞানদানন্দিনীর মতোই পৌত্তলিক আবহাওয়ায় তিনি লালিত হয়েছিলেন। তাঁর বাবার নাম ছিল শ্যামলাল গাঙ্গুলি। বাবার নামের মধ্যে দেবতার নামের ইঙ্গিত রয়েছে। 'কাদম্বরী' অর্থ সরস্বতী। অর্থাৎ কাদম্বরী দেবীর পিতৃগহেও দেবদেবীর নাম দিয়ে নামকরণের রেওয়াজ ছিল। শ্যামলাল গাঙ্গুলির বাবা জগন্মোহন গাঙ্গুলি ছিলেন নীলমণি ঠাকুরের ভাই, গোবিন্দরামের পত্নী রামপ্রিয়া দেবীর ভাইপো। রামপ্রিয়া দেবীর উদ্যোগে দ্বারকানাথের মামাতো বোন শিরোমণি দেবীর সঙ্গে জগন্মোহনের বিয়ে হয়। ফলে আর যাইহোক শ্যামলালের পরিবার অধার্মিক ছিলেন না। কাদম্বরী দেবী মারা যাওয়ার পরেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামলালের যোগাযোগ ছিল। ইন্দিরা দেবীর স্মৃতিকথা থেকে তাঁর নিয়মিত কাশী যাওয়ার কথা জানা যায়। ফলে কাদম্বরীর মগ্নচেতনে পৌত্তলিক দেবসংস্কার থাকা খুব স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। তাছাড়া ষোল বছরের দাম্পত্য জীবনে সন্তানহীনা এক নারী সকলের অজান্তে দেবপূজা করতেন কিনা তার পক্ষে যেমন কোনো মত নেই, তেমনি বিপক্ষেও কোনো প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্তরঙ্গ পরিজনেরা তাঁকে গ্রিকদেবী হেকেটির নামে ডাকতেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের ওপর তাঁর গভীর প্রভাবের কথা মনে করে।

মৃণালিনী

একইরকমভাবে মৃণালিনী দেবীর ধর্মভাবনারও কোনো জোরালো তথ্যপ্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না। মৃণালিনী দেবীর লেখা চিঠিগুলোও হারিয়ে গিয়েছে তাঁরই মতো। কিন্তু ফুলতলি গ্রামের মেয়ে 'ভবতারিণী'র নামের আড়ালে শাক্তপ্রভাবের ইঙ্গিত বেশ স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ হিসাবে পৌত্তলিক ধর্ম সম্পর্কে স্বাধীন মত প্রকাশের কোনো জায়গা মৃণালিনীর ছিল না। অল্প বয়সে পাঁচটি সন্তানের জননী হয়ে, স্বামীর আদর্শের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে চলতে তাঁর ভাবনাচিন্তার সময়ই বা কতটুকু ছিল। কিন্তু এরই ফাঁকে স্বামীর আগ্রহে রূপকথা সংগ্রহ এবং রামায়ণের তর্জমা করার কাজে হাত দিয়েছিলেন মৃণালিনী দেবী। অবনীন্দ্রনাথ নাকি 'ক্ষীরের পুতুল' গল্প লেখার কথা ভেবেছিলেন মৃণালিনী দেবীর মুখ থেকে কাহিনিটি শুনে। সন্তানের মা ছাড়া ষষ্ঠি ঠাকরুণের কীর্তিকাহিনি কে-ই বা এমন রসবোধ দিয়ে প্রকাশ করবেন। শিলাইদহ এবং জোড়াসাঁকোয় বিভক্ত হয়েছিল মৃণালিনী দেবীর ঘরকন্না। জোড়াসাঁকোয় হাজার লোকের ভিড়ে স্বামীকে খুব কাছে না পেলেও শিলাইদহের ক্ষুদ্র পরিসরে রবীন্দ্রনাথের ওপর বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন মৃণালিনী দেবী। রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে থাকাকালীন নন্দলাল বসু লক্ষ করেছিলেন সন্ধ্যাবেলায় তাঁদের জলখাবারের জন্য প্রায় প্রতিদিন গোপীনাথের মন্দির থেকে শীতলী প্রসাদ আসতো। রথীন্দ্রনাথের বিয়ের আগে যে রবীন্দ্রনাথ প্ল্যানচেটে বসে তাঁর স্ত্রীকে স্মরণ করেছিলেন এমন কথা জানা যায়। রথীন্দ্রনাথের বিয়ের পর নববধূসহ গোপীনাথের মন্দিরে বিগ্রহকে প্রণাম করার ঘটনা, মাথায় লালডি বাঁধা বা চরণামৃত গ্রহণ করার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সমর্থনের আড়ালে হয়তো মৃণালিনী দেবীর দেবসংস্কার কাজ করে থাকতে পারে বলে আমরা অনুমান করতে পারি।

প্রতিমা দেবী

রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী ছিলেন গিরীন্দ্রনাথের পরিবারের মেয়ে। তাঁদের পরিবার ছিল বেশ রক্ষণশীল ব্রাহ্মণপরিবার। ফলে লক্ষ্মীজনার্দনের নিত্যসেবার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল তাঁর শৈশব। পরে রবীন্দ্রনাথের জীবনে তাঁর পুত্রবধূর ভূমিকাও কিছু কম ছিল না। সেই কারণে, তাঁর পৌত্তলিক মন রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করে থাকতে পারে— এই সম্ভাবনার কথা ভুললে চলবে না।

১৩০৭ সালে 'পুণ্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল 'হরপাবর্তী'র ছবি, চিত্রশিল্পী ছিলেন ঠাকুরবাড়ির অন্যতম সদস্যা নীপময়ী, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুই মেয়ের সৃষ্টিকাজেও ছিল পৌত্তলিকতার

ছোঁয়া। বিনয়নী দেবীর লেখা স্মৃতিকথা 'কাহিনি'তে রয়েছে দুর্গাপূজার জাঁকজমকপূর্ণ বর্ণনা। সুনয়নী দেবীরও প্রথম পছন্দ ছিল ঠাকুরদেবতা। তিনি এঁকেছিলেন রাধাকৃষ্ণ, হরপার্বতী, বালগোপাল, ননীচোরা, কৃষ্ণ যশোদা ইত্যাদি চিত্র। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের পৌত্তলিক প্রভাবের অল্পকিছু ঘটনামাত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। কিন্তু এ ছাড়াও অনেক অচেনা, অজানা কাহিনিও নিশ্চয়ই এই ব্রাহ্ম পরিবারটির অপৌত্তলিক ভাবনা স্রোতের সমান্তরালে বহমান ছিল, যা রবীন্দ্রনাথের আবেগপ্রবণ মনকে হয়তো স্পর্শ করে গিয়েছিল।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অপৌত্তলিক ধর্মসাধনার এক বিশেষ পদ্ধতির প্রচলন করতে চাইলেও তাঁর সমকালে পরিবারের অনেক সদস্যই সেই আরোপিত ধর্মসংস্কারকে মন থেকে গ্রহণ করতে পারেননি। দেবেন্দ্রনাথের অজান্তে অন্তঃপুরের আনাচে কানাচে সযত্নে আরাধনা করা হত বৈদিক ও পৌরাণিক দেবদেবীদের। পরিবারের পুরুষেরা বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে বিভিন্ন সময় ব্রাহ্ম সভার সম্পাদক হয়েছিলেন। তবু তাঁদের মুদ্রিত স্মৃতিচারণে বারবার ফিরে এসেছে ছেলেবেলার প্রতিমাপূজার বর্ণনা। রবীন্দ্রনাথের মনের গড়নটিতেও তাই পৌত্তলিক ও অপৌত্তলিক দেবসংস্কারের মিশেল ঘটেছিল। ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের মনেও যে পৌত্তলিক ধ্যানধারণা প্রভাব ফেলেছিল, সেকথা নিশ্চিত হয়েই বলা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের সন্তান। মায়ের ঔদাসীন্যের চেয়ে বাবার ব্যক্তিত্বের গাম্ভীর্য রবীন্দ্রনাথের কাছে অনেক বেশি আকর্ষক ছিল। 'বাবার মতো বড়' হওয়ার ইচ্ছাটা ছেলেবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনের ওপর ভর করেছিল। সেই কারণে তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের ইচ্ছা-অনিচ্ছাগুলোও দেবেন্দ্রনাথের পারিবারিক সম্মান রক্ষার আড়ালে হারিয়ে গিয়েছিল। সে তাঁর বিবাহ, শিক্ষা বা সন্তানদের ভবিষ্যৎ যাইহোক না কেন। অর্থনৈতিক দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথ অনেক অংশেই ছিলেন বাবার ওপর নির্ভরশীল। সেই কারণে, দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছাতেই ১৮৪৪ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেইসময় পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তিনি নিজের ব্রাহ্ম পরিচয়টিই তুলে ধরতেন। আবার, রামমোহন এবং দেবেন্দ্রনাথের মতোই তিনি নিজের হিন্দু হওয়ার দাবিটিও ছাড়েননি। অমিতাভ চৌধুরী 'রবি ঠাকুরের পাগলা ফাইল' গ্রন্থে 'রবীন্দ্রনাথের দেবীচিন্তা' প্রবন্ধে খুব মূল্যবান কথা বলেছেন। তাঁর মত অনুসারে, রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ছিলেন কিনা এই প্রশ্ন একসময় বাংলাদেশকে আলোড়িত করেছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে বিবৃতি

দিয়ে জানাতে হয়েছিল যে তিনি আসলে হিন্দু। দেবেন্দ্রনাথও নিজের পরিচয় হিন্দু বলেই দিয়েছিলেন। তাঁরা ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ ভেদ মানতেন, ছেলেদের উপনয়ন পর্যন্ত করিয়েছিলেন। তফাৎ ছিল শালগ্রাম শিলার ব্যবহারে। এই অপৌত্তলিক হিন্দুধর্মের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছিলেন, 'আমি হিন্দু সমাজে জন্মগ্রহণ করেছি, আমি ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত, আমার ধর্ম বিশ্বজনীনতা সেটাই হিন্দুধর্ম।'[৩২] একসময় নব্যহিন্দুসম্প্রদায়ের শশধর তর্কচূড়ামণি, চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখরা পুরাণের নতুন ব্যাখ্যা করে মূর্তিপূজাকে প্রবলভাবে সমর্থন করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এঁদের সমালোচনা করেছিলেন, কিন্তু একই সঙ্গে একথাও জানিয়েছিলেন 'ব্রাহ্ম বলিয়া আমরা বৃহৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের বহির্ভূত নই।'[৩৩] চন্দ্রনাথ বসুর লেখা 'ষোড়শোপাচারে পূজা', 'তেত্রিশ কোটি দেবতা', 'প্রতিমা' ইত্যাদি প্রবন্ধের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ কলম ধরেছিলেন। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় দামু চামু নামে প্রবল রক্ষণশীল দুটি হিন্দুচরিত্র সৃজন করেছিলেন। সেই সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজকেও সতর্ক করেছিলেন, 'ভাষার দ্বারা পূজা করিতে গিয়া ভাষা পূজা করা না হয়। দেবতার নিকটে ভাষাকে প্রেরণ না করিয়া ভাষার জড়ত্বের মধ্যে দেবতাকে রুদ্ধ করা না হয়।'[৩৪] আসলে, রবীন্দ্রনাথের যে সময় আবির্ভাব ঘটেছিল, সেই সময় মানুষের মনের প্রাচীন প্রথাগত দেববিশ্বাসে ভাঙন ধরতে শুরু করেছে। একদিকে খ্রিস্টধর্মের প্রবল প্রচার, একদিকে প্রবল হিন্দুত্ববাদীদের ডামাডোল আর অন্যদিকে রামমোহন দেবেন্দ্রনাথদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য এবং একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা— এই আশ্চর্য ধর্মীয় পরিমণ্ডলে রবীন্দ্রনাথ নিজেও ছিলেন যথেষ্ট দিশাহারা। প্রথম জীবনে পিতার পথ অনুসরণ করে তরুণ রবীন্দ্রনাথ সেই জন্য তাঁর অপৌত্তলিক সত্তাকেই প্রচারের আলোয় নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর এই অপৌত্তলিক ব্রাহ্মসত্তার কাঠিন্য অনেক সময় গোঁড়ামির পর্যায়ে চলে যেত। সরলা দেবীর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে আরতি দেখার ঘটনাটি রবীন্দ্রনাথের কাছে 'মিথ্যাচার' ছিল। সরলা দেবীরা যেখানে ভক্তদের ভক্তিতরঙ্গের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন নিজেদের রবীন্দ্রনাথ সেখানে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'তোরা এইরকম করে পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিলি? মিথ্যাচার করলি?'[৩৫] সরলা দেবী করেছিলেন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের পরে রবীন্দ্রনাথ ১১ মাঘের উৎসবটিকে পরিবারের গণ্ডি থেকে বার করে প্রাতিষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে পরিণত করে দিয়েছিলেন। ফলে তাঁর সম্পর্কে ঠাকুরবাড়ির ব্রাহ্ম মেয়েদের অভিযোগগুলি সরলা দেবীর কলমের স্পর্শে জীবন্ত হয়ে ওঠে। উৎসবের আনন্দে হিন্দু সমাজের সঙ্গে মিশতে গেলে তাদের রবীন্দ্রনাথের রোষদৃষ্টিতে পড়তে হয়েছিল। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের ভবিতব্যে ছিল তাঁর ঠাট্টা, বিদ্রুপ, অবজ্ঞা এবং ঔদাসীন্য। এই তথ্যটি ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের গোঁড়ামির পরিচয় বহন করে। অথচ ব্রহ্মসঙ্গীত রচনার সময় এই রবীন্দ্রনাথই আর 'নিরাকারবাদী'

থাকতে পারেন না। 'পিতা' বা 'জননী' সম্বোধনে ঈশ্বরকে আহ্বান করার মধ্য দিয়েই বুঝতে পারা যায়, রবীন্দ্রনাথের 'ব্রহ্ম' বা 'ঈশ্বর' আর যাই হোন নিরাকার নন। সরলা দেবীর মূল্যবান একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন— ''...আর কত তুলব? আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তকের প্রথম ভাগ থেকে দশম একাদশ ভাগ পর্যন্ত যত দূর ছাপান হয়েছে সগুণ সাকার ঈশ্বরভাবের সবরকম সঙ্গীত স্তরে স্তরে সঞ্চিত আছে। ভাবের ও ভাষার পার্থক্য দেখলে চিনতে পারা যাবে রামমোহন রায়ের সময়কার নিরাকার ব্রহ্ম কেমন করে ভাবের ঘরে একদম সাকার হয়ে নেমে ব্রহ্মবাদীর আকার নিরাকার অভেদ জ্ঞানের ভিত্তিতেই পুনঃস্থাপিত করলেন। অথচ ভাবের চৌকাঠ পেরিয়ে গেলেই মাটির খড়ে, ধাতুপ্রস্তরে, বর্ণচিত্রে ভাবের উপলক্ষ্য ভগবানকে পূর্ণ লক্ষ্য করে আঁকড়ে ধরলেই রবীন্দ্রনাথ উত্যক্ত বিচলিত হয়ে উঠতেন। তাঁর আজন্ম 'নিরাকার' পূজার সংস্কারে ঘা লাগত।''[৩৬] ১৮৮২ সালের ২ মার্চ ফরোয়ার্ড পত্রিকায় 'সিটি কলেজ স্ক্যাণ্ডাল' প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্ম কলেজে সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক হয়, রবীন্দ্রনাথ সেই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। প্রতিমাপূজার প্রতিকূলে মত রেখেছিলেন।

এই দ্বিধা, এই সংশয় রবীন্দ্রনাথের মত ও পথকে কুয়াশাচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ইন্দিরা দেবীকে একটি পত্রে লিখেছিলেন, রামমোহন রায় এবং ডয়সন সাহেব বেদান্তের প্রশংসা করে গেলেও তা তার মনের সংশয় দূর করতে পারেনি। প্রশান্তকুমার পালের সঙ্গে একমত হয়ে বলাই যায়, আদি ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েও আনুষ্ঠানিক ধর্মসাধনায় তাঁর কোনো রুচি ছিল না। পিতার প্রভাবে এবং তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার কারণেই ১৯০৫ সালে দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ব্রাহ্মধর্মের বাহ্যিক সংস্কারের প্রতি প্রবল আনুগত্য লক্ষ করা যায়।[৩৭] ইন্দিরা দেবীকে লেখা অন্য একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে বাইরের শাস্ত্র থেকে পাওয়া ধর্ম কখনোই নিজের ধর্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবল একটা অভ্যাসের যোগ দৃঢ় হয়ে আসে। ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংযোগও সেই আজন্ম অভ্যাসের ফলাফল ছিল।[৩৮] সেই কারণেই ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। প্রণবেশ চক্রবর্তী 'দেবতা অনুরাগী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বেশ স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, 'আদি ব্রাহ্মরা, অপৌত্তলিক সংস্কারমুক্তির কোনো সাধ বা সাধ্য যাঁদের ছিল না, তাঁরা লোক দেখানো অপৌত্তলিক সেজেছিলেন, সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন শুধু স্ববিরোধিতায় আচ্ছন্ন, আবৃত।'[৩৯] ব্রাহ্মনায়ক দেবেন্দ্রনাথ গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দনকে বিদায় করেছেন, প্রতিমার পীঠস্থানে বেদী বানাতেও কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আন্তরিক অনুরাগে শিলাইদহে গোপীনাথের সেবা করে চলেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের আত্মজ রথীন্দ্রনাথ ভক্তিভরে গোপীনাথের বিগ্রহকে প্রণাম করেছেন— প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে একথা জানা যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন অপৌত্তলিক মতে। মহর্ষির ছেলে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে সুরেন্দ্রনাথের অভিষেক অনুষ্ঠান করেছিলেন গোপীনাথের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে। লক্ষ্মীজনার্দন ও গোপীনাথ একই দেবতার দুই নাম।

প্রণবেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে একমত না হয়ে উপায় নেই কোনো। সত্যিই বোধহয় বাইরে ব্রাহ্ম এবং ভিতরে সনাতন হিন্দু আদর্শে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ শুধু 'পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে ব্রাহ্ম সেজেছিলেন।'[৪০] বিভিন্ন চিঠিপত্র থেকে তাঁর প্রতিমা প্রীতির পরিচয়ও খুঁজে পাওয়া যায়। ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতেই একবার জানিয়েছিলেন দুর্গাপুজোর সুন্দর সূচনায়, ঘরে ঘরে সমস্ত দেশের মনে যখন আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হয়, তখন তাদের সঙ্গে সামাজিক বিচ্ছেদ থাকা সত্ত্বেও সেই আনন্দ রবীন্দ্রনাথের মনকে স্পর্শ করে গিয়েছিল। বোঝাই যাচ্ছে, এই তথাকথিত 'সামাজিক বিচ্ছেদ' তাঁকে যন্ত্রণা দিত। সুরেশ সমাজপতির বাড়ির দুর্গাপ্রতিমা দেখে তাঁর মনে হয়েছিল হঠাৎ দিনকতকের মতো ছেলেমানুষ হয়ে উঠে সকলে মিলে একটা বড়ো গোছের পুতুল খেলায় প্রবৃত্ত হয়েছে। এই চিঠিতেই তিনি তাঁর মনের কথা স্পষ্ট করে বলেছিলেন, ''এই কারণে সমস্ত বাংলাদেশের লোক যাকে উপলক্ষ্য করে আনন্দে ভক্তিতে প্লাবিত হয়ে উঠেছে, তাকে আমি মাটির পুতুল বলে যদি দেখি তবে তাতে কেবল আমারই ভাবের অভাব প্রকাশ পায়।''[৪১] এরই কিছুদিন আগে নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গে আলোচনায় বলেছিলেন যে তিনি অনেক সময় ভাবেন, তিনি পৌত্তলিক কিনা। হিন্দুসমাজের কঠিন সমালোচনা করেছিলেন বলে হিন্দুরা তাঁকে বিরোধী গোষ্ঠীর লোক বলে মনে করেছেন, অপরদিকে ব্রাহ্মরাও তাঁকে আপন বলে মনে করেননি। এই জায়গা থেকে রবীন্দ্রনাথ সত্যিই 'ব্রাত্য'। আবার একজন কবির পক্ষে নিরাকারবাদী হওয়া সহজ কথা নয়, প্রায় অসম্ভব।

ছেলেবেলায় দেবেন্দ্রনাথের আগ্রহে গীতাপাঠ করতেন রবীন্দ্রনাথ। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গীতাচর্চার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনে। গীতার মধ্যে যে একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ প্রয়োজনের সুর আছে, সেকথা অকপটে স্বীকার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতে। স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে লেখা চিঠিতেও গীতার শ্লোক ব্যবহার করতেন রবীন্দ্রনাথ এই চর্চার মধ্য দিয়ে ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ দেবতা কৃষ্ণকে নিজের অজান্তেই প্রতিষ্ঠা দিয়ে ফেলেন। তাঁর সাহিত্যেও এই দেবতাকে খুঁজে পাওয়া যাবে বিভিন্ন অনুষঙ্গে। 'ভারতী' পত্রিকায় একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'হরহৃদে কালিকা' নামের একটি রচনা।

অপৌত্তলিক ব্রাহ্ম আবহাওয়ায় বড়ো হয়ে ওঠা তরুণ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কবিতার বিষয়টি যে একটু ব্যতিক্রমী, বিষয়টি রবীন্দ্র জীবনীকারের দৃষ্টিও এড়ায়নি। শারদীয়া পূজার মাসে প্রকাশিত কবিতাটিতে খুঁজে পাওয়া যায় পরবর্তীকালে বহুকথিত তাঁর নটরাজ শিবের ধারণার পূর্বাভাস। এই প্রসঙ্গে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত আরো একটি রচনার উল্লেখ করা প্রয়োজন— 'দেবতায় মনুষ্য অরোপ'। জীবতত্ত্ব ও জ্যোতিষ্কতত্ত্ব পড়ার ফলে লেখা এই প্রবন্ধটিও তাঁর সাহিত্যে দেবচরিত্রগুলির উন্মেষ ও সৃষ্টির ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকতে পারে। ছোটোবেলায় আবার খেলার ছলে পুজো করতেন রবীন্দ্রনাথ। খুব ছোটো বয়সে রবীন্দ্রনাথের বেশ খানিকটা সময় কেটেছিল চাকরমহলে, যাকে বলা হত তোশাখানা। সেখানেও পুতুলপুজোর ধারাটিকে সম্পূর্ণ লুপ্ত করতে পারেনি দেবেন্দ্রনাথের প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম। তাই, তোশাখানার দক্ষিণভাগে বড়ো একটা ঘরে কাঁচের সেজে রেড়ির তেলের মিট্‌মিটে আলোয় দেখা গণেশমার্কা ছবি আর কালীমায়ের পটের কথা পরিণত বয়সেও ভুলতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। চাকরদের মুখে শোনা পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির দেবচরিত্রগুলি কোনোদিন রবীন্দ্রনাথের মনকে স্পর্শ করেনি একথা জোরের সঙ্গে বলা সম্ভব নয়। বাড়ির মেয়েদের লেখাপড়ার জগৎ জুড়ে বেশিরভাগ ছিল পৌরাণিক দেবনির্ভর বইপত্র। পাঠক রবীন্দ্রনাথের পাঠচর্চার প্রথম লগ্নে এই ঠাকুর দেবতাদের ভূমিকা নেহাত কম ছিল না। পুরাণ কথানির্ভর যাত্রা বা থিয়েটারের জীবন্ত দেবচরিত্রগুলি, বৈষ্ণবীদের গান, দিদি বা বৌদিদের ব্রত উদ্‌যাপনের দিনগুলির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনের গহনে অবশ্যই শাখাবিস্তার করেছিল পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম। 'জীবনস্মৃতি' বইটির 'ভগ্নহৃদয়' নামের অধ্যায়টিতে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন, 'আমাদের পরিবারের যে ধর্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিল না— আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই।'[৪২] পিতার মৃত্যুর পর দৃঢ় এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত ব্যক্তিত্বের একটা আভাস পাওয়া যায়। ধর্মাচরণে দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব যাই থাকুক না কেন, তা ছিল ঠাকুরবাড়ির ভবিতব্য। কামদেব বা জয়দেবের সময় থেকেই এই অবাঞ্ছিত ধর্মসঙ্কট ঠাকুরপরিবারের সঙ্গী। রবীন্দ্রনাথ নিজে ব্রাহ্ম হিসেবে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার কষ্টভোগ করেছিলেন। কিন্তু নিজের সাহিত্যের পৃথিবীতে পরম যত্নে, কল্পনার তুলি বুলিয়ে সৃজন করেছিলেন দেবদেবীদের কাঠামো। প্রথাগত দেবচরিত্রগুলির নবনির্মাণের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন যে দেবলোক সেখানে শুধুই ছিল স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ। কোনো বিশেষ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি তাকে প্রভাবিত করতে পারেনি।

তথ্যসূত্র

১. আমি অনেক সময় ভাবি, আমিও পৌত্তলিক কিনা। বিশেষতঃ ভাগবত সম্বন্ধে অন্যান্য ব্রাহ্মদের থেকে আমার ধারণা স্বতন্ত্র।

নবীনচন্দ্র সেন, 'বন্ধুসমাগম', *নবীনচন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, শান্তিকুমার দাশগুপ্ত এবং শ্রীহরিবন্ধু মুখটী (সম্পা.), দত্ত চৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১ বৈশাখ ১৩৮২, পৃ. ১২৬

২. রবির জন্মের পর হইতে আমাদের পরিবারে জাত-কর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল অনুষ্ঠান অপৌত্তলিক প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে।

সৌদামিনী দেবী, 'পিতৃস্মৃতি', *স্মৃতিকথা*, সোমেন্দ্রনাথ বসু (সম্পা.), বৈতানিক প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৭

৩. রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বলেছিলেন ব্রাত্য। তাঁর জন্মভূমি বাংলাদেশ, তাঁর পূর্বপুরুষের বংশধারা, তাঁর পরিবারের ধর্মীয় ও ব্যবহারিক আচরণও 'ব্রাত্য' নামে অভিহিত হতে পারে। ... বাংলাদেশ, ঠাকুরবংশ, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রশান্তকুমার পাল, *ঠাকুর বংশের ইতিহাস*, প্রথম অধ্যায়, রবিজীবনী, প্রথম খণ্ড, ভূর্জপত্র, কলকাতা, প্রকাশ ১৩৮৯, ১ বৈশাখ, পৃ. ৩

৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক*, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৪০, চতুর্থ সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৭৭, পৃ. ২

৫. আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেহ কেহ এখানেও বিখ্যাত তোমাকে লিখিয়াছি— পুরুষোত্তমের পিতা জগন্নাথকে সকলেই জানে। প্রবাদ আছে যে পুরুষোত্তম এক মুসলমান রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন— আমাদের পিরালী হইবার মূলে এইরূপ কোন ঘটনা হইবে।

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পা.), *জ্ঞানদানন্দিনী দেবী রচনা সংকলন*, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৪১৮, পৃ. ২৭৩

৬. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী*, ভূমিকা ও তথ্যপঞ্জি : জ্যোতির্ময় সেন, অলকানন্দা পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ : ১৮৯৮, অলকানন্দা সংস্করণ : জানুয়ারি, ২০১২, পৃ. ৩৫

৭. সমীর সেনগুপ্ত, 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর', *রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়-স্বজন*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৫, দ্বিতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ১০৫

৮. অল্পবয়সে দেবেন্দ্রনাথ একবার সরস্বতী পূজা করেছিলেন। এত প্রচুর অর্থব্যয় হয়েছিল যে সেই পার্বণে গাঁদাফুল ও সন্দেশ দুর্লভ হয়ে পড়েছিল। প্রতিমাও এত বিশাল হয়েছিল যে বিসর্জনের সময় নানা কৌশলে তা বাড়ি থেকে বার করতে হয়।

সৌদামিনী দেবী, পিতৃস্মৃতি, *স্মৃতিকথা*, সোমেন্দ্রনাথ বসু (সম্পা.), বৈতানিক প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ১৬

৯. তিনি পাতা পড়িয়া বলিলেন, ''এ যে ঈশোপনিষদ, ইশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।
যখন বিদ্যাবাগীশের মুখ হইতে 'ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং' ইহার অর্থ বুঝিলাম, তখন স্বর্গ হইতে অমৃত আসিয়া আমাকে অভিষিক্ত করিল।''

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী*, ভূমিকা ও তথ্যপঞ্জি : জ্যোতির্ময় সেন, অলকানন্দা পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ : ১৯১৮, অলকানন্দা সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ২৬

১০. তদেব, পৃ. ২৪

১১. ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরোধে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের এই প্রথম দৃষ্টান্ত। জ্ঞাতি বন্ধুরা আমাকে ত্যাগ করিলেন। ধর্ম্মের জয়ে আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম। এছাড়া আর আমি কিছুই চাহি না।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী*, ভূমিকা ও তথ্যপঞ্জি : জ্যোতির্ময় সেন, অলকানন্দা পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ : ১৯১৮, অলকানন্দা সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৫৫

১২. আমি সেই নিস্তব্ধ গৃহে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি; খানিক পরে দেখি যে, সেই ঘরের সম্মুখে একটা দরজার পর্দ্দা খুলিয়া উপস্থিত হইলেন আমার মা। মৃত্যুর দিবস যেমন তাঁর যেমন চুল এলানো দেখিয়াছিলাম, সেইরূপ তাঁহার চুল এলানোই রহিয়াছে। তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর যখন শ্মশান হইতে ফিরিয়া আইলাম, তখনো মনে করিতে পারি নাই যে তিনি মরিয়াছেন; আমার নিশ্চয়ই যে তিনি বাঁচিয়াই আছেন। এখন দেখিলাম আমার সেই জীবন্ত মা আমার সম্মুখে। তিনি বলিলেন, 'তোকে দেখবার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই তোকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছি। তুই নাকি ব্রাহ্মজ্ঞানী হইয়াছিস? কুলং পবিত্রং, জননী কৃতার্থা।' তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার এই মিষ্ট কথা শুনিয়া, আনন্দ-প্রবাহে আমার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। দেখি যে আমি সেই বিছানাতেই ছটফট্ করিতেছি।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী*, ভূমিকা ও তথ্যপঞ্জি : জ্যোতির্ময় সেন, অলকানন্দা পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ : ১৯১৮, অলকানন্দা সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৫৮

১৩. সমীর সেনগুপ্ত, 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর', *রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৫, দ্বিতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ১২২

১৪. তদেব, পৃ. ১২২-১২৩

১৫. তদেব, পৃ. ২৮০

১৬. তদেব, পৃ. ২৮০-২৮১

১৭. ২৮ ডিসেম্বর ১৮৬৮-তে লেখা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র জ্ঞানদানন্দিনীকে, পার্থজিৎ

গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১১, অগ্রহায়ণ ১৪১৮, পৃ. ২৯৯

১৮. তারপর খড়বাঁধা, একমাটি, দোমাটি রং দেওয়া, মুণ্ড বসানো প্রভৃতি প্রক্রিয়া প্রতিমাখানি যখন ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিত তখন তাহার আনন্দের আর সীমা থাকিত না।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, *জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি*, প্রশান্তকুমার পাল (সম্পা.), সুবর্ণরেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯২০, পৃ. ১১

১৯. তদেব, পৃ. ১৩

২০. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাণী চন্দ, *ঘরোয়া*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, আশ্বিন ১৩৪৮, পুনর্মুদ্রণ : ভাদ্র, ১৪১৭, পৃ. ৩২

২১. প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, *অবনীন্দ্রচরিতম্*, প্রথম রূপা সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৯৪, সেপ্টেম্বর ১৯৮৭, পৃ. ১২৭

২২. ...তোরা বোধহয় জানিস আমার নিজের ছেলেদের চেয়ে সুরেনকে আমি ভালোবেসেছিলুম।

(৬/৫/১৯৪০ তারিখে ইন্দিরা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র)

সমীর সেনগুপ্ত, 'সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর', *রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় স্বজন*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৫, দ্বিতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ৩১৭

২৩. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছেলেবেলা', *পিতৃস্মৃতি*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩, পৃ. ১৩

২৪. ...পিতা সর্বদাই বিদেশে কাটাইতেন এই কারণে তিনি [সারদা দেবী] সর্বদাই চিন্তিত হইয়া থাকিতেন না। এই জন্য পূজার উৎসবে যাত্রা গান আমোদ যত কিছু হইত তাহাতে সকলে মাতিয়া থাকিতেন কিন্তু মা তাহার মধ্যে কিছুতে যোগ দিতে পারিতেন না। তখন নির্জন ঘরে তিনি একলা বসিয়া থাকিতেন। কাকীমারা আসিয়া তাঁহাকে কত সাধ্য সাধনা করিতেন, তিনি বাহির হইতেন না। গ্রহাচার্যরা স্বস্ত্যয়নাদির দ্বারা পিতার সর্বপ্রকার আপদ দূর করিবার প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার কাছ হইতে সর্বদাই কত যে অর্থ লইয়া যাইত তাহার সীমা নাই।

সৌদামিনী দেবী, *স্মৃতিকথা*, সোমেন্দ্রনাথ বসু (সম্পা.), বৈতানিক প্রকাশনী, চতুর্থ সংস্করণ: মাঘ ১৪০৯, পৃ. ৮

২৫. মা বোধহয় কৃপণতা করে বাজারের টাকা থেকে কিছু বাঁচাতেন কারণ কর্তামশায় প্রায় পাহাড়ে ভগবানের ধ্যান করে বেড়াতেন বলে কবে বাড়ী আসবেন তাই গুণে বলে দেবার জন্য দৈবজ্ঞদের পয়সা দিতেন।

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পা.), *জ্ঞানদানন্দিনী দেবী রচনা সংকলন*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১১, অগ্রহায়ণ ১৪১৮, পৃ. ৩৭

২৬. ভাই সতু,

লিখছি মনের খেদে। সৌদামিনী একা ছিলেন আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ী।

(সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক তারিখহীন চিঠি)

সমীর সেনগুপ্ত, সৌদামিনী দেবী, *রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৫, দ্বিতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ৩৩৬

২৭. আমার ঘরে কৃষ্ণের ছবি ছিল আমি গোপনে ফুল জল লইয়া ভক্তির সহিত সেই ছবির পূজা করিতাম।

সৌদামিনী দেবী, *স্মৃতিকথা*, সোমেন্দ্রনাথ বসু (সম্পা.), বৈতানিক প্রকাশনী, পৃ. ৮

২৮. ...তাই আমারও যখন কিছু পাবার ইচ্ছে হত, তখন ওই জোড়াপাঁঠা আর মদ মা কালীর কাছে মানতুম। আমাদের বাড়ির কাছেই এক কালী মন্দির ছিল। কারো মানসিক পূর্ণ হলে, কারো আরোগ্য লাভ বা মকদ্দমায় জিৎ এইরকম কোনো কারণ ঘটলে সেখানে পাঁঠা পাঠিয়ে দিতেন ও মদ নিয়ে যেতেন। ... কালী মন্দিরের আর একটা অনুষ্ঠান দেখেছিলাম মনে আছে। আমার মা বোধহয় কারো ব্যামোর সময় মানত করেছিলেন যে, আরোগ্য লাভ হলে কালীর সামনে হাতে ধুনো পোড়াবেন আর বুক চিরে রুধির দেবেন। যেদিন এই ক্রিয়া হবে সেদিন মা আমাকে সঙ্গে নিয়ে কালীমন্দিরে গিয়েছিলেন।

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পা.), *জ্ঞানদানন্দিনী দেবী রচনা সংকলন*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১১, অগ্রহায়ণ, ১৪১৮, পৃ. ১০

২৯. নিজের কথা যখন বলা ভিন্ন উপায় নেই দেখছি তখন স্বীকার করি যে, অনুষ্ঠানপ্রিয়তা আমার আর একটি বিশেষত্ব। আমিই বউকে বলে কাল সকালে নতুন বাড়িতে পারিবারিক উপাসনা করালুম। নগেন্দ্রকে বলে দরজায় মঙ্গলঘট দেওয়ালুম। অনুষ্ঠান মানে, মনের ভাব বাইরে প্রকাশ করার একটা ব্যবস্থা বৈ তো নয়।

ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী, *স্মৃতিসম্পুট*, অনাথনাথ দাস (সম্পা.), রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, মাঘ ১৪০৫, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ৫

৩০. বিশ্বেশ্বরের সে আরতি দেখে চিত্ত পুলকিত নমিত না হয়ে যায় না। এতদিন শুধু গুরু নানকের পদভাঙা রবীন্দ্রের ব্রহ্মসঙ্গীত বলে গাইতুম—

'তাঁর আরতি করে চন্দ্র তপন
দেব মানব বন্দে চরণ
আসীন সেই বিশ্ব শরণ
তাঁর জগৎ মন্দিরে।'

আজ সেই গানের ভাবেরই সত্যবৎ অনুভূতি লাভ হল। আরতি শেষে শত সহস্র বৎসর ধরে অগণ্য ভক্তের ভক্তিভাব ভরিত সেই গগনতলে বিশ্বেশ্বরের মন্দির দ্বারে আজকের সহস্র সহস্র ভক্তদের ভক্তিতরঙ্গে ভক্তি মিলিয়ে আমরাও উদ্দেশে প্রণত হলুম।

সরলা দেবী, *জীবনের ঝরাপাতা*, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : দোলযাত্রা, ফাল্গুন, ১৮৭৯ শকাব্দ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সুবর্ণরেখা সংস্করণ : বইমেলা, ২০০৭, পৃ. ৫৮-৫৯

৩১. তদেব, পৃ. ১২৯

৩২. অমিতাভ চৌধুরী, 'রবীন্দ্রনাথের দেবীচিন্তা', *রবি ঠাকুরের পাগলা ফাইল*, শৈব্যা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২২ শ্রাবণ, ১৩৮৬, পৃ. ৮৭

৩৩. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, ৩য় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, সংস্করণ ১লা বৈশাখ ১৩৯৪, পৃ. ১২

৩৪. তদেব, পৃ. ১২

৩৫. সরলা দেবী, *জীবনের ঝরাপাতা*, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ দোলযাত্রা ফাল্গুন ১৮৭৯ শকাব্দ, সাহিত্য সংসদ, প্রথম সুবর্ণরেখা সংস্করণ বইমেলা ২০০৭, পৃ. ৫৯

৩৬. তদেব, পৃ. ৫৭-৫৮

৩৭. ... আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েও আনুষ্ঠানিক ধর্মসাধনায় কোনোদিন রবীন্দ্রনাথের রুচি ছিল না— পিতার প্রতি শ্রদ্ধাবশত যেটুকু বাহ্যিক সংস্কারানুগত্য দেখা যায়, তাঁর মৃত্যুর (৬ই মাঘ ১৩১১) পর সেটুকুও লোপ পেয়েছে।

প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১লা বৈশাখ, ১৩৯৫, চতুর্থ মুদ্রণ কার্তিক ১৪১৫, পৃ. ২০

৩৮. আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই সে কখনো আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না, তার সঙ্গে কেবল একটা অভ্যাসের যোগ দৃঢ় হয়ে আসে— যে ধর্ম আমার জীবনের ভিতরে সংসারের দুঃখ সহতাপে ক্রিস্টলাইনড হয়ে ওঠে সেই আমার যথার্থ। (ইন্দিরা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র)

তদেব, পৃ. ৮৩-৮৪

প্রণবেশ চক্রবর্তী, *দেবতা অনুরাগী রবীন্দ্রনাথ*, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ ১৩৮৯, ১৫ এপ্রিল ১৯৮২, পৃ. ১৪

৪০. তদেব, পৃ. ২৬

৪১. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ ১ বৈশাখ, ১৩৯৫, চতুর্থ মুদ্রণ, কার্তিক ১৪৬৫, পৃ. ৩৬

৪২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভগ্নহৃদয়, জীবনস্মৃতি, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, আগস্ট ১৯৮৯, পৃ. ৬৩

তৃতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্রসাহিত্যে দেবপ্রসঙ্গ

ঠাকুরবাড়ির ভাবধারার ধর্মীয় কথা মনে রাখলে, 'ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ' সম্পর্কে 'অপৌত্তলিক' বিশেষণটিই সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে বিভিন্ন প্রসঙ্গে, বিচিত্র ভাবনার প্রকাশে হিন্দু দেবতাদের উল্লেখ খুঁজে পাওয়া যায়। কখনও আবার পাশ্চাত্য দেবদেবীরাও বিক্ষিপ্তভাবে স্থান পেয়ে যান রবীন্দ্রসাহিত্যের দেবলোকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব গোঁড়া ছিলেন ব্রাহ্মধর্ম এবং অপৌত্তলিকতা বিষয়ে। তাঁর সুযোগ্য এবং বাধ্য কনিষ্ঠ সন্তান হিসেবে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে ব্রাহ্মগোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য হিসেবেই মনে করতেন। কিন্তু তাঁর সাহিত্যে হিন্দু দেবদেবীদের উল্লেখ আমাদের বিস্মিত করে তোলে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর থেকে শুরু করে দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ঊষা এমনকি লৌকিক দেবদেবীদের প্রসঙ্গ আমরা লক্ষ করি তাঁর সাহিত্যভাণ্ডারে। বর্তমান অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হল রবীন্দ্রসাহিত্যের দেবলোকের এই বিশেষ দেবদেবীরা। আমরা তাদের বৈদিক ও পৌরাণিক পরিচয়দানের চেষ্টা করব এবং চিনে নিতে প্রয়াসী হব তাঁদের বিশিষ্ট রাবীন্দ্রিক মূর্তিটিকে।

অগ্নি

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তটিতেই অগ্নিদেবতাকে স্তব করা হয়েছিল। ঋগ্বেদের প্রায় দুশোটি শ্লোকে অগ্নির বন্দনা রয়েছে। অগ্নির ত্রিমূর্তি— আকাশে সূর্য, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ এবং পৃথিবীতে অগ্নি। অগ্নি ছাড়া যজ্ঞ হয় না। তাই অগ্নি পুরোহিত। লৌকিক ভাষায় অগ্নির নাম 'পাবক'। এই পাবকই হল প্রধান অগ্নি। পাবক যজ্ঞের মুহূর্তে মানুষের প্রেরিত হব্যকে দেবতার কাছে পৌঁছে দেয়। তাই অগ্নি হল হব্যবাহ। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে অগ্নির এই হব্যবাহ ও পাবক রূপের প্রসঙ্গ এসেছে। এখানে অগ্নিকে বলা হয়েছে দেবদূত ও দেবগণের আহ্বানকারী। অগ্নির হাতে জপের মালা এবং তিনি যজ্ঞসূত্র পরিধান করে আছেন। 'বলের পুত্র' হিসেবে অগ্নির পুরুষমূর্তিই ঋগ্বেদের অধিকাংশ শ্লোকের উপজীব্য হলেও অগ্নির স্ত্রী ও পুরুষ উভয়মূর্তির কল্পনা ঋগ্বেদে করা হয়েছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের একটি সূক্তে অগ্নিকে বৃষ ও গাভী উভয়ই বলা হয়েছে। পুরাণেও অগ্নি পুরুষ দেবতা।[১] আবার এক অগ্নিমাতার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি হলেন হিংলাজ দেবী। সতীকেই হিংলাজ মাতা বলে পুজো করা হয়। হিঙ্গুলাতে ভূগর্ভ থেকে সত্যি সত্যি অগ্নিশিখা নির্গত হয়। অগ্নিকে নারী হিসেবে কল্পনা করা হয় এইখানে। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, গ্রিক পুরাণেও Fire God-কে নারী ও পুরুষ উভয় রূপে কল্পনা করা

হয়েছে। সেখানে তিনি একাধারে 'হেসতিয়া' ও 'হেফাসটাস'।[২]

দুই

রবীন্দ্রসাহিত্যে অগ্নি এসেছে বিভিন্ন প্রসঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের লেখা 'প্রভাতসঙ্গীত' কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা হল 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়'। এই কবিতায় প্রথম কায়াহীন অগ্নির একটি স্পষ্ট রূপ লক্ষ করা যায়। কবিতাটি অনুসারে সৃষ্টিসূচনায় এক অগ্নিময় উচ্ছ্বাসে পৃথিবীতে প্রাণ জেগে উঠল।—

অগ্নিময় মিলন হইতে
জন্মিতেছে আগ্নেয় সন্তান,
অন্ধকার শূন্য মরুমাঝে
শতশত অগ্নিপরিবার
দিশে দিশে করিছে ভ্রমণ।[৩]

এই কবিতাটিতে অগ্নির সৃষ্টিশীল আর বিধ্বংসী দুটি সত্তাই একসঙ্গে বিদ্যমান। অগ্নির স্ত্রী বা পুরুষ কোনো মূর্তিই এখানে পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। এই কবিতায় অগ্নি কেবলই অগ্নিশিখা হুতাশন মাত্র। 'ছবি ও গান' কাব্যগ্রন্থের 'রাহুর প্রেম' কবিতায় নিজের তরুণ হৃদয়ের দেহবাসনার উপমান হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ফিরিয়ে এনেছেন অনলের সর্বগ্রাসী রূপটিকে—

মোর যাতনায় হইবি অধীর,
আমারই অনলে দহিবে শরীর,
অবিরাম শুধু আমি ছাড়া আর কিছু না
রহিবে মনে।[৪]

রবীন্দ্রকবিতার ইতিহাসে স্পষ্ট একটি পর্বান্তর সূচিত করেছিল 'মানসী' কাব্যগ্রন্থ। একটু লক্ষ করলেই বুঝতে পারা যাবে, রবীন্দ্রনাথের অগ্নিকল্পনাও এই কাব্যেই প্রথম একটি বিশিষ্ট তাৎপর্য লাভ করেছিল। এই কবিতায় কবি অগ্নির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন নিজের অতৃপ্ত, উন্মত্ত দেহবাসনাকে। তাই অগ্নির বুভুক্ষু, অমঙ্গলময় রূপটিই সেখানে হয়েছে 'রাহুর প্রেম'-এর উপমান। কিন্তু দেহবাসনার ঊর্ধ্বায়নের মধ্যে দিয়ে 'মানসী' পর্বে শুরু হল এক স্বর্গীয় প্রেমের পবিত্র ধারা। এই দিব্যপ্রেমচেতনার আলোকে একবার স্মৃতির পটে চোখ রেখেছিলেন কবি। সেই সময়কার উন্মত্ত দেহবাসনাকে সেদিন তাঁর মনে হয়েছিল— 'কলঙ্ক রাহু'।

অতি অসহন বহ্নিদহন
মর্মমাঝারে করি যে বহন,
কলঙ্ক রাহু প্রতি পলে পলে
জীবন করিছে গ্রাস।[৫]

শুধু অনুশোচনার আগুন নয়, 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতায় অগ্নি প্রথম এক বিশেষ মূর্তি পেয়েছে। এই কবিতায় অগ্নির মঙ্গলময় 'পাবকমূর্তি'র আবির্ভাব ঘটেছে। এই কবিতায় অগ্নির যে পাবক রূপটি

ফুটে উঠেছে, সেটি কিন্তু অগ্নিময়ী এক নারীমূর্তির। অনলরেখায় আঁকা এই নারীর দেহহীন জ্যোতি কবিকে পথ দেখাবে আজীবন— 'তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব অনন্ত বিভাবরী।'[৬]

'পূরবী'র 'আহ্বান' কবিতায় অগ্নি হল 'আকাশভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক', 'দেবতার দূতী'। সে মর্তের গৃহের প্রান্তে স্বর্গের আকুতি বয়ে নিয়ে আসে। এই কবিতায় অগ্নির নারীমূর্তি বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃতবারি
মৃত্যুর আড়ালে,
দেবতার হয়ে সেথা তাহারি সন্ধানে তুমি নারী
দুবাহু বাড়ালে।[৭]

'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষশেষ' কবিতায় দেহের যবনিকা ভেদ করে অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখার স্পর্শ অনুভব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই কাব্যগ্রন্থেরই একটি কবিতা হল 'দীপশিল্পী'। এই কবিতাতেও অগ্নির নারীমূর্তির কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—

হে সুন্দরী, হে শিখা মহতী
তোমার অরূপ জ্যোতি
রূপ লয়ে আমার জীবনে
তারি লাগি একমনে
রচিলাম এই দীপখানি
মূর্তিমতী এই মোর অভ্যর্থনাবাণী।[৮]

'সানাই' কাব্যগ্রন্থের 'নারী' কবিতায় প্রত্যহের গ্লানিশূন্য এক নারীমূর্তি কল্পনা করেছিলেন কবি, আলোকের ঝর্ণাধারায় স্নাত অগ্নিময়ী নারীমূর্তি—

...টানি লয়ে সকল ক্লান্তি
আদি স্বর্গলোক হতে নির্বাসিত পুরুষের মন
রূপ আর অরূপের ঘটনায় মিলন।
উদ্‌ভাসিত ছিলে তুমি নারী অপূর্ব আলোকে
সেই পূর্ণলোকে—
সেই ছবি আনিতেছ ধ্যান ভরি
বিচ্ছেদের মহিমায় বিরহীর নিত্যসহচরী।[৯]

'রোগশয্যায়'-এর ৩৩ সংখ্যক কবিতাতেই লক্ষ করা যায় প্রদীপ হাতে এই নারীর উপস্থিতি।

মনে হয় এই পূজারিণী—
এরে আমি বারবার চিনি,
আসে মৃদুমন্দ পদে
চিরদিবসের বেদিতলে
তুলি ফুল শুচিশুভ্র বসন অঞ্চলে।[১০]

বৈদিক অগ্নির পরিচিত মূর্তি হল তপস্বীমূর্তি। অগ্নিকে রবীন্দ্রনাথ নারীমূর্তিতে কল্পনা করেছিলেন, তাই এই নারী 'তপস্বী' নয়, 'পূজারিণী'। বৈদিক অগ্নির হাতে থাকত অগ্নিশিখা। রবীন্দ্রকল্পনায় এই অগ্নিরূপিনী নারীর হাতে প্রদীপ এবং তার স্নিগ্ধ, সৌম্য শিখা। 'চিত্রা'র 'অন্তর্যামী' কবিতায় এক

পূজারিণী মূর্তির উল্লেখ পাওয়া যায়—

জ্বেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার
করিবারে পূজা কোন দেবতার
রহস্যঘেরা অসীম আঁধার
মহামন্দির তলে?[১১]

'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা হল 'সাবিত্রী'। এই কবিতায় কবি সূর্যবন্দনা করেছিলেন। কিন্তু সূর্যের এখানে নারীমূর্তি। এইখানে মনে রাখতে হবে, বেদে 'সূর্য' হল আকাশের আগুন। কবিতাটিতে জীবনদেবতার সঙ্গে অগ্নিরূপিণী নারীর একাত্মতাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে— 'বহ্নিবীণা বক্ষে লয়ে দীপ্ত কেশ উদ্‌বোধনী বাণী/সে পদ্মের কেন্দ্র মাঝে নিত্য রাজে, জানি তারে জানি।'[১২] জীবনের চলার পথের প্রেরণাদাত্রী জীবনদেবতার উদ্দেশেও কবি লিখেছিলেন—

তেজের ভাণ্ডার হতে কী আমাতে দিয়েছ যে ভরে
কেই বা সে জানে।[১৩]

তিন

'গীতবিতান'-এর 'পূজা' পর্যায়ের ১৫৮ সংখ্যক গানাটিতে অগ্নিবীণা হাতে এক নারীর ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আপাতভাবে দৈবী ক্ষমতাসম্পন্ন এই নারীকে সরস্বতী বলে ভ্রম হতে পারে। কিন্তু এই দেবীর বীণার সুরে আকাশ কেঁপে ওঠে এবং 'বিষম বহ্নিঘাতে' কবির জীবনের 'রাতে' অর্থাৎ হতাশার মুহূর্তে এই দেবী নতুন তারার আলো অর্থাৎ নবপ্রেরণা জ্বালিয়ে দিয়ে যান। রবীন্দ্রকল্পনায় যে অগ্নিময়ী নারী আসেন, যিনি কবির মনকে ঊর্ধ্বলোকে যুক্ত করে দেন, তিনি অগ্নির নারীমূর্তি। 'পূজা' পর্যায়ের ২১২ সংখ্যক গান হল 'আগুনের পরশমণি'। এই গানে অগ্নির নারীমূর্তির স্পষ্ট কোনো অবয়ব না থাকলেও আগুনের পরশমণির স্পর্শে বেদনার ঊর্ধ্বায়নের কথা লেখা আছে। ৫৮৩ সংখ্যক গানে কবি প্রতীক্ষার শেষে প্রত্যাশা করেন কোনো এক অগ্নিশিখা এসে কবির দেহপ্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে যাবে। তখন দুটি অগ্নিময় শরীরের আলোকিত মিলন সম্ভব হবে। আমরা অনুমান করতে পারি, এই অগ্নিময় শরীর আসলে নারী। যদিও এর স্পষ্ট কোনো প্রমাণ গানটিতে নেই। ৬১০ সংখ্যক গানে তিনি দৃপ্ত ভঙ্গিতে লিখলেন— 'জয় আগুনের জয়।'[১৪] এর ঠিক পরের গানটিতে অর্থাৎ ৬১১ সংখ্যক গানে অগ্নির সিদ্ধ পুরুষ মূর্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই গানে কবি অগ্নিকে 'আগুন আমার ভাই' বলে সম্বোধন করেছিলেন। অগ্নির এখানে শিকলভাঙা রাঙা মূর্তি। দুই হাত তুলে আকাশের দিকে চেয়ে অগ্নিশিখার নৃত্য রবীন্দ্রনাথের কাছে 'অভয়'। মৃত্যুর পরের অগ্নিদহন তাঁর কাছে মুক্তি। 'স্বদেশ' পর্যায়ের গানগুলিতে অগ্নি মনের দিব্যশক্তি হয়ে দেখা দেয়। এই সূত্রে মনে পড়ে যেতে পারে অগ্নিকে

‘কার্যসাধিকা শক্তি’ বলেছিলেন ঋষি অরবিন্দ। এমন শক্তি যা সত্যকে নিয়োজিত করতে পারে কর্মে। ‘স্বদেশ’ পর্যায়ের ৩৯ সংখ্যক গানে রবীন্দ্রনাথ ‘নির্মলজ্যোতি’র জয়গান গেয়েছিলেন। ‘প্রেম’ পর্যায়ের ৮৭ সংখ্যক একটি গানে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন— ‘যা ছিল কালো-ধলো তোমার রঙে রাঙা হল।’[১৫] এইখানে অগ্নির কোনো স্পষ্ট অবয়ব খুঁজে পাওয়া যায় না, কেবল দুটি ‘রাঙা চরণ’ ছাড়া। তাঁরই স্পর্শে বসনভূষণ, শয়ন, স্বপন সব রাঙা হয়ে যায়। ভাবতে ইচ্ছা করে রক্তবর্ণ অগ্নির স্পর্শ। যদি তাই হয়, ওই রাঙাচরণের জোরে রাবীন্দ্রিক অগ্নিকল্পনা এই গানে নারীমূর্তি সৃজন করেছে। ১২৫ সংখ্যক গানে এক অগ্নিময়ী নারী অনল দিয়ে কবির জীবনশিখা জ্বালিয়ে দিয়ে যায়। এই শিখাময়ী নারী অবশ্যই অগ্নি। ‘প্রকৃতি’ পর্যায়ের অন্তর্গত ৬০ সংখ্যক গানটি বর্ষার। এই শ্রাবণের বুকের ভিতর যে আগুন আছে তার কালো রূপ। শিখার জটা দিক হতে দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়তে পড়তেই যেন মেঘ হয়ে যায়। কালো আভায় তালবনের গাছে গাছে কাঁপন লাগে। বাদল হাওয়া সেই আগুনের হুঙ্কারে পাগল হয়ে যায়। সেই আগুনের পুলকেই রাঙা হয়ে ওঠে কদম্ব বন। সেই আগুনের বেগ আর কবির গানের পাখার পারস্পরিক স্পর্শে নব নব সৃষ্টি জেগে ওঠে। এই অগ্নি হল জটাধারী পুরুষমূর্তি। ‘বিচিত্র’ পর্যায়ের ৭৭ সংখ্যক গানটিতে তারায় তারায় দীপ্ত শিখার আগুন জ্বলে ওঠে। ‘আনুষ্ঠানিক’ পর্যায়ের ১৭ সংখ্যক গানে অগ্নিশিখাকে সরাসরি আহ্বান করা হয় মাতৃবেশে।

চার

রবীন্দ্র উপন্যাসের একটি বিশিষ্ট চরিত্র হল দামিনী। ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসে লেখক নিজেই বলেছিলেন, তার অন্তরে ‘চঞ্চল আগুন ঝিক্‌মিক্‌ করছে’।[১৬] আমরা জানি, ‘দামিনী’ হল বিদ্যুতের প্রতিশব্দ এবং বিদ্যুৎ অন্তরীক্ষের অগ্নি। ‘গল্পগুচ্ছ’-এর ‘জয় পরাজয়’ গল্পটিতেও অগ্নির নারীমূর্তির ইঙ্গিত রয়েছে। সেখানে অগ্নি ‘হে সুন্দরী বহ্নিশিখা’, ‘মোহিনী বহ্নিরূপিণী দেবী’ বিশেষণ পেয়েছেন।

‘পঞ্চভূত’-এর পাঁচটি ভূতের একজন হল দীপ্তি। সে কথায় কথায় নিষ্কাশিত অসিলতার মতো ঝিকমিক করে ওঠে। দীপ্তির এই বৈশিষ্ট্য আমাদের বিদ্যুৎ বহ্নির কথা মনে করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ এই বইটিতে পাঁচটি ভূতের প্রত্যেকটিকে মানবিক রূপ দান করেছিলেন। এদের মধ্যে ‘তেজ’ তথা অগ্নিকে দিয়েছিলেন নারীমূর্তি। ক্ষিতি, মরুৎ এবং ব্যোমকে কিন্তু পুরুষ অবয়বই দিয়েছিলেন।

পাঁচ

'আত্মপরিচয়' বইটিতে রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনে জীবনদেবতার প্রেরণার কথা অকপটে স্বীকার করেছিলেন। কবির অন্তরে যিনি কবি, তিনি দুঃখ দিয়ে অগ্নিশুদ্ধ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রতা, স্বার্থবুদ্ধি ও আরামের আবেশকে পুড়িয়ে দিয়ে কবিকে বারবার মিলিয়ে দিয়েছিলেন বৃহত ও মহতের সঙ্গে। অগ্নির কাজও তাই। অগ্নি দেবতা ও মানুষের সংযোগ তৈরি করেন। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনদেবতা' শব্দটি পেয়েছিলেন গ্রিক 'দাইমন' থেকে। দাইমন দেবতা ও মানুষের মধ্যে সংযোগ সেতু তৈরি করে। এই দিক থেকে বৈদিক দেবসংঘের মধ্যে একমাত্র অগ্নির সঙ্গেই দাইমন এবং রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। গ্রিকদের 'Fire God'-ও একই ভূমিকা পালন করতেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা তত্ত্বের সঙ্গে কাদম্বরী দেবীর সম্পর্কের কথা আজ প্রমাণিত। ফলে, রাবীন্দ্রিক অগ্নিকল্পনায় এক অগ্নিময়ী নারীর অস্তিত্বের কারণ আমরা অনুমান করে নিতে পারি। অগ্নির মতোই রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রেরণা এই নারী 'দিব্য সংকল্পে'র মতো তাঁকে পরিশুদ্ধ করেছিলেন। আগুনের পরশমণির স্পর্শে তাঁকে জাগিয়ে তুলে বিশ্বদেবতার সঙ্গে সংযুক্ত করেছিলেন।

ইন্দ্র

ঋগ্বেদে ইন্দ্র হলেন বায়ু বা অন্তরীক্ষলোকের দেবতা। ঋগ্বেদ অনুসারে যিনি দুটি মেঘের মধ্যে বজ্ররূপ অগ্নি উৎপাদন করেন, তিনি হলেন ইন্দ্র। ইন্দ্র ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রের দেবতা। তিনি বজ্রবাহু, বৃত্রবধ হল তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ইন্দ্র হিরন্ময়। তিনি সহস্রাক্ষ। ইন্দ্র জন্মলাভ করেই আকাশকে উজ্জ্বল করেছিলেন। তাঁর মা অদিতি এবং পিতা হলেন ত্বষ্টা। ইন্দ্র সোমপান করেন। জন্মমাত্রেই তিনি মায়ের স্তনে সোমদর্শন করেছিলেন। ইন্দ্র হলেন দেবরাজ। তিনি আজন্ম যোদ্ধা এবং শত্রুদমনকারী। ইন্দ্র শত্রুদের পুরসমূহ ধ্বংস করেছিলেন বলে ইন্দ্রের আর এক নাম হল পুরন্দর। বেদের ইন্দ্র যেমন সর্বত্র জয়ী, পুরাণে কিন্তু তা নয়। পুরাণে ইন্দ্র অনেক সময়ই ভীরু এবং পরাজিত। পৌরাণিক ইন্দ্রের সিংহাসনচ্যুতির অসম্ভব ভয়। রাজাদের অশ্বমেধ যজ্ঞ অথবা মুনি ঋষিদের উগ্র তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য ইন্দ্র মর্তে অপ্সরা পাঠাতেন। পুরাণে ইন্দ্র ছিলেন উচ্ছৃঙ্খল, ইন্দ্রিয়পরায়ণ। অহল্যা ধর্ষণের মতো কুৎসিত ঘটনার অভিযোগও ইন্দ্রের ওপরেই আরোপ করা হয়েছিল। ইন্দ্রের অশ্বের নাম হল উচ্চৈঃশ্রবা এবং হস্তীর নাম হল ঐরাবত।[১৭]

দুই

দেবরাজ ইন্দ্র রবীন্দ্রকবিতাতেও নিজের জায়গা করে নিয়েছিলেন। ইন্দ্রকে নানা রূপে ব্যবহার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের ৮৬ সংখ্যক কবিতায় ইন্দ্র বৃষ্টির দেবতা। কবি চেয়েছিলেন তাঁর মনের মাটিতে বর্ষা নামুক। 'দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি অতি দীর্ঘকাল/ হে ইন্দ্র, হৃদয়ে মম।'[১৮] রবীন্দ্রনাথের কল্পলোকে ইন্দ্র চেয়ে থাকেন জননীর মতো সজল দৃষ্টি মেলে। এই ভঙ্গিটি সুরলোকের বীরশ্রেষ্ঠ লড়াকু ইন্দ্রের পরিচিত রূপটিকে ম্লান করে দেয়। 'লেখন'-এর একটি কবিতাতেও ইন্দ্রের এক ব্যথিত, নম্র ছবি খুঁজে পাওয়া যায়।—

অনন্তকালের ভালে মহেন্দ্রের বেদনার ছায়া
মেঘান্ধ অম্বরে আজি তারি যেন মূর্তিমতী মায়া।[১৯]

'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের 'শিলঙের চিঠি' কবিতায় রোদ মেঘের ফন্দিতে আটকা পড়ে যায়। সূর্য ও ইন্দ্রের মিলনের ইঙ্গিত রয়ে যায় রবীন্দ্রনাথের কবিতায়।[২০] অন্তরীক্ষের দেবতা হিসেব ইন্দ্র ও সূর্যকে ঋগ্বেদেও অনেক সময় একই শক্তির প্রতীক মনে করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যে প্রাচীন পদগুলির বঙ্গানুবাদ করেছিলেন, সেখানে 'অপ্রমাদবর্গ' নামের অনুবাদটিতে ইন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ দেবতার শিরোপা দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, 'অপ্রমাদে ইন্দ্রদেব হয়েছেন দেবতার সেরা/ অপ্রমাদে তুষে সবে, প্রমাদে দূষেন পণ্ডিতেরা।'[২১] ইন্দ্রের প্রবল ঐশ্বর্যের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ 'সেঁজুতি' কাব্যগ্রন্থের 'জন্মদিনে' কবিতায়, 'ইন্দ্রের ঐশ্বর্য নিয়ে হে ধরিত্রী আছ তুমি জাগি।'[২২] 'বনবাণী' কাব্যগ্রন্থের 'বৃক্ষরোপণ উৎসব' কবিতায় 'অপ্' (পঞ্চভূতের একটি অংশ) অংশে ইন্দ্রের উল্লেখ এল এভাবে— 'হে মেঘ, ইন্দ্রের ভেরী বাজাও গম্ভীর মন্ত্রস্বনে মেদুর অম্বরতলে।'[২৩] 'শাপমোচন'-এ সুরলোকে ইন্দ্রের অভিশাপে গন্ধর্ব সৌরসেন মর্তে জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য হন। 'তপোভঙ্গ'-এর 'পূরবী' কবিতায় মদন মহেশ্বরের তপস্যাভঙ্গ করতে এসে জানায়:

তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের হে রুদ্র সন্ন্যাসী
স্বর্গের চক্রান্ত আমি।[২৪]

'স্বর্গের চক্রান্ত' বলতেই মনে পড়ে যায় পৌরাণিক ক্ষমতালোভী ইন্দ্রকে। অথচ জীবনের শেষদিকে কবি নিজেকে বলবেন 'ইন্দ্রসখা'। ইন্দ্র এবং শচীর প্রেমসম্পর্ক ধরা দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। 'বনবাণী'র 'কুর্‌চি' কবিতায় মহেন্দ্রের নন্দনকানন, পারিজাত মঞ্জরীর অনুষঙ্গে আসে ইন্দ্রাণীর কথা। 'খেয়া'র 'বর্ষাপ্রভাত' কবিতায় সুরপুরীর পর্দাখানা নীরবে খুলে ইন্দ্রাণী জানালা খুলে দাঁড়িয়ে আছেন, — এই রূপকল্পটিতে ইন্দ্র না থেকেও রয়ে যান ইন্দ্রাণীর প্রতীক্ষার আড়ালে।[২৫] 'খাপছাড়া'র ১০৫ সংখ্যক কবিতাটিতে 'ইন্দ্রলোকের পাগলাগারদ' কল্পনা করে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।[২৬]

‘শেষসপ্তক’-এর ১৫ সংখ্যক কবিতায় ইন্দ্রকে বলেন ‘চিত্রকর’।—

ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু, তিনি দেখলেন,
তাঁর দেখা আর তাঁর সৃষ্টি একই।
চিত্রকর তিনি।
তাঁর দেখার মহোৎসব দেশে দেশে কালে কালে।[২৭]

‘বীথিকার’ ‘সত্যরূপ’ কবিতায় মহাকালদেবতার মহেন্দ্রমন্দিরে নিজের একাকী সত্যরূপ উপলব্ধি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ‘পুনশ্চ’ কাব্যগ্রন্থের ‘ভীরু’ কবিতায় বিদ্যালয় জীবন থেকে সুনীতকে তাড়া করে বেড়ায় বটেকৃষ্টর স্ফীতরক্তচোখ। অজানা কারণে সুনীতকে দেওয়া হয়েছিল ‘হাঁসখালি’ নাম। সুনীত ছিল শিল্পী। তাই দীপালোকহীন ঘরে, সেতারের ঝংকারের সাথে সে যখন গান ধরে তখন সুরের সুরেন্দ্রলোকে তার মন চলে যায়। লক্ষ করার মতো সুনীতের গানের কথাগুলিও— ‘আওয়ে পিয়রওয়া/ রিমিঝিমি বরখন লাগে।’[২৮] মেঘবৃষ্টির আবহে, বটকৃষ্টের স্থূল বিদ্রূপের সুনীতের প্রতিবাদ আর ইন্দ্রের উদ্যত বজ্র এক হয়ে যায়। কবি নিজেকেও শাপভ্রষ্ট গন্ধর্বই ভাবতেন বলে মনে হয়। সেই কারণেই ‘রোগশয্যায়’ কাব্যগ্রন্থের ১ সংখ্যক কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের মন চলে যায় সুরলোকে। যেখানে উর্বশীর ক্ষণেকের তালভঙ্গেরও কোনো ক্ষমা নেই। কবির বিশ্বাস, মানবের সভাঙ্গনেও জেগে থাকে স্বর্গের বিচার। কবি তাই নিজের খ্যাতিমুক্ত বাণী ‘মহেন্দ্রের পদতলে’ সমর্পণ করে নিরাসক্ত মনে চলে যেতে চান।[২৯] এইভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ইন্দ্রভাবনার ঊর্ধ্বায়ন হয়। ইন্দ্র হয়ে যান শিল্পের সহচর। ‘গীতাঞ্জলি’র ৫১৭ সংখ্যক গানে ইন্দ্রের ছবি কথায় ও সুরে প্রকাশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ‘সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি তারায় তারায় খচিত’।[৩০] এই গানে সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের নক্ষত্রপতি হওয়া অথবা গৌতমমুনির অভিশাপের ইতিবৃত্ত অতিক্রম করে স্পষ্ট হয়ে যায় ইন্দ্রের তারায় তারায় খচিত অঙ্গদখানি এবং চরম শোভায় রচিত খড়্গটিও ইন্দ্রদেবের হাতে রাবীন্দ্রিক সংযোজন। ৫২৮ সংখ্যক গানটিও ইন্দ্রকেই ইঙ্গিত করে।—

শুষ্ক যে এই নগ্ন মরু নিত্য মরে লাজে
আমার চিত্ত মাঝে
শ্যামলরসের আঁচল তাহার বক্ষে দেহো টানি
ওহে সুন্দর হে সুন্দর।[৩১]

এই মনের মাটিতে বৃষ্টি ঝরার ইচ্ছা ইন্দ্রকেই মনে করায়। গানের শুরুতে নীরব বীণা তুলে নন্দননিকুঞ্জ হতে সুর নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। ইঙ্গিতটি স্পষ্টভাবে ইন্দ্রকেই নির্দেশ করে। যিনি সামান্য তালভঙ্গ অথবা সুরের বিক্ষেপে অভিশাপ দিতে পারেন, তাঁর হাতে বীণা একেবারেই বেমানান নয়। কারণ রবীন্দ্রনাথ ইন্দ্রকে শিল্পীর মর্যাদা দিয়েছিলেন।

তিন

ছোটোগল্প এবং উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথ ইন্দ্র প্রসঙ্গ ব্যবহার করেছিলেন। 'রাসমণির ছেলে' গল্পের শেষদিকে শৈলেন্দ্রকে ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দেওয়া হয়েছে। মেসের উচ্চলোকে 'ইন্দ্রের সিংহাসন'টি তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট। বড়োমানুষের এই ছেলেটি ভোগবিলাস ও আচার আচরণেও ইন্দ্রের সঙ্গে তুলনীয় ছিল। 'পয়লা নম্বর' গল্পেও ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ। সেই কারণেই যাদের মন দেওয়াও যায় না আবার না দিয়েও থাকা যায় না তারাই হল জগতের অস্বাস্থ্য, সেই অস্বাস্থ্যকে স্বয়ং ইন্দ্রও ভয় করে চলেন। গল্পটিতে এমন কথা বলা ছিল।

রবীন্দ্রনাথের লেখা উপন্যাসগুলির একাধিক চরিত্রের নামের অর্থ ইন্দ্র। বৈদিক ও পৌরাণিক ইন্দ্রের নানা বৈশিষ্ট্য সেই চরিত্রগুলির ওপর আরোপিত হয়েছে। 'মুকুট'কে যদি আমরা একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস ধরি, তাহলে এই উপন্যাসের একটি চরিত্র ইন্দ্রনারায়ণ, ইন্দ্রের মতোই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী— একথা বলতে পারি। 'মুকুট'-এর ভাবনাটিকে যখন নাটকের আকারে প্রকাশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তখনো ইন্দ্রকুমারই ছিলেন মুকুটের যোগ্য। দেবরাজ ইন্দ্রের মতো নেতৃত্বদানের ক্ষমতা ইন্দ্রকুমারেরও ছিল। 'গোরা' উপন্যাসে গোরার আলোচনা শুনে মুগ্ধ সুচরিতার মনে হয়েছিল যে তা তত্ত্ব আলোচনা নয়, তা যেন সৃষ্টি। সুচরিতার চোখে গোরা ইন্দ্রের মতো ব্যক্তিত্বশালী হয়ে উঠেছিল— 'সুচরিতা আজ বজ্রপাণি ইন্দ্রকে দেখিতেছিল— বাক্য যখন প্রবলমন্ত্রে কর্ণে আঘাত করিয়া তাহার বক্ষঃকপাটকে স্পন্দিত করিতেছিল, সেই সঙ্গে বিদ্যুতের তীব্র ছটা তাহার রক্তের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে নৃত্য করিয়া উঠিতেছিল।'[৩২] 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে দুই ছেলের নাম হল পুরন্দর এবং শচীশ। দুই জনের নামের অর্থই হল ইন্দ্র। শচীশের 'মুখখানি যে দেবমূর্তির মতো সাদা পাথরে কোঁদা।'[৩৩] শচীশ 'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধন' করতে চায়। পুরন্দর বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেরালেও আসলে খুবই ভীতু। পৌরাণিক ইন্দ্রের মতোই ইন্দ্রিয়পরায়ণ, তাই ননীকে অপমান করে সে অনুতপ্ত হয় না। 'শচীশ' নামটির মধ্যে যে পূর্ণতা আছে, সেই পূর্ণতার আস্বাদ উপন্যাসের চরিত্র শচীশ কোনোদিন পায় না। কারণ সে মেয়েদের কাছাকাছি যেতে ভয় পায়। দামিনীর মতো নারীও তাকে পূর্ণতার স্বাদ দিতে পারল না। ফলে শচীশ ও পুরন্দর দুটিই উপন্যাসের কাপুরুষ ইন্দ্রের অর্থটিকে স্পষ্ট করে তুলল। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে বিমলার চোখে সন্দীপের তেজ ইন্দ্রের মতো উজ্জ্বল। বিমলা বীরপূজার ভঙ্গিতে সন্দীপকে দেখেছিল। সেই কারণেই তার মনে হয়েছিল— 'আমি স্পষ্টই অনুভব করতে পারলুম, আমার মুখের দিকে চাওয়ার পর থেকে তাঁর ভাষায় আগুন আরো জ্বলে উঠল। ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা তখন আর রাশ

মানতে চাইল না— বজ্রের উপর বজ্রের গর্জন, বিদ্যুতের উপর বিদ্যুতের চম্‌কানি। আমার মন বললে, আমারই চোখের শিখায় এই আগুন ধরিয়ে দিলে।'[৩৪] সন্দীপের কাছে ইন্দ্রলোক ঐশ্বর্যের প্রতীক। তাই ঐশ্বর্য তাঁর কাছে 'পারিজাতের পাপড়ি', 'ইন্দ্রাণীর লাবণ্য'। সন্দীপ আরো বলেন, 'পৃথিবীর যারা ইন্দ্র, লোভ তাদের ঐরাবত।'[৩৫] মস্ত ফারাক হয়ে যায় বিমলার ইন্দ্রভাবনা আর সন্দীপের ইন্দ্রভাবনার মধ্যে। বিমলা মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে বৈদিক দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রকে আর সন্দীপ নিজের লোভ-লালসার পৃথিবীতে পৌরাণিক ইন্দ্রের ক্ষমতালোভী, কামুক রূপ ধারণ করে। 'শেষের কবিতা'তে আবার ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণকে স্বর্গের কেতাদুরস্ত দেবতা বলা হয়েছে। যাজ্ঞিক মহলে তাদের যে নিমন্ত্রণ জুটত একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পৌরাণিক দেবসচেতনতা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। 'মালঞ্চ' উপন্যাসে নীরজাকে আদিত্য বলত নন্দনবনের ইন্দ্রাণী। সে না থাকলে ফুলের স্বর্গে বেনের দোকান বৃত্রাসুর হয়ে দখল জমাতো। উল্লেখ না করলেও নীরজার স্বামী হিসেবে আদিত্য ইন্দ্র হবার দাবি রাখতেও পারেন।

'চার অধ্যায়' উপন্যাসে এলার জীবনে তিন জন ইন্দ্র আসেন। বাবা মারা যাওয়ার পর এলা কাকার কাছে আসে। এই কাকার নাম সুরেশ অর্থাৎ ইন্দ্র। এরপরে এলার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যায় ইন্দ্রনাথের নাম। ইন্দ্রনাথ দেশের কাজ করেন। তাঁর চেহারায় আছে একটা কঠিন আকর্ষণশক্তি। যেন একটা বজ্র বাঁধা আছে সুদূরে ওর অন্তরে, তার গর্জন কানে আসে না, তার নিষ্ঠুর দীপ্তি মাঝে মাঝে ছুটে বেরিয়ে পড়ে। মুখের রঙ বাদামি, লালের আভাস দেওয়া। ভুরুর ওপর দুই পাশে প্রশস্ত টানা কপাল, দৃষ্টিতে কঠিন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, ঠোঁটে অবিচলিত সংকল্প এবং প্রভুত্বের গৌরব। কেউ জানে তার বুদ্ধি অসামান্য, কেউ জানে তার শক্তি অলৌকিক। ইন্দ্রনাথের প্রভুত্ব, বজ্রকঠিন ব্যক্তিত্ব দেবরাজ ইন্দ্রকেই মনে করায়। অতীনকে ভালোবাসে এলা। অতীন্দ্র নামের আড়ালে লুকিয়ে থাকেন বুদ্ধিদীপ্ত, নেতৃস্থানীয় এক ইন্দ্র যে বিভ্রান্তদের নতুন পথ দেখায়। 'চোখের বালি' উপন্যাসে মহেন্দ্র চরিত্রটি ইন্দ্রের চারিত্রিক ত্রুটি এবং দম্ভের প্রতীক হয়ে থাকে।

চার

'সাহিত্যের পথে' বইটির 'সৃষ্টি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠিক এর উল্টো কথা লিখেছিলেন। সেখানে তাঁর মতে, 'দেবতার এই ঈর্ষা, এই প্রবঞ্চনা বিশ্বাস করি নে। সিদ্ধির পরিপূর্ণ অখণ্ড মূর্তিটি যে কিরকম তাই— দেখিয়ে দেবার জন্যেই ইন্দ্র মধুরকে পাঠিয়ে দেন।'[৩৬] 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের পাঁচ সংখ্যক অধ্যায়ে ইন্দ্র সম্পর্কে ঋগ্বেদের একটি শ্লোকের উল্লেখ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই প্রবন্ধেরই শেষে লিখেছিলেন:

> ইন্দ্রের সঙ্গে আমি যোগ ঘটাতে এসেছি যে যোগ বন্ধুত্বের যোগ। জীবনের প্রয়োজন অন্নে বস্ত্রে বাসস্থানে, প্রয়োজন নেই আনন্দরূপে অমৃতরূপে। সেইখানে জায়গা নেয় ইন্দ্রের সখারা।[৩৭]

দেবতার সঙ্গে এক নতুন মৈত্রী ঘটালেন রবীন্দ্রনাথ। ইন্দ্র তাঁর কাছে সৌন্দর্যবোধের প্রতীক হয়ে গেলেন। 'সাহিত্য'-এর 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' প্রবন্ধে জানালেন যে সমগ্রের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগ ঘটালেই প্রকৃত বিকাশ সম্ভব। স্বর্গরাজ ইন্দ্র যদি সেই বিকাশ সাধনের বিঘ্ন ঘটাবার জন্য সৌন্দর্যকে মর্তে পাঠিয়ে দেন, তাহলে ইন্দ্রদেবের সেই প্রবঞ্চনাকে দূর থেকে নমস্কার করে দুই চোখ বন্ধ করে থাকাকেই শ্রেয় বলে মনে করাকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তার সঙ্গে অন্য কথাও বললেন—

> কিন্তু ইন্দ্রদেবের প্রতি আমার লেশমাত্র অবিশ্বাস নাই। তাঁহার কোনো দূতকেই মারিয়া খেদাইতে হইবে এমন কথা আমি বলিতে পারিব না। একথা নিশ্চয়ই জানি, সত্যের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের প্রগাঢ় এবং অখণ্ড মিলন ঘটাইবার জন্যই সৌন্দর্যবোধ হাসিমুখে আমাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে।[৩৮]

সাধকদের তপোসিদ্ধির পথে পথে ইন্দ্রদেব যে বাধা রেখে যান এবং মানুষের কীর্তি-বুদ্ধি-সাহস তা ধূলিসাৎ করে, একথা 'জাভাযাত্রীর পত্র'-এর ৩ সংখ্যক পত্রটিতেও বলা হয়েছে। 'জীবনস্মৃতি'র 'বাহিরে যাত্রা' অংশে বাসি রুটি আর এখোগুড়ের স্বাদ নাকি ইন্দ্রলোকে 'ইন্দ্র যে অমৃত খাইয়া থাকেন' তা একই— এমনটাই বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'পারস্যে' বইটির প্রথম পরিচ্ছেদে ইন্দ্রদেবের খেয়ালের কথা বলেছিলেন শুষ্ক মরুতে বৃষ্টির আগমন সম্ভাবনা প্রসঙ্গে। আবার, 'সমূহ' বইটিতে 'সভাপতির অভিভাষণ'-এ মানুষের একাগ্র শক্তিকে বড়ো করার প্রসঙ্গে বলেছিলেন, '... ইহার প্রবল পুণ্যস্রোতকে ইন্দ্রের ঐরাবতও বাধা দিতে পারিবে না।'[৩৯] 'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রবন্ধে পাড়ার মদের দোকান আর ইন্দ্রলোকের সুরাপান সভার তুলনা টেনে এনেছিলেন। 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'র ১০ সংখ্যক পত্রটিতে বর্ষা প্রকৃতির বর্ণনা করতে গিয়ে টেনে আনলেন ইন্দ্রের ঐরাবতের উপমান—

> ইন্দ্রের ঐরাবতের বাচ্চার মতো মোটা মোটা কালো মেঘ আকাশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে।[৪০]

'শিক্ষা' গ্রন্থে 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধটিতে ক্ষমতালোভী ইন্দ্রের ইঙ্গিত রয়েছে— 'আমাদের দেশে যারা বজ্র হাতে ইন্দ্রপদে বসিয়া আছেন তাঁদের সহস্রচক্ষু। কিন্তু বিদ্যার এই বর্ষণের বেলায় অন্তত তার ৯৯০টা চক্ষু নিদ্রা দেয়।'[৪১]

পাঁচ

'ব্যঙ্গকৌতুক' বইটির একটি নাটক হল 'অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি'। গোকুলনাথ এই নাটকের এক অন্যতম চরিত্র। মৃত্যুর পর সে সোজা পৌঁছে যায় ইন্দ্রলোকে। সেখানে দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে কথা হয় তাঁর। সেই সময় ইন্দ্রের পাশে বসেছিলেন শচী। মহেন্দ্রের সভায় বৃদ্ধ রাজর্ষি-দেবর্ষিরা বসে থাকে। গোকুলনাথ ইন্দ্রসভাতেও যান্ত্রিক নিয়ম জারি করতে চায়। ইন্দ্র যে সহস্রাক্ষ তা গোকুলনাথের কথা থেকেই বোঝা

যায়— 'আপনার সহস্র চক্ষুর মধ্যে একজোড়া চোখও যদি এদিকে ফেরান তা হলে—।'[৪২]

'স্বর্গীয় প্রহসন' নাটকটির একটি অন্যতম চরিত্র হলেন দেবরাজ ইন্দ্র। তিনি স্বর্গের পথ দুর্গম করবেন বলে অন্তহীন চেষ্টা করেন। এই ইন্দ্রের প্রধান চিন্তার বিষয় হল ভক্তদের ভক্তিহীনতা। মনে হয়, এই নাটকের ইন্দ্র চরিত্রটি বৈদিক ইন্দ্র। কারণ তিনি দৃপ্তভাবেই বলেন, 'একমাত্র বেদমন্ত্রের উপর আমাদের স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত।'[৪৩] ইন্দ্র ও চন্দ্রের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের ছবি নাটকটি থেকে খুঁজে পাওয়া যায়। ইন্দ্র অভিজাত ভঙ্গিতে, শালীন ভাষায় কথা বলেন। কিন্তু লৌকিক দেবদেবীদের অত্যাচারে বিষ্ণুলোকে পালিয়ে বাঁচেন। দেবরাজ ইন্দ্রের বৈদিক রূপকল্পটিকে ছুঁয়ে নতুন এক পুরাণের জন্ম দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ— 'স্বর্গীয় প্রহসন' নাটকে।

বেদ ও পুরাণের গল্পকথাগুলিকে আত্মস্থ করে রবীন্দ্রনাথ দেবরাজ ইন্দ্রকে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর সৃষ্টিলোকে। ইন্দ্রের ক্ষমতালোভী, ভ্রষ্টাচারী মূর্তি যেমন তাঁর কলমের স্পর্শে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, তেমনি নতুন এক শিল্পী মনের ইন্দ্রও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে রবীন্দ্রসাহিত্যের দেবলোকে। সেইদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ইন্দ্রের সৃষ্টির সহচর, 'ইন্দ্রসখা'।

বরুণ

বরুণ হলেন পৃথিবীর জলের দেবতা। বরুণকে সাগরের অধীশ্বরও বলা চলে। রামায়ণ অনুসারে সমুদ্র হল বরুণের বাসস্থান। ঋগ্বেদে বরুণ হলেন একজন প্রধান দেবতা। ঋগ্বেদে বরুণ অন্তরীক্ষ ও সমুদ্রের পথ সম্পর্কে অভিজ্ঞ। বেদে বরুণকেও সহস্রলোচন বলা হয়েছে। ইনি হলেন দশ দিকপালের মধ্যে অন্যতম একজন। সূর্য তাঁর নেত্র; সুবর্ণময় তাঁর রথ ও প্রাসাদ। ইনি বারুণী নামে সুরাপান করতেন। বেদে বরুণ সহস্রলোচন বলে কথিত আছেন। ইনি হলেন ধনাধিকারী, জলবিন্দুর মতো শ্বেতবর্ণ, গৌর মৃগের মতো বলবান। মহাভারত অনুসারে বরুণ হলেন কর্দম ঋষির পুত্র আর পুষ্করের পিতা। খাণ্ডবদাহনের সময় অগ্নিকে সাহায্য করার জন্য বরুণ অর্জুনকে চন্দ্রের দেওয়া গাণ্ডীব ধনু, দুটি অক্ষয় তূণীর ও কপিধ্বজ রথ এবং কৃষ্ণকে একটি চক্র ও কৌমোদকী নামে গদা প্রদান করেন। বরুণ চন্দ্রের কন্যা ও উতথ্যের স্ত্রী ভদ্রাকে অপহরণ করেছিলেন। মহর্ষি উতথ্য জলরাশি পান করে ফেলেন। তখন বরুণ ভদ্রাকে প্রত্যার্পণ করেন।[৪৪] গ্রিক পুরাণে সমুদ্রের অধিপতি দেবতা হলেন পোসাইডন। সুবিশাল সমুদ্রগর্ভে ফসফরাসের আলোয় আলোকিত এক সচল সুবর্ণ প্রাসাদে তিনি বাস করতেন। রোমান পুরাণের মহাসাগর দেবতা হলেন নেপচুন। নেপচুনের পত্নী স্যালাসিয়া হলেন লবণাক্ত জলরাশির

দেবী। জাপানে বরুণের নাম হল সুই তেন। জলের অধিপতি হওয়ার জন্য বরুণের বাহন শিশুমার, হাঁস অথবা মকর।[৪৫]

দুই

রবীন্দ্রসাহিত্যে বরুণদেবতা এসেছেন খুব নির্বাচিত কয়েকটি স্থানে। বেদ ও সংহিতার রূপান্তর করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে '৭' সংখ্যক রূপান্তরটিতে বরুণদেবকে সম্বোধন করে নিজের অজ্ঞাতসারে করা পাপের কথা স্বীকার করেননি কবি। ক্ষমা চেয়ে বলেছেন, 'বিনাশ কোরো না মোরে।'[৪৬] এই অনুবাদটি থেকে অনুমান করা যায়, বরুণ বেদের যুগে খুব শক্তিশালী দেবতা ছিলেন। যিনি আশীর্বাদী রূপের সঙ্গে সঙ্গে বিনাশকারী শক্তি হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। এই রূপান্তরগুলির '৮' সংখ্যক অনুবাদটিতে বরুণকে নিয়ে কবিতার চারটি স্তবক রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই অনুবাদে বরুণকে তিনি 'ঋতবান্', 'সম্রাট' বলে সম্বোধন করেছেন। ঋগ্বেদে বরুণকে 'রাজা' বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যের পৃথিবীতে বরুণকে সেই সম্মানটা দিলেন। এই কবিতাটি থেকে জানা যায় বরুণদেব বিদ্রোহীদের দণ্ডদান করেন। কবি বরুণের দিব্যজ্যোতি থেকে দূরে যেতে চান না। এই কবিতায় বরুণ স্তুতি থেকে বরুণ দেবের সনাতন কৃত কর্ম, অপরাজিত সত্তা এবং সর্বপ্রকাশিত জ্যোতির্ময় রূপের কথা জানা যায়। অন্যের কৃত পাপের বোঝা কবি টানতে চান না। দেবতা বরুণের কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন কবি, 'আমার জীবন করিয়া পালন লাগাও তোমার কাজে।'[৪৭]

তিন

'ব্যঙ্গকৌতুক'-এর একটি কৌতুকগল্প হল 'প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ'। মানুষের অত্যাচারে স্বর্গের সমস্ত দেবতাই রিজাইন দিতে উদ্যত হলেন। পিতামহ ব্রহ্মা নাকি আগে থেকেই রিজাইন করে পেনশন নিচ্ছেন। বাকি সকল দেবতাই 'সায়েন্স' নামক দানবের কাছ থেকে পরিত্রাণ পেতে চান। বরুণের অবস্থাও অন্য সকলের মতোই করুণ। বরুণ মিটিং-এ এসে অশ্রুজল বর্ষণ করে বললেন যে নরলোকে তাঁর আর কোনো আবশ্যক নেই। কারণ, 'খোলাভাঁটিবাহিনী বারুণী' তাঁকে উচ্ছেদ করার সঙ্কল্প করেছে। সেই জন্য বরুণ 'মানে মানে সময় থাকিতে সরিতে' চান। দেবতারা বহু চিন্তা ও তর্কের পরে স্ট্যাটিসটিকস দেখে অবশেষে স্থির করলেন যে তখনও সময় হয়নি। কারণ বারুণীর প্রাখর্য নিবারণের জন্য দুর্বল মানব বরুণের সহায়তা প্রার্থনা করে থাকে। কবিতায় বরুণদেবের যে আভিজাত্য প্রকাশ

করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, গল্পে তা অনেক লঘু করে দেখিয়েছিলেন।

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উপন্যাস 'শেষের কবিতা'। এই উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ 'অমিত চরিত'-এ ফ্যাশন আর স্টাইলের বিষয়ে বলতে গিয়ে অমিত দেবতা বরুণের কথা বলেছেন, 'ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ একেবারে স্বর্গের ফ্যাশনা দুরন্ত দেবতা যাজ্ঞিক মহলে তাঁদের নিমন্ত্রণও জুটত।'[৪৯] এখানে বরুণ সনাতন অভিজাত দেবতাদের গোষ্ঠীতে স্থান পেয়েছেন।

চার

'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'র ২৭/২৮ আগস্ট, ১৮৯০-এর লেখাটিতে বরুণ সমুদ্রদেব হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথের কলমের স্পর্শে। সমুদ্রে যাত্রা করার শারীরিক কষ্ট সহ্য করতে গিয়ে বলেছেন যে দেবাসুরগণ সমুদ্র মন্থন করে সমুদ্রের মধ্যে যা কিছু ছিল সমস্ত বার করেছিলেন। সমুদ্রদেব বা অসুরেরও কিছু করতে পারলেন না, হতভাগ্য দুর্বল মানুষেরা এই অসুস্থতার কারণে তার প্রতিশোধের শিকার হচ্ছে।[৫০] এই প্রবন্ধ অনুসারে 'সমুদ্রদেব' বরুণের ছবি পাওয়া যায়। আমাদের মনে পড়ে যেতে পারে গ্রিক সমুদ্রদেবতা পোসাইডনের কথা।

'জাভাযাত্রীর পত্রে'র ২ সংখ্যক পত্রটিতে পৃথিবীকে ঘিরে, দিনে রাত্রে বেজে চলা বরুণের মৃদঙ্গের কথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মৃদঙ্গ হাতে বরুণ কল্পনাটি বেশ অভিনব। 'জাপান যাত্রী'তেও সমুদ্রদেবতার বিভিন্ন রূপের কথা আছে। ১৩২৩ বঙ্গাব্দের ২৪ বৈশাখ-এর লেখাটিতে একদিন রাতের স্বপ্নে রবীন্দ্রনাথ দেখলেন মৃত্যু সম্পর্কে বেদমন্ত্র আবৃত্তি করছেন। সেই মন্ত্রের মাঝখানে জেগে উঠে তিনি দেখলেন,

> আকাশ ও জল তখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। সমুদ্র চামুণ্ডার মতো ফেনার জিব মেলে প্রচণ্ড অট্টহাস্যে নৃত্য করছে।[৫১]

সমুদ্রকে চামুণ্ডারূপে দেখার চোখটা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। বরুণদেবতার প্রলয়রূপ বোঝাতে গিয়ে তিনি নারী ভাব আরোপ করেছিলেন। আবার তুফানের সমুদ্রের নীচে শান্ত সমুদ্রের মতো মানুষের অন্তরের গভীরে একটি বিরাট শান্ত পুরুষের কল্পনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের একটি অন্যতম সাহিত্যসৃষ্টি হল 'পঞ্চভূত'। এই রচনায় রবীন্দ্রনাথ পাঁচটি পারিপার্শ্বিককে পাঁচটি চরিত্রের মতো করে তুলে ধরলেন। পাঁচটি পারিপার্শ্বিক হল— ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। এদের মধ্যে 'অপ্' হল জল। পুরাণ এবং বেদ অনুসারে এই প্রাকৃতিক উপাদানটিই

বরুণ দেব হিসেবে যুগে যুগে পূজিত হয়ে এসেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাম দিলেন 'স্রোতস্বিনী'। তাঁর কণ্ঠস্বর যেন মধুর কাকলি। তিনি সুন্দর ভঙ্গিতে ঘুরে ফিরে কথা বলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

> কেবল একটি তরল সংগীতের ধ্বনি, একটি অনুনয়স্বর, একটি তরঙ্গনিন্দিত গ্রীবার আন্দোলন।[৫২]

বরুণের নারীরূপ বলেই স্রোতস্বিনীর 'অনুনয় প্রবাহে' ক্ষিতি অর্থাৎ পৃথিবী 'প্রায় গলিয়া যান।'[৫৩] বরুণের স্রোতস্বিনী হয়ে ওঠার অন্তরালে রয়ে যায় রাবীন্দ্রিক যুক্তি—

> একটা গড়া নাম দিতে গেলেই মানুষকে বদল করিতে হয়। তলোয়ারের যেমন খাপ, মানুষের তেমন নামটি ভাষায় পাওয়া অসম্ভব। বিশেষত ঠিক পাঁচটা ভূতের সহিত পাঁচটা মানুষ অবিকল মিলাইব কী করিয়া?
>
> আমি ঠিক মিলাইতে চাহি না। আমি তো আদালতে উপস্থিত হইতেছি না। কেবল পাঠকের এজলাসে লেখকের একটা ধর্মশপথ আছে যে, সত্য বলিব। কিন্তু সে সত্য বানাইয়া বলিব।[৫৪]

সত্যকে অতিরঞ্জিত করে বলার অধিকার সব সাহিত্যিকেরই আছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে দেবতারাও তাই কল্পনার তুলির স্পর্শে অনেক সময় অভিনব ও স্বতন্ত্র। বরুণদেব কখনো শান্ত সমুদ্র, কখনো সম্রাট, কখনো চামুণ্ডার মতো উন্মত্ত, আবার কখনো অনাবশ্যক সৌন্দর্যে তরঙ্গায়িত স্রোতস্বিনী।

সূর্য

আর্যদের উপাস্য দেবতা ছিলেন সূর্য। সূর্য, সবিতা, আদিত্য, বিবস্বান, বিষ্ণু— এই পাঁচটি বিভিন্ন নামে সূর্যের স্তুতি দেখতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ১০টি সূক্তে সূর্যের বন্দনা রয়েছে। এই সূর্য জড় জ্যোতিঃপিণ্ড নন, ইনি সূর্যমণ্ডল মধ্যবর্তী দেবতা। আলোয় উদ্ভাসিত আকাশ হল এঁর মুখ, সূর্যমণ্ডল এঁর চক্ষু, এই দেবতা হিরণ্যপাণি, সর্বদর্শী, বিশ্বভুবনের চর, মর্ত্যজনের সৎ ও অসৎ কর্মের সাক্ষী। সপ্তাশ্বযোজিত একচক্র রথে ইনি বিশ্বপর্যটন করেন। বরুণ তাঁর পথ পরিষ্কার করে দেন। সূর্য মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করেন। সমস্ত প্রাণী তাঁর অধীন। সূর্য অদিতির সন্তান। ঊষা এবং সূর্যের বিচিত্র সম্পর্কের কথা কল্পনা করা হয়। বৈদিক মতে সূর্য প্রণয়ীর মতো সুন্দরী ঊষাকে অনুসরণ করেন। কখনো মনে করা হয়েছে ঊষা সূর্যের স্ত্রী আবার কখনো ঊষাকে সূর্যের মা হিসেবেও কল্পনা করা হয়েছে। সূর্য আকাশে পাখি অথবা বৃষের মতো বিচরণ করেন। এই দেবতা হলেন আকাশের রত্ন, উজ্জ্বল অস্ত্রে সজ্জিত, আলোকময় তাঁর রথের চক্র। মিত্র ও বরুণ সূর্যকে মেঘ ও বৃষ্টি দিয়ে আবৃত করেন। ইন্দ্র সূর্যকে পরাজিত করে তাঁর রথচক্র হরণ করেন। স্বর্ভানু রাক্ষস অন্ধকারে সূর্যকে আচ্ছাদন করে গ্রহণ করে। অত্রি সূর্যকে মুক্ত করে আবার আলোয় প্রতিষ্ঠিত করেন। অথর্ববেদে সূর্যের শত্রু রাহুর উল্লেখ পাওয়া যায়। সূর্য হলেন আলোর দেবতা। পুরাণ মতে, বিশ্বকর্মার মেয়ে সংজ্ঞা হলেন সূর্যের স্ত্রী। বিশ্বকর্মা

সূর্যের উগ্র তেজ হ্রাস করার জন্য তাঁর দেহের অষ্টম অংশ ছেদন করে তাই দিয়ে বিষ্ণুর চক্র, শিবের ত্রিশূল, কুবেরের অস্ত্র, কার্তিকের তরবারি ও অন্যান্য দেবতাদের অস্ত্র প্রস্তুত করেছিলেন। মহাভারতে সূর্য এবং কুন্তীর সন্তান হলেন কর্ণ। বিদেশি পুরাণে অ্যাপোলো এবং হেলিওস অভিন্ন। তাঁরাও সূর্যদেবতা বলে পরিচিত ছিলেন। অ্যাপোলো 'ফীবাস অ্যাপোলো' নামেও পরিচিত ছিলেন। 'ফীবাস' শব্দটির অর্থ ছিল উজ্জ্বলতা।[৫৫]

দুই

রবীন্দ্রসাহিত্যে সূর্য দেবতার উল্লেখ বিরল নয়। রবীন্দ্রকবিতার প্রথম পাঠ থেকে সূর্যের ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায়। 'প্রভাতসংগীত'-এর ''প্রভাতউৎসব'' কবিতায় সূর্যের 'অরুণতরী'র অভিনব উল্লেখ আছে— 'অরুণতরী তব পূরবে ছেড়ে দাও।'[৫৬] 'ছবি ও গান' বইতে 'যোগী' কবিতায় এক ঋষির সূর্যবন্দনার বর্ণনা আছে। সূর্যকে এখানে 'কিরণ মৃণাল'-এর ওপর 'জ্যোতির্ময় কনককমল' রূপে কল্পনা করা হয়েছে। তার সঙ্গে আকাশের দিকে হাত তুলে ঋষির বেদপাঠ কবিতায় বৈদিক আবহ তৈরি করে। 'মানসী'র 'পুরুষের উক্তি' কবিতায় কবির প্রথম যৌবনের প্রেমকে ঘিরে তৈরি হয়েছে ঊষা ও সূর্যের প্রেমের আর্কেটাইপ। সূর্য এই কবিতায় প্রেমিকপুরুষ।

সুধাপাত্র লয়ে হাতে কিরণকিরীট মাথে
তরুণদেবতাসম দাঁড়ানু সম্মুখে।[৫৭]

'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'অনাদৃত' কবিতাতেও তরুণ রবি সকালবেলা ঊষার জন্য সোনার থালায় পুজো নিয়ে আসেন। 'লেখন' কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতায় সূর্যকে 'শুভ্র ফলের মতো'[৫৮] বলেছিলেন লেখক। ইংরেজি অনুবাদে— 'the fruit of the simple white light.'[৫৯] সূর্য এবং ঊষার এক অসমাপ্ত প্রেমের গল্প কল্পনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই অপূর্ণ প্রেমভাবনার ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায় 'লেখন'-এরই অন্য একটি কবিতায়—

উষা একা একা আঁধারের দ্বারে ঝংকারে বীণাখানি
যেমনি সূর্য বাহিরিয়া আসে মিলায় ঘোমটা টানি।।[৬০]

এই সম্পর্কে দর্শনসুখ নেই। শুধুই অনুভূতির বীণার ঝঙ্কার। 'পূরবী'র 'সাবিত্রী' কবিতায় সূর্যকে 'বন্ধু' সম্বোধন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সূর্যকে 'আলোর পদ্ম' হিসেবে কল্পনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই আলোর পদ্মের কেন্দ্রে অবস্থান কবির জীবনদেবতার যিনি 'বহ্নিবীণা বক্ষে লয়ে, দীপ্ত কেশে'[৬১] সেই পদ্মের কেন্দ্রে বসে রয়েছেন। এই কবিতার নাম 'সাবিত্রী'। সবিতা হল সূর্য। এখন সূর্যের স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সূর্যের কল্পনার আড়ালে এক তেজস্বিনী, জ্যোতির্ময়ী নারীমূর্তি আমরা খুঁজে

পাই। 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের ২৩ সংখ্যক কবিতায় সূর্যকে আবার সরাসরি 'সবিতা'ই সম্বোধন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—

> হে সবিতা, তোমার কল্যাণতম রূপ
> করো অপাবৃত,
> সেই দিব্য আবির্ভাবে,
> হেরি আমি আপন আত্মারে মৃত্যুর অতীত।[৬২]

'বনবাণী' কাব্যগ্রন্থের 'কুরচি' কবিতায় আকাশের সূর্যদেবতার হাতে আলোর বীণা দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।[৬৩] আমাদের সরাসরি মনে পড়ে যেতে পারে গ্রিক দেবতা অ্যাপোলোর কথা। অ্যাপোলোর হাতের বীণাটি বেশ মানানসইভাবে সূর্যের হাতে পৌঁছে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এইখানে তাঁর সূর্যভাবনার বিশেষত্ব।

তিন

'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'-এর তৃতীয় পত্রটিতে সূর্যের এক নতুন রূপের কথা লিখেছিলেন। ওই দেশে সূর্য অনেক তপস্যার পরে দেখা দেয়—

> আজ ব্রাইটনের অনেক তপস্যার পর সকালে সূর্য উঠেছেন। এদেশে রবি যেদিন মেঘের অন্তঃপুর থেকে বের হন সেদিন একটি লোকও কেউ ঘরে থাকে না।[৬৪]

মেঘের অন্তঃপুরে লুকিয়ে থাকা এই নতুন সূর্যদেবকে এই পত্রটিতে খুঁজে পাওয়া যায়। 'বৈজ্ঞানিক যুগের কাব্য ব্যবস্থায় যে ব্যয়সংক্ষেপ চলছে' তার বর্ণনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছিলেন অ্যাপোলো দেবতার কথা।—

> একজন কবি লিখছেন : I am the greatest laugher of all। বলছেন 'আমি সবার চেয়ে বড়ো হাসিয়ে, সূর্যের চেয়ে বড়ো, ওক গাছের চেয়ে, ব্যাঙের চেয়ে, অ্যাপোলো দেবতার চেয়ে।' Than the frog and Apollo এটা হল ভাঙা কাঁচ। পাছে কেউ মনে করে কবি মিঠে করে সাজিয়ে কথা কইছে।[৬৫]

লক্ষ করার মতো সূর্য এবং আপোলো যে ভিন্ন রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন। কিন্তু ইচ্ছেমতো দুই দেবতাকে মিলিয়েও দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কখনো আবার ঈশোপনিষদের শ্লোক অনুবাদের সময় সূর্যকে 'পূষণ্' সম্বোধন করে লিখেছিলেন— 'আমার মধ্যে যিনি সেই পুরুষ তোমার মধ্যে।' পূষণ্ তথা সূর্যকে ঢাকা খুলে জ্যোতির প্রকাশ দেখাতে অনুরোধ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কারণ তিনি সেই জ্যোতির মধ্যে নিজের আত্মাকে উজ্জ্বল দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মনের বাঁশি সূর্যের আলোক নিঃশ্বাসে পূর্ণ হয়। সমস্ত আকাশকে আনন্দের গানে জাগ্রত করে তোলে রাবীন্দ্রিক সূর্যদেবতা।

চন্দ্র

চন্দ্রদেবতাকে ঋগ্বেদে বলা হয়েছে সোম। এই দেবতার কোনো পূজা আধুনিক যুগে প্রচলিত নেই। চন্দ্র মূলত পৌরাণিক দেবতা। তাঁর সম্পর্কে অনেক লৌকিক গল্প প্রচলিত আছে। কেউ বলেন যে তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্র অত্রিমুনির ছেলে। জন্মের পরেই ত্রিচক্র রথে আরোহন করে পৃথিবী পরিক্রমা ও আলোকদান করতে থাকেন। দক্ষের সাতাশ জন কন্যাই তাঁর স্ত্রী ছিলেন। কালিকাপুরাণ অনুসারে, চন্দ্র রোহিনীর প্রতি বেশি অনুরক্ত থাকায় তাঁর অন্য স্ত্রী-রা ব্যথিত থাকতেন। ফলে, দক্ষ চন্দ্রকে পুত্রকন্যাহীন ও যক্ষারোগগ্রস্ত হওয়ার অভিশাপ দেন। পরে তা লঘু করেন ও মাসের এক পক্ষে ক্ষয় ও অপরপক্ষে বৃদ্ধি পাওয়ার কথা বলেন। এই দুই পক্ষই কৃষ্ণপক্ষ এবং শুক্লপক্ষ।

সমুদ্র মন্থনের সময় অমৃত, পারিজাত, লক্ষ্মী, ঐরাবত ও উচ্চৈঃশ্রবার সঙ্গে চন্দ্রের জন্ম হয়। ইনি দেবতাদের মধ্যে অন্যতম। অমৃতপানের সময় রাহুকে দেখতে পেয়েছিলেন চন্দ্র। বিষ্ণুকে সেকথা বলায় রাহুকে বধ করেছিলেন বিষ্ণু। সেই থেকেই রাহু ও চন্দ্রের শত্রুতা এবং রাহুর ছিন্ন শির সুযোগ পেলেই চন্দ্রকে গ্রাস করেন। কিন্তু ছিন্ন কণ্ঠ দিয়ে চন্দ্র আবার বেরিয়ে যান। পৌরাণিক ধারণায় এই হল চন্দ্রগ্রহণ।

চন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে অপহরণ করেন। ফলে এক মহাযুদ্ধের অবতারণা হয়। ব্রহ্মার মধ্যস্থতায় সমস্যাটির সমাধান ঘটে এবং তারা বৃহস্পতির কাছে ফিরে যান। চন্দ্র ও তারার জারজ সন্তান হলেন বুধ। কেউ বলেন বৃহস্পতির অভিশাপেই চন্দ্রের ক্ষয়রোগ হয়েছিল।[৬৬]

গ্রিকপুরাণে চন্দ্রদেবী হলেন সেলিনি। সেলিনি আর মর্ত্যমানব এণ্ডিমিয়নের প্রেমকাহিনি গ্রিকপুরাণের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। রোমান পুরাণে লুনা হলেন চন্দ্রদেবী। এই পুরাণে সূর্যদেবতা সোল এবং চন্দ্রদেবী লুনা হলেন স্বামী-স্ত্রী।[৬৭]

দুই

রবীন্দ্রনাথের মতো কল্পনাপ্রবণ মানুষের লেখা সাহিত্যে চন্দ্র যে তার সৌন্দর্যের ডালি সাজিয়ে অগুন্তিবার আসবেন, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দেবতা হিসেবে চন্দ্রের উল্লেখগুলিই আমাদের আলোচ্য বিষয়। ভারতীয় পুরাণের চন্দ্রদেবতার ধারণাটিকে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছিলেন ‘খাপছাড়া’র

১৩ সংখ্যক ছড়াটিতে। সেখানে পৌরাণিক দেবতাগুলির ওপর ইচ্ছামতো বিশেষণ আরোপ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এখানে গণেশ হলেন 'ধুরন্ধর' এবং 'ইতিহাস বিশারদ'। চন্দ্রদেবতা হয়েছেন 'চন্দর'— 'সাগরমন্থনে কোথা উঠেছিল চন্দর।'[৬৮] 'পুরাণ' প্রসঙ্গটির সত্যতা নিয়ে একটু মজা করলেন রবীন্দ্রনাথ। 'পত্রপুট'-এর 'পৃথিবী' কবিতায় চাঁদের হাতের পেয়ালা উপচিয়ে স্বর্গীয় মদের ফেনা ছড়িয়ে পড়ার প্রসঙ্গ আছে।[৬৯] ১৩৩৬-এর জ্যৈষ্ঠ মাসে লেখা একটি গান হল 'চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে'।[৭০] পারিজাতের কেশর নিয়ে পৃথিবীতে চন্দ্র সুধা ছড়াচ্ছেন। ইন্দ্রপুরীতে জ্বলে উঠেছে বাসরপ্রদীপ। এই গানে একটি প্রেমময় আবহ তৈরি হয়েছে। এই প্রেমময় আবহ মনে করিয়ে দেয় গ্রিক চন্দ্রদেবীর মর্ত্যবাসীর প্রতি অনুরাগের কথা। আবার একই সঙ্গে মনে হয় ঋগ্বেদে সোম বা চন্দ্রদেবতার সঙ্গে সোমলতার সাজুয্যের কথা, যা সুধার জন্ম দেয়। 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যে অমর আর প্রমদার মিলনক্ষণে শান্তা আর সখীরা গান করে— 'ও চাঁদ হাসো, হাসো/হারা হৃদয় দুটি ফিরে এসেছে।'[৭১] দুটি হৃদয়ের মিলনক্ষণে 'চাঁদের হাসি' আবার গ্রিক দেবীর কথা মনে করিয়ে দিতে পারে।

তিন

'য়ুরোপযাত্রীর ডায়রি'র ১ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে আবার প্রায় একই অনুষঙ্গে চন্দ্রদেবতাকে নিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ। সকলে যখন জাহাজের ডেকে জুড়ি নৃত্য করছিল—

> তখন পূর্বদিকে নব কৃষ্ণপক্ষের পূর্ণপ্রায় চন্দ্র ধীরে ধীরে সমুদ্রশয়ন থেকে উঠে আসছে। এই তীররেখাশূন্য জলময় মহামরুর পূর্বসীমান্তে উদয়পথের ঠিক নীচে থেকে আমাদের জাহাজ পর্যন্ত অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে প্রশস্ত দীর্ঘ আলোকপথ ঝিকমিক করছে।[৭২]

আর এই চাঁদের মায়াবি আলোয় প্রেমে মাতোয়ারা নরনারীর জুড়ি নৃত্য অব্যাহত ছিল। এই প্রসঙ্গটির সূত্রে সমুদ্রমন্থনের ফলে চন্দ্রের জন্ম এবং গ্রিকদেবী সেলেনির মোহময়ী রূপ একই সঙ্গে মনে পড়ে যায়।

চার

'ব্যঙ্গকৌতুক'-এর একটি নাটক হল 'স্বর্গীয় প্রহসন'। এই নাটকে বিপন্ন চন্দ্রদেবতার ইঙ্গিত আছে। নাটকটিতে স্বর্গরাজ্যে এক অভিনব বিপদের কথা বলা হয়েছে। স্বর্গে কিছু লৌকিক দেবদেবী জায়গা পেতে চাইছেন। যেমন— ঘেটু, শীতলা, মনসা প্রভৃতি। এদের মধ্যে শীতলা আবার চন্দ্রের প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ প্রকাশ করায় চন্দ্র পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। এই নাটকে চন্দ্রকে দেবলোকের এক অভিজাত দেবতা হিসেবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু চিন্তায় তাঁর 'সৌম্যসুন্দর প্রফুল্ল মুখচ্ছবি অন্ধকার'।[৭৩] চন্দ্রের কথা থেকেই জানা যায় স্বর্গে কৃষ্ণপক্ষ নেই। তাই চন্দ্রের পক্ষে আত্মগোপন করাও অসম্ভব।

এই নাটকে চন্দ্রের 'সপ্তবিংশতি নক্ষত্রনারী'[৭৪] নিয়ে চন্দ্রের অন্তঃপুরের কথা বলা হয়েছে। এই সাতাশ জন স্ত্রী প্রতিমুহূর্তে চন্দ্রের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেন। চন্দ্রকে শীতলা অশালীন ভাষায় সম্বোধন করে চলেন। 'কানমলা' পর্যন্ত দিতে উদ্যত হন। কিন্তু চন্দ্র বিপন্ন মুহূর্তেও 'অয়ি অনবদ্যে', 'হে হরিণশালীনয়ননে'র মতো অভিজাত ভাষায় কথা বলেন।[৭৫] মনসা ও শীতলার গ্রাম্য কলহকে 'মিষ্টভাষণ' বলে কপট আচরণ করেন। চন্দ্র এখানে ইন্দ্রের বন্ধু। অশ্লেষা ও মঘা যখন চন্দ্রকে শীতলাকে নিয়ে পরিহাস করেন, তখন চন্দ্র পৌরাণিক রাহুর প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। নতুন পুরাণ তৈরির মতো করে বলেন,

> পুরুষ রাহু আমাকে কেবল ক্ষণমাত্রকাল পরাভব করিতে পারে সেই আক্রোশে ভগবান একটি স্ত্রী রাহু সৃজন করিয়াছেন, ইঁহার পূর্ণগ্রাস হইতে আমি বহু চেষ্টায় আপনাকে মুক্ত করিতে পারিতেছি না।[৭৬]

আপাতভাবে এটি দেবতা চন্দ্রের প্রতি রাবীন্দ্রিক ব্যঙ্গ, কিন্তু এর অন্তরালে অভিজাত ও লৌকিক দেবদেবীদের মধ্যযুগীয় দ্বন্দ্বের ইতিবৃত্ত লুকিয়ে আছে। দেবচরিত্রগুলি সৃজনের আড়ালে লুকিয়ে আছে রবীন্দ্র-মনস্তত্ত্ব। যে মানসিকতা চন্দ্রকে শীতলার থেকে ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছে। আবার চন্দ্রের চারিত্রিক দুর্বলতার প্রতিও কটাক্ষ করেছেন নাটককার রবীন্দ্রনাথ। 'শেষের কবিতা' উপন্যাসেও চন্দ্রের ফ্যাশন সম্পন্ন অভিজাত দেবতা হিসেবে উল্লেখ আছে। 'প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ' কৌতুক নাটকটিতে মানুষের আধুনিকতার জ্বালায় অন্য দেবতার মতো চন্দ্রও জর্জরিত। 'ভগবান চন্দ্রমা' শুক্ল প্রতিপদের কৃশমূর্তি ধারণ করে ব্রহ্মাকে জানিয়েছিলেন :

> নরলোকে কবিরা তাঁহাদের প্রেয়সীর পদনখরকে আমা অপেক্ষা দশগুণ প্রাধান্য দিয়া থাকেন, অতএব যে পর্যন্ত কবি রমণীমহলে পাদুকার সম্পূর্ণ প্রচলন না হয় সে পর্যন্ত আমি অন্তঃপুরে যাপন করিতে চাই।[৭৭]

রোমান্টিক কবিমন যে সাহিত্যিকের, তাঁর সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবে চাঁদ এসেছে অসংখ্য বার। কিন্তু দেবতা চন্দ্র তাঁর নিজস্ব গাম্ভীর্য নিয়ে কখন কখন রবীন্দ্রসাহিত্যের দেবলোককে আলোকিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ পুরাণকে সরাসরি অনুসরণ করেছেন যেখানে পুরুষ চন্দ্র ভারতীয় মিথকে মান্যতা দেয়। কখনো মর্ত্যপ্রেমের আবহ তৈরি করে যে চাঁদ, তাঁর জ্যোৎস্না সেই চাঁদের আড়ালে রয়ে যেতে পারে গ্রিক সেলিনি অথবা রোমান দেবী লুনার কোমল মূর্তি।

ব্রহ্মা

ব্রহ্মা হলেন পৌরাণিক দেবতা। বেদে তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁর মূর্তি হল সম্পূর্ণ বৈদিক ঋক্, সাম, যজুঃ এবং অথর্ব— এই চারটি বেদ ব্রহ্মার চারমুখ থেকে নিঃসৃত হয়। বেদবক্তা বলেই

তিনি চতুর্মুখ। তাঁর ডানদিকে হোমপাত্র এবং বাঁদিকে ঘিয়ের পাত্র। বেদজ্ঞ ঋষিরা তাঁর স্তুতি করেন। তাঁর বাঁদিকে থাকেন সাবিত্রী এবং ডানদিকে সরস্বতী। ব্রহ্মা হলেন সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টির শুরুতে তিনি একাই ছিলেন। তাঁর বহু হওয়ার বাসনা থেকে বিশ্বচরাচর সৃষ্টি হল। মৎসপুরাণে ব্রহ্মা আর নারায়ণকে অভিন্ন মনে করা হয়েছে। বেদে যিনি বিধাতা, তিনিই হলেন পুরাণের ব্রহ্মা। বেদে প্রজাপতি নামের এক ঋষির কথা আছে, সেখানেই সৃষ্টির কথা বর্ণিত রয়েছে। সেই দিক থেকে প্রজাপতি এবং ব্রহ্মার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। বায়ুপুরাণে ব্রহ্মা নামের একটা তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়। যিনি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সলিলাশ্রয়ে অবস্থানপূর্বক ভূতসমূহের বৃংহন অর্থাৎ, সৃষ্টি ও পুষ্টি বিধান করেন, তিনিই ব্রহ্মা।[৭৮] ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন বলে তিনি প্রজাপতি পদবাচ্য। পৌরাণিক ত্রিত্ববাদের অন্যতম দেবতা হলেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মা সৃজনের দেবতা। বিভিন্ন পুরাণে শিব ও বিষ্ণুর সঙ্গে ব্রহ্মার সংঘাতের কথা বলা হয়। বিষ্ণুর চক্র আর শিবের ত্রিশূলের মিলিত আঘাতে ব্রহ্মার কমণ্ডলু, স্রুব আর জপমালা তিষ্ঠোতে পারেনি। অহংকারের কারণে শিব পৃথিবীতে ব্রহ্মাপূজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন— শিবপুরাণ থেকে এমন কথা জানা যায়। ব্রহ্মার বাহন হল হাঁস। প্রজাপতি রূপে ব্রহ্মা প্রজননধর্মী। এ হল তাঁর রজোগুণের ক্রিয়া। বাস্তবজগতে হাঁসও অধিক প্রজনন শক্তি সম্পন্ন প্রাণী। চীন দেশের দেবতা ফন-কু-র সঙ্গে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। মিশরীয় সূর্যদেবতা রা-ও সূর্যরূপী ব্রহ্মার মতো সমস্ত বিশ্বভুবনের অধিকর্তা। আবার, 'হংস' শব্দের অর্থ হল সূর্য। সেইদিক থেকে ব্রহ্মা ও সূর্যের একটি যোগাযোগ লক্ষ করার মতো।[৭৯]

দুই

রবীন্দ্রসাহিত্যের দেবলোকে চতুর্মুখ ব্রহ্মাও স্থান পেয়েছিলেন। প্রথম জীবনে, 'প্রভাতসংগীত'-এর 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' কবিতায় পৌরাণিক ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্তা রূপটি খুঁজে পাওয়া যায়। এক অনন্ত শূন্যতার কেন্দ্রে বসে চতুমুর্খের ধ্যান, তাঁর চোখ মেলে চতুর্মুখ থেকে নিঃসৃত বাণী, উচ্ছ্বসিত বেদগান— পুরাণের ব্রহ্মাকেই মনে করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় স্রষ্টা ব্রহ্মাকে সম্বোধন করেছিলেন 'গীতিকবি'[৮০] বলে। জগৎসৃষ্টিতেই তাঁর আনন্দ। এই ব্রহ্মার জ্যোতির্ময় জটাজাল, মহান ললাটে 'অযুত তড়িৎ স্ফূর্তি' অবিরাম খেলা করে যায়। বররুচির লেখা একটি প্রাচীন শ্লোকের অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মাকে বলেছিলেন 'বিধাতা'। তিনি মানুষের ভাগ্য লেখেন—

চতুরানন পাপের ফল
যেমন খুশি তব
বিতর মোরে, সকলই আমি

যে করে হোক সব।
মিনতি শুধু অরসিকেরে
রসের নিবেদন
লিখো না ওগো লিখো না ভালে
লিখো না সে বেদন।[৮১]

'শেষসপ্তক'-এর একচল্লিশ সংখ্যক কবিতাটিতে তিনি ব্রহ্মাকে নামিয়ে এনেছিলেন গাম্ভীর্যের অমরাবতী থেকে। বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ নিজেও তখন গান বাঁধছেন, কবিতা লিখছেন। এই দিক থেকে তিনি নিজেকে বলেছিলেন 'সৃষ্টিকর্তা পিতামহের রহস্য সখা'।[৮২] এই কবিতায় ব্রহ্মার নতুন রূপ খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি নবীনদের কাছে বয়সের হিসেব দিতে ভুলে গিয়েছেন। তরুণদের উচ্ছৃঙ্খল হাসিতে তাঁর কৌতুকবোধ হয়। তরুণদের উদ্দাম নৃত্যে তিনি দ্রুততালের মৃদঙ্গ বাজান। এই কবিতায় ব্রহ্মা চপল। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পাঁচ রঙের তালি দেওয়া আলখাল্লা পরিয়ে বৈরাগী সাজিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ রাজশেখর বসুকে 'খাপছাড়া' উৎসর্গ করেছিলেন। সেই উৎসর্গপত্রে একটি ছড়া লেখা ছিল। সেখানে রাজশেখরের কঠিন কোমল ব্যক্তিত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে ব্রহ্মার চতুর্মুখের অভিনব প্রতীকী ব্যঞ্জনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে একটি মুখে তিনি দার্শনিক বাণী বর্ষণ করেন। একটিতে বেদ উচ্চারণ, অন্যটিতে রসে দ্রবীভূত কবিতা উচ্চারিত হয়। তারপর রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিত হয়ে বলেছিলেন—

নিশ্চিত জেনো তবে
একটাতে হো হো রবে
পাগলামি বেড়া ভেঙে উঠে উচ্ছ্বাসিয়া।[৮৩]

এই খ্যাপামির নিরিখে কবি নিজেকেও বলেছিলেন 'চতুর্মুখের চেলা।' সৃষ্টিতে যেমন ব্রহ্মার উৎসাহ, তেমনই অনাসৃষ্টিও তাঁর কাছে গুরুত্বহীন নয়। রবীন্দ্রনাথও এই তথাকথিত অনাসৃষ্টিকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছিলেন আজীবন। 'ছড়া'র ২ সংখ্যক কবিতাটিতে ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্মকে একটু হলেও কটাক্ষ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কদমাগঞ্জ উজার করে যে মাল আসছিল তা কালীদহে নৌকাডুবিতে তলিয়ে গেলে পাঁচমোহনের মাছেরা তা খেয়ে মিষ্টি হয়ে গেল। অনেকটা মিঠে গজার ছোটো ভাইয়ের মতো। তখনই কবি সংশয় প্রকাশ করেছিলেন—

বাগীশকে কাল শুধিয়েছিলেম
ব্রহ্মা কি কাজ ভুলল
বিধাতা কি শেষ বয়সে
ময়রা দোকান খুলল।[৮৪]

তিন

'গল্পগুচ্ছ'-এর একটি গল্প হল 'চিত্রকর'। এটি এক সৃজনশীল মা আর তাঁর চিত্রকর ছেলের গল্প।

বাবা বৈষয়িক মন নিয়ে শিল্পসাধনার বিপক্ষে। সেই কারণে বাবা যখন কাজে যেতেন, তখন মা ও ছেলে অবাধ আনন্দে আশ্চর্য সব জন্তুর ছবি আঁকতেন। 'যেসব জন্তুর মূর্তি হত বিধাতা এখনো তাদের সৃষ্টি করেননি।'[৮৫] কিন্তু এইসব সৃষ্টিকাজ রক্ষা করা কঠিন হত, কারণ বাবা ফিরে আসার আগে এদের চিহ্ন লোপ করতে হত। রবীন্দ্রনাথ কৌতুক মেশানো আক্ষেপের সঙ্গে বলেছেন, 'এই দুজনের সৃষ্টিলীলায় ব্রহ্মা এবং রুদ্রই ছিলেন। মাঝখানে বিষ্ণুর আগমন হল না।'[৮৬] ব্রহ্মা এখানে পৌরাণিক সৃজনের প্রতীক। 'লিপিকা'র 'ঘোড়া' কথিকাটিতে ব্রহ্মার কিছু বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। এইখানে পিতামহ ব্রহ্মা হলেন সৃষ্টিকর্তা। তিনি কাজ করেন নিজের উৎসাহে। সৃষ্টির কাজ যখন শেষ হয়ে এল, যখন ছুটির ঘন্টা বাজে বলে, তখন ব্রহ্মার মাথায় একটা ভাবোদয় হল। চতুর্মুখ তাঁর চার জোড়া গোঁফে তা দিলেন। মরুৎ আর ব্যোম ঠেসে ঘোড়া তৈরি করলেন। কিন্তু মানুষ সেই ঘোড়াকে অপদস্থ করল, ব্যবহার করল নিজের স্বার্থে। ব্রহ্মা দুঃখী হলেন এবং শেষে মানুষ তাঁকেও ঠকাবার চেষ্টা করল। এই কথিকাটিতে সৃষ্টিকর্তার এক দরদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়।[৮৭]

'সে'-র উৎসর্গপত্রে রবীন্দ্রনাথ দেবপিতামহের উল্লেখ করেছিলেন। সেখানে স্বর্গের কাজে অবহেলা দেখিয়ে ব্রহ্মা হাসেন—

দেবপিতামহ হাসে স্বর্গের কর্মের করি হেলা,
ইন্দ্রের প্রাঙ্গণতলে দেবতার অর্থহীন খেলা।[৮৮]

রবীন্দ্রনাথ অর্থহীন খেয়ালস্রোতে অনিয়মের রাজত্বে গা ভাসিয়ে দিতে চান বাউলের মতো। 'সে' লিখতে বসেই বলেছিলেন যে একঘেয়ে বিধানের সৃষ্টিকর্তা পিতামহকে এমন ক্ষেত্রে ঠাট্টা করে নেওয়া যাক যেখানে শাস্তির ভয় নেই। কারণ কবি সাহিত্যিকের রচনাক্ষেত্র আর যাইহোক ব্রহ্মার সৃষ্টির এলাকা নয়। 'সে' একবার বিয়ে করতে গিয়েছিল। তার বউদিদির ছোটো বোন থাকত চৌচাকলার উনকুণ্ড পাড়ায়। তার সঙ্গে কবিতার লড়াইয়ে তারই চেহারার প্রতি কটাক্ষ করে বলে বসে—

ব্রহ্মা লম্বা হাতে
তোমাকে গড়েছে রাতে
যবে শেষ হল আলোকবৃষ্টি।[৮৯]

'প্রজাপতি নির্বন্ধ' উপন্যাসে পূর্ণ, বিপিনের দল 'চিরকুমার সভা' প্রতিষ্ঠা করে। তাদের সভায় প্রজাপতির প্রবেশ নিষেধ। এখানে ব্রহ্মার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়ে যায়। যিনি সৃজনের জন্য নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করেছেন। অক্ষয় আবার নৃপবালার সঙ্গে রসিকতা করতে গিয়ে বলে, '...প্রজাপতি টার্গেট প্র্যাক্‌টিস করছিলেন, এ দুটো ফস্‌কে গেল।'[৯০] প্রজাপতির টার্গেট প্র্যাকটিস অভিনব রাবীন্দ্রিক কল্পনা।

চার

'সাহিত্য' গ্রন্থের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-এর কথা বললেন। তাঁদের দ্বন্দ্ব ও মিলনের কথাও। এই দৈবসংগ্রামে ব্রহ্মার পূজাগৃহ থেকে দূরে আশ্রয় নেওয়ার কাহিনির উল্লেখ করলেন প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ। কথাসরিৎসাগর অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মার অহংকার ও অন্যায় চাহিদার ইতিবৃত্ত, শিবের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করেছিলেন এই প্রবন্ধে। এক এক সময়ে এক এক দেবতার বড়ো হয়ে ওঠার উপাখ্যান, ব্রহ্মাকে দেববিদ্রোহী বৌদ্ধযুগে গ্রহণ করার গল্প এই প্রবন্ধটি থেকে জানা যায়। কথাসরিৎসাগরকে মান্যতা দিয়ে ব্রহ্মা ও শিবের দ্বৈরথে শিবকে গুরুত্ব দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এই প্রবন্ধে ব্রহ্মা এক অহংসর্বস্ব দেবতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন।[৯১]

'লোকসাহিত্যে'-এর ''ছেলেভুলানো ছড়া''য় ৩৭ সংখ্যক ছড়াটিতে ব্রহ্মার নৃত্যের উল্লেখ আছে।

> শিব নাচে, ব্রহ্মা নাচে, আর নাচে ইন্দ্র।
> গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়ে গোবিন্দ।[৯২]

দেবতারা প্রতিটি বিপন্ন মুহূর্তে ছুটে গিয়েছেন পিতামহ ব্রহ্মার কাছে— এটি হল পৌরাণিক সত্য। 'জাপানযাত্রী'র পৌষ ১৩৯৬-এর রচনাটিতে এডেন বন্দরের কলুষিত সমুদ্র দেখে রবীন্দ্রনাথ মনে মনে আহত হয়েছেন। সমস্যার সমাধানের সূত্রে তাঁর মনে হয়েছিল পিতামহ ব্রহ্মার কথা।

> একদিন ইন্দ্রলোক দানবের আক্রমণে পীড়িত হয়ে ব্রহ্মার কাছে নালিশ জানিয়েছিলেন— আজ মানবের অত্যাচার থেকে দেবতাদের কোন্ রুদ্র রক্ষা করবেন?[৯৩]

'শিক্ষা' প্রবন্ধে শিক্ষাব্যবস্থাকে কটাক্ষ করে বলেছিলেন যে, সকল দেশের শিক্ষা মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ভ্রম কাটিয়ে বেড়ে উঠেছে, কেবল আমাদের দেশেই

> বিদ্যা ব্রহ্মা বা শিবের প্রসাদে এক মুহূর্তে ঋষিদের ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া ভ্রমলেশ বিবর্জিত হইয়া অনন্তকালের উপযোগী আকারে বাহির হইয়া আসিতেছে।[৯৪]

এখানে ব্রহ্মা প্রথাগত, সনাতন রক্ষণশীলতার প্রতীক। 'কালান্তর'-এর 'চরকা' প্রবন্ধে মানুষকে যন্ত্র করে তোলার বিপক্ষে কথা বললেন। তাঁর মতে, সনাতন শাস্ত্র যাই বলুক না কেন, সৃষ্টির গোড়ায় ব্রহ্মা মানুষকে নিয়ে যে কাণ্ড করেছিলেন, এর সঙ্গে তার সম্পূর্ণই তফাত। মানুষের খোলের মধ্যে ঘূর্ণিচাকার মোটরকল না বসিয়ে মন বলে অত্যন্ত ছটফটে একটা পদার্থ ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই বালাইটাকে বিদায় করতে না পারলে মানুষকে কল করে তোলা দুঃসাধ্য।[৯৫] এখানে ব্রহ্মার কীর্তিকে মনে মনে সমর্থনই করলেন রবীন্দ্রনাথ।

পাঁচ

রবীন্দ্রনাথের নাটকে মুশকিল আসানের মতো এক বিশেষ প্রবীণচরিত্রের আনাগোনা দেখা যায়। যেমন, ঠাকুরদাদা, দাদাঠাকুর অথবা বাউল। 'শারদোৎসব' বা 'মুক্তধারা'র ঠাকুরদাদা যেন জগতে ঠাকুরদাদা হয়েই জন্মগ্রহণ করেছে। ঈশ্বর সকলের সঙ্গেই তাঁর হাসির সম্বন্ধ পাতিয়েছেন। লক্ষেশ্বরের অন্যায় কৃপণতার বিরুদ্ধে সরব যে শিশুর দল তাদের আশ্রয় এই ঠাকুরদা। যেমনটা দেবদানবের যুদ্ধে পিতামহ ব্রহ্মা। 'অচলায়তন'-এর দাদাঠাকুর—

> একলা কিন্তু হাজার মানুষ,
> হাসির দলে, চোখের জলে
> সকল ক্ষণে...।[৯৬]

পৌরাণিক ব্রহ্মা একলা ছিলেন, কিন্তু তাঁর থেকেই তো এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হল। 'ডাকঘর'-এর ঠাকুরদা বিপন্ন অমলকে ভরসা দেন। নিজেকে বলেন 'ফকির'। ছেলে খেপাবার সর্দার তিনি। 'ফাল্গুনী' নাটকের বাউলও চন্দ্রহাসকে পথ দেখায়, ভরসা দেয়। দেবলোকের বিপন্ন মুহূর্তে একমাত্র ভরসা কিন্তু পিতামহ ব্রহ্মা। যিনি সৃষ্টিকর্তা, কিন্তু মর্তে পূজা পান না সেইভাবে। পূজার্চনার বাইরে বলেই বুঝি রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিতে ঠাকুরদা, দাদাঠাকুর বা বাউলের ভূমিকায় স্বচ্ছন্দে মানিয়ে যায় তাঁকে। রবীন্দ্রকবিতায় এই দেবতাই তরুণদের উদ্দাম নৃত্যে দ্রুততালে মৃদঙ্গ বাজিয়েছিলেন। এই রাবীন্দ্রিক ব্রহ্মার একটি মুখের 'হো হো রবে' পাগলামি বাঁধ ভেঙে দিয়েছিল। কবিতায় ব্রহ্মার যে রাবীন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি আরোপ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তত্ত্বনাটকে ঠাকুরদাদাদের মতো প্রতীকী চরিত্রের আড়ালে সেই পিতামহ ব্রহ্মাকেই নিয়ে এলেন তিনি। যে দেবতা মানুষের পূজা নয়, ভালোবাসা পেয়েছেন। স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ প্রবীণ বয়সে নিজেকে অনায়াসে একাত্ম করেছেন সৃষ্টিশীল এই দেবকল্পনার সাথে।

বিষ্ণু

আর্যদের তিন জন প্রধান দেবতাদের মধ্যে একজন হলেন বিষ্ণু। বিষ্ণু হলেন পৃথিবীর পালনকর্তা। যদিও বিষ্ণু আপাতভাবে অনন্তশয্যায় থাকেন, তবু তিনিই যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতার পাঠিয়ে মধুকৈটভ বা হিরণ্যকশিপুরের মতো দৈত্যদের বিনাশ করেছেন। বৈকুণ্ঠ ধামে, দেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে এই দেবতার অধিষ্ঠান। বিষ্ণুর পুত্র হলেন কামদেব এবং বাহন গরুড়। এঁর শঙ্খের নাম পাঞ্চজন্য, চক্র সুদর্শন, গদা কৌমদকী, ধনু শাঙ্গ, অসি নন্দক এবং মণি হল কৌস্তভ। দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণু হলেন শ্রেষ্ঠ দেবতা। অন্য দেবতাদের বিপন্ন মুহূর্তে বিষ্ণু হলেন তাঁদের অন্যতম সহায়। প্রজাপতি কাশ্যপের

ঔরসে এবং অদিতির গর্ভে বিষ্ণুর জন্ম। পুরাণ অনুসারে বিষ্ণুর দুই স্ত্রী হলেন লক্ষ্মী এবং সরস্বতী। আবার বিষ্ণুর স্ত্রী বসুমতী— এমন লোকবিশ্বাসও আছে। পৃথিবীর কল্যাণের জন্য বিষ্ণু যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেন। পুরাণে বিষ্ণুর দশ অবতারের কথা লেখা আছে। যেমন মৎস, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি। ঋক্‌বেদের অনেক সূক্তে বিষ্ণুর স্তুতি করা হয়েছে। এই দেবতাই হলেন আমাদের রক্ষক দেবতা। প্রলয় সমুদ্রের ওপর ভাসমান অবস্থায় নারায়ণ হয়ে তিনি শেষনাগের ওপর শুয়ে আছেন। তাঁর নাভি থেকে জেগে ওঠা পদ্ম থেকে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। পৃথিবীর সৃষ্টির সময় মধু ও কৈটভ নামের দুই দানবকে হত্যা করে তাদের মেদ থেকে মেদিনী সৃষ্টি করেছিলেন। মহাভারত ও পুরাণে বিষ্ণু ও প্রজাপতি শ্রেষ্ঠ দেবতা। প্রজাপতি হিসেবে তাঁর তিনটি অবস্থার উল্লেখ আছে। প্রথমে সক্রিয় সৃষ্টিকর্তারূপে ব্রহ্মা, যিনি বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে উত্থিত হয়েছেন; দ্বিতীয় বিষ্ণু, স্বয়ং রক্ষক হিসেবে অবতার, তৃতীয় শিব বা রুদ্র, বিষ্ণুর কপাল থেকে সৃষ্ট ধ্বংসের দেবতা। এই বিষ্ণুই হলেন নারায়ণ।[৯৭]

দুই

বিষ্ণু রবীন্দ্রসাহিত্যের দেবলোকেও স্থান পেয়েছেন। 'প্রভাতসংগীত'-এর 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বেদ অনুসরণ করে জগৎ সৃষ্টির বর্ণনা দিয়েছিলেন। ব্রহ্মার সৃষ্টিতে ছন্দ এনে দিলেন বিষ্ণু। বিষ্ণু হাতে মঙ্গল শঙ্খ নিয়ে, মন্ত্র পাঠ করে একটি আশীর্বাদী ভূমিকায় আবির্ভূত হলেন। ঠিক তখনই 'জগৎ হইল পরিবার'।[৯৮] বিষ্ণুর পালন ক্ষমতার প্রকাশ ঘটেছে এই কবিতায়। আমরা এখানে জগৎ রচয়িতা বিষ্ণুকে খুঁজে পাই—

> বিষ্ণু আসি মহাকাশে, লেখনী ধরিয়া করে/মহান্ কালের পত্র খুলি/এ মনে পরম যতনে/ লিখি
> লিখি যুগ যুগান্তর/বাঁধি দিলা ছন্দের বাঁধনে।[৯৯]

রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণুকে বললেন 'জগতের মহাবেদব্যাস।' তাঁর জগৎসৃষ্টি মানে হল নিখিল উপন্যাস রচনা, মহাকাব্য সৃজন। একদিকে তিনি শাসনের গদা হাতে নিয়ম শৃঙ্খলা তৈরি করলেন, অন্যদিকে উচ্চারণ করলেন প্রেমের মহামন্ত্র। তাঁর জন্যই মহামন্ত্রে বাঁধা হল যুগ যুগান্তর। 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের কবিতা হল 'কবির প্রতি নিবেদন'। এই কবিতায় কবি নরনারায়ণের উল্লেখ করলেন। মানবের জয়গান প্রসঙ্গে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে।

> হোথা মানবের জয় উঠিছে জগৎময়
> ওইখানে মিলিয়াছে নরনারায়ণ।[১০০]

'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের ১০৮ সংখ্যক কবিতাটিতে কবি মানুষের নারায়ণকে নমস্কার করতে

বললেন। মানুষের অহংকার তাঁর মনের চোখকে খুলে দিতে পারে না। মনের চোখ ছাড়া নারায়ণকে দেখা যায় না। 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের ৬ সংখ্যক কবিতাটিতে ধরণীকে 'নারায়ণী' বলা হয়েছে। তন্ত্রগ্রন্থগুলিতে বিষ্ণুর দুই পাশে লক্ষ্মী ও পৃথিবী শোভা পায়। বিষ্ণুর স্ত্রী পৃথিবী এই মিথটিকে অনুসরণ করলে 'নারায়ণী এ ধরণী'[১০১] কথাটির তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়। 'শেষলেখা'র ১১ সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছিলেন 'রূপনারায়ণের কূলে/ জেগে উঠিলাম/ জানিলাম এ জগৎ/স্বপ্ন নয়।' এই 'রূপনারায়ণ' সৃষ্টির প্রথম লগ্নে অনন্ত শয্যাশায়ী নারায়ণের কথা মনে করিয়ে দেয়। যে দার্শনিক প্রেক্ষাপটে নারায়ণ ভাবনার জন্ম সেই দর্শনই এই কবিতায় কবি অনুভব করলেন— 'আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা এ জীবন।'[১০২]

তিন

রবীন্দ্রনাথের লেখা 'চিত্রকর' গল্পে সৃজনশীল সন্তান এবং তাঁর শিল্পী-মনের মা বৈষয়িক পরিবারের কর্তার অনুপস্থিতিতে অনায়াসে, অবাধ আনন্দে আশ্চর্য সব জন্তুর ছবি আঁকতেন। কিন্তু সেই সব সৃষ্টিকাজ রক্ষা করা যেতো না ছেলেটির কঠিন মনের বাবার জন্য। সেই কারণে, রবীন্দ্রনাথ কৌতুকভরা আক্ষেপের সঙ্গে লিখেছিলেন,

> এই দুজনের সৃষ্টিলীলায় ব্রহ্মা এবং রুদ্রই ছিলেন, মাঝখানে বিষ্ণুর আগমন সম্ভাবনা ছিল না।[১০৩]

আসলে বিষ্ণুর কাজ হল পালনের। এক্ষেত্রে সৃষ্টি রক্ষার সুযোগ ছিল না বলে বিষ্ণুর আগমন সম্ভাবনাও ছিল না।

চার

রবীন্দ্রনাথ 'কথাবার্তা' বইটিতে 'সৌন্দর্যের ধৈর্য' প্রবন্ধে সভ্যতার পেশি শক্তির কাছে নত হওয়ার প্রসঙ্গে বিষ্ণুর কথা বলেছিলেন। তিনি কল্পনা করেছিলেন যে সভ্যতা যখন বহুদূর অগ্রসর হবে তখন বর্বরেরা কেবলমাত্র শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতামাত্রের পূজা করবে না।

> তখন এই স্নেহপূর্ণ ধৈর্য, এই আত্মবিসর্জন, এই মধুর সৌন্দর্য, বিনা উপদ্রবে মনুষ্যহৃদয়ে আপন সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া লইবে। তখন বিষ্ণুদেবের গদার কাজ ফুরাইবে, পদ্ম ফুটিয়া উঠিবে।[১০৪]

বিষ্ণুদেবের গদা এখানে ক্ষমতা ও দম্ভের প্রতীক। শ্রীহীন সৃষ্টির রূপক। 'সাহিত্য' গ্রন্থের 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধেও একই ধরনের ভাবনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে মঙ্গলের সঙ্গেই সৌন্দর্যের বিষ্ণুর সঙ্গেই লক্ষ্মীর মিলনটি সম্পূর্ণ।[১০৫] সকল সভ্যতার মধ্যেই শ্রী ও সৃষ্টির সহাবস্থান এই বিশ্বাসটি অনুমান করা যায় রাবীন্দ্রিক বিষ্ণু কল্পনার

অন্তরালে। বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠপুরীর স্বর্গীয় সৌন্দর্যের কথাও এই প্রবন্ধে ইঙ্গিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—

> মদের বৈঠকে মাতাল জগৎসংসারকে ভুলিয়া গিয়া নিজেদের সভাকে বৈকুণ্ঠপুরী বলিয়া মনে করে, কিন্তু অপ্রমত্ত দর্শক চারিদিকের সংসারের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই তাহার বীভৎসতা বুঝিতে পারে।[১০৬]

'সঞ্চয়' বইটির 'ধর্মশিক্ষা' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন 'বিষ্ণুর বাহন মহাবিহঙ্গম' অর্থাৎ গরুড়ের কথা। 'জাপানযাত্রী'র ৩ সংখ্যক লেখাটিতে সমুদ্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে বিষ্ণুর উল্লেখ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রাগী মানুষ কথা বলতে না পারলে যেমন ফুলে ওঠে রবীন্দ্রনাথের চোখে সকাল বেলার মেঘগুলি ঠিক সেইরকম হয়েছিল। বাতাস এবং জলের চণ্ডীপাঠে, মেঘের জটাদুলোনো ভ্রুকুটিভঙ্গে অবশেষে মেঘের বাণী জলধারায় নেমে পড়ল। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে এল এক পৌরাণিক প্রসঙ্গ—

> নারদের বীণাধ্বনিতে বিষ্ণু গঙ্গাধারায় বিগলিত হয়েছিলেন একবার, আমার সেই পৌরাণিক কথা মনে এসেছিল। কিন্তু, এ কোন নারদ প্রলয়বীণা বাজাচ্ছে। এর সঙ্গে নন্দিভৃঙ্গীর যে মিল দেখি, আর ওদিকে বিষ্ণুর সঙ্গে রুদ্রের প্রভেদ ঘুচে গেছে।[১০৭]

বিষ্ণু এবং রুদ্র দুই দেবতার উল্লেখই সমুদ্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে এসেছে। কিন্তু বিষ্ণুর শান্ত পালক রূপ এবং রুদ্রের সংহার মূর্তিকে রবীন্দ্রনাথ যথাক্রমে শান্ত সমুদ্র এবং অশান্ত সমুদ্রের রূপ বোঝাতে ব্যবহার করেছিলেন। 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' বইতে ১৯২৪-এর ২৮ সেপ্টেম্বরের লেখাটিতে লিখেছিলেন মেয়েদের প্রেমের শক্তির কথা। সেই প্রসঙ্গেই বিষ্ণুর প্রকৃতি পালনের অন্তরালে তাঁর প্রেয়সী দেবী লক্ষ্মীর প্রেমের শক্তি অনুভব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'জাভাযাত্রীর পত্র'-এর ২ সংখ্যক লেখাটিতে বিষ্ণুর প্রসঙ্গ আবার এল। প্রদোষের ক্ষীণ আলোতে, গুহাগহ্বর থেকে বেরিয়ে আসা মানুষের জয়যাত্রার কথা বলতে গিয়ে গরুড়বাহন বিষ্ণুর উল্লেখ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

> দুই পায়ের উপর খাড়া দাঁড়ানো ছোটো ছোটো চটুল জীব লাফ দিয়ে চড়ে বসল মহাকায় বিপদবিভীষিকার পিঠের উপর, বিষ্ণু যেমন চড়েছেন গরুড়ের পিঠে।[১০৮]

যিনি বিষ্ণু, তিনিই হলেন নারায়ণ। এই নারায়ণ আবার রবীন্দ্রসাহিত্যে নরের তথা মানুষের দেবতা। 'জাভাযাত্রীর পত্র'-এর তিন সংখ্যক লেখাটিতেই রবীন্দ্রনাথ বেশ স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন,

> মানুষকে নারায়ণ সখা বলে তখনই সম্মান করেছেন যখন তাকে দেখিয়েছেন তাঁর উগ্ররূপ, তাকে দিয়ে যখন বলিয়েছেন: দৃষ্ট্বাদ্ভুতংরূপমুগ্রং তাবদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতঃ মহাত্মন্— মানুষ যখন প্রাণমন দিয়ে স্তব করতে পেরেছে—
>
> অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বঃ
> সর্বং সমাপ্নাবি ততোসহি সর্বঃ।
>
> তুমি অনন্তবীর্য, তুমিই অমিতবিক্রম, তুমিই সমস্তকে গ্রহণ করো, তুমিই সমস্ত।[১০৯]

'রাজাপ্রজা' বইটির 'সমস্যা' প্রবন্ধেও একই ধরনের কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

> যে পক্ষ অক্ষৌহিনী সেনাকেই গণনাগৌরবে বড়ো সত্য বলিয়া মনে করে তাহারা নারায়ণকেই অবজ্ঞাপূর্বক নিজের পক্ষে না লইয়া নিশ্চিন্ত থাকে। কিন্তু জয়লাভকেই যদি বাস্তবতার শেষ প্রমাণ বলিয়া মনে করে তাহারা নারায়ণকেই অবজ্ঞাপূর্বক নিজের পক্ষে না লইয়া নিশ্চিন্ত থাকে। কিন্তু জয়লাভকেই যদি বাস্তবতার শেষ প্রমাণ বলিয়া জানি, তবে নারায়ণ যতই একলা হোন এবং যতই ক্ষুদ্রমূর্তি ধরিয়া আসুন, তিনিই জিতাইয়া দিবেন।[১১০]

নারায়ণের অসীম শক্তির ওপর রবীন্দ্রনাথের ভরসা লক্ষ করা গেল। 'ছন্দ' বইটিতে 'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধে 'কেরাণী নারায়ণ'-এর কথা গভীর রসবোধের সঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।—

> ঐ যে গৃহলক্ষ্মীকে লক্ষ্মী বলা গেল এইটেই তো হল একটা কথার ইশারামাত্র, অথচ আপিসের বড়োবাবুকে তো আমাদের কেরাণী নারায়ণ বলার ইচ্ছাও হয় না, যদিও ধর্মতত্ত্বে বলে থাকে সকল নরের মধ্যেই নারায়ণের আবির্ভাব আছে।[১১১]

'শান্তিনিকেতন'-এর 'দশের ইচ্ছা' প্রবন্ধেও নারায়ণের স্তুতি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এখানে বলেছিলেন যে নারায়ণকে সারথী করলে যুদ্ধে জয় নিশ্চিত। The Religion of Man গ্রন্থে এ কথা সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে। বিষ্ণুর চক্রের কথা রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। যেমন, 'কালান্তর'-এর 'চরকা' প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধেই তিনি জানালেন যে বিষ্ণুর শক্তির যেমন একটা অংশ পদ্ম তেমনি আর একটা অংশ হল চক্র। চক্র সচলতার প্রতীক। কিন্তু চরকাকে কোনোভাবেই সমর্থন করলেন না রবীন্দ্রনাথ। দৃপ্তভাবে বললেন,

> সকল দৈবশক্তিই অসীম, এইজন্য চলনশীল চক্রের এখনো আমরা সীমায় এসে ঠেকিনি। এমন উপদেশ যদি মেনে বসি যে, সুতো কাটার পক্ষে আদিমকালের চরকাই শেষ তা হলে বিষ্ণুর পূর্ণ প্রসন্নতা কখনোই পাবো না, সুতরাং লক্ষ্মী বিমুখ হবেন। বিজ্ঞান মর্তলোকে এই অধিকার বাড়াচ্ছে এ কথা যদি ভুলি, তাহলে পৃথিবীর অন্য যেসব মানুষ চক্রীর সম্মান রেখেছে তাদের চক্রান্তে আমাদের মরতে হবে।[১১২]

'পরিচয়'-এর 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটু অন্য কথা বললেন। ভারতবর্ষের সামাজিক মিলন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে রূপ গ্রহণ করেছে— এমন কথা জানালেন। আরো একটি অভিনব মন্তব্য করলেন, 'ব্রহ্মায় আর্যসমাজের আরম্ভকাল, বিষ্ণুতে মধ্যাহ্নকাল এবং শিবে তাহার শেষ পরিণতির রূপ রহিল।'[১১৩] সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় তত্ত্ব এই প্রসঙ্গে আবার মনে পড়ে যেতে পারে।

বিষ্ণুর চক্রকে বস্তুজগতে মানুষের 'বিজয়রথের বাহন' বলেছিলেন 'পথে ও পথের প্রান্তে' গ্রন্থের ৪০ অধ্যায়ে। বিষ্ণুর প্রেমের শক্তির প্রকাশ ঘটেছে দেবী লক্ষ্মীর শ্রীমণ্ডিত রূপের মধ্য দিয়ে। রাবীন্দ্রিক বিষ্ণু গদাধর, অর্থাৎ শক্তির প্রতীক, শঙ্খ বাজিয়ে নতুন যুগের সূচনা করেন, এই চক্রধারী বিষ্ণু সচলতার প্রতীক। আবার তিনিই নারায়ণ। পৌরাণিক নারায়ণকে অতিক্রম করে এক মহামানবের কল্পনায় তিনি হয়ে ওঠেন নরনারায়ণ।

শিব

শিব হলেন ত্রিমূর্তির অন্যতম দেবতা। শিবের অন্য রূপ হল রুদ্র। রুদ্র ধ্বংসের দেবতা। তাঁর জটাজুট অগ্নিশলাকার মতো, তাঁর নৃত্যের নাম তাণ্ডব। তাতে পৃথিবী কেঁপে ওঠে এবং গ্রহরা কক্ষচ্যুত হয়ে আকাশপথে ছুটতে থাকে। রুদ্র শুধু ধ্বংসের দেবতা নন— তিনি উগ্র, হিংস্র ও পশুর মতো। তাঁর হাতে বজ্র ও ধনুর্বাণ। তাঁর দেহের বর্ণ পিঙ্গল। রুদ্রের ভয়ঙ্কর মূর্তির অন্যদিকে ঋষিরা কল্পনা করেছিলেন শিবের শান্ত সমাহিত মূর্তির। ঋষিরা যে রুদ্রের কাছে প্রার্থনা করেছেন সন্তান সন্ততি ও পশুদের কল্যাণ— তিনিই শিব। এই দেবতাই মহাকাল। তার ত্রিনয়নের জন্য তাঁর নাম হল ত্রিলোচন। বিষপান করেছিলেন বলে তিনি নীলকণ্ঠ। ত্রিপুর ধ্বংসের সময় শিব দেবতাদের অর্ধতেজ গ্রহণ করেছিলেন সেই কারণে তাঁর শক্তি অন্য দেবতাদের থেকে বেশি। সেই সময় থেকে তিনি মহাদেব নামে পরিচিত। রুদ্র রূপে তিনি সংহারক। কিন্তু এই সংহার থেকেই আবার তাঁর অভ্যুদয় হয়েছিল। সেই জন্য শিব বা শঙ্কর নামে তিনি জননশক্তি। সৃষ্টির রক্ষক হিসেবে তাঁর প্রতীক চিহ্ন হল লিঙ্গ। তিনি সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর, যজ্ঞ রাক্ষস, অপ্সরা, গন্ধর্ব এবং প্রমথগণ পরিবেষ্টিত হয়ে হিমালয়ে তপস্যা করেন। নিজে যোগী, কিন্তু কুবের এই দেবতার ধনরক্ষক। পার্বতী এই দেবতার স্ত্রী। জটাজুটধারী এই দেবতা নৃত্যকলার উদ্ভাবক। তাই তিনি নটরাজ। মদনভস্মের ঘটনা অথবা বিষপানের ঘটনা শিবের রুদ্রতেজের সাক্ষ্য বহন করে। ব্রহ্মার সঙ্গে দ্বন্দ্ব, গঙ্গাকে জটায় ধারণ, বিপন্ন মুহূর্তে দেবতাদের সহায়তাদান ইত্যাদি পৌরাণিক ঘটনার সঙ্গে শিবের নাম জড়িয়ে আছে। মানুষের নিত্য মঙ্গলকামনা করে বিবিধ কর্মের দ্বারা তাদের উন্নত করেন বলে তিনি শিব।[১১৪]

দুই

'প্রকৃতির খেদ' কবিতায় কিশোর রবীন্দ্রনাথের কলমে প্রলয়দেবতা রুদ্রের উল্লেখ রয়েছে। এখানে রুদ্র প্রলয় ঝড়ের মতো গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ করেন। 'প্রভাতসঙ্গীত'-এর 'মহাস্বপ্ন' কবিতায় নিদ্রামগ্ন মহাদেবের স্বপ্নের কল্পনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'আধেক প্রলয় জলে ডুবে আছে তোমার হৃদয়'[১১৫]— এমন কথা বলার পর রবীন্দ্রনাথ যে কথাটি লিখলেন সেইটি অভিনব— 'বলো দেব কবে হেন প্রলয়ের হইবে প্রলয়'।[১১৬] 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' কবিতায় প্রচলিত মিথ মেনে রুদ্র ধ্বংসের, প্রলয়ের দেবতা। 'ছবি ও গান' কাব্যগ্রন্থের 'যোগী' কবিতায় শিবের তথাকথিত যোগী মূর্তি। 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের 'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতায় জড়প্রকৃতির 'তীক্ষ্ণ শ্বেত রুদ্র হাসি'র প্রসঙ্গ উঠে এল। 'কথা' কাব্যগ্রন্থের

'প্রতিনিধি' কবিতায় শিবের প্রতি কোমল অনুযোগ প্রকাশ করতে দেখা গেল কবিকথককে।—

হে ভবেশ, হে শংকর, সবারে দিয়েছ ঘর,
আমারে দিয়েছ শুধু পথ
অন্নপূর্ণা মা আমার লয়েছে বিশ্বের ভার
সুখে আছে সর্ব চরাচর—
মোরে তুমি হে ভিখারি মার কাছ হতে কাড়ি
করেছ আপন অনুচর।[১১৭]

এই কাব্যগ্রন্থের 'বিচারক' কবিতায় যুদ্ধের ভয়াবহতা বোঝানোর জন্য ভৈরবের উল্লেখ করা হয়েছে—

মারাঠা নগরী কাঁপিল গরবে
রহিয়া রহিয়া প্রলয় আরবে
বাজে ভৈরব ডঙ্ক।[১১৮]

'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের 'মদনভস্মের পূর্বে' এবং 'মদনভস্মের পর' কবিতায় শিবের তৃতীয় নয়নে মদন ভস্ম হবার ঘটনার ইঙ্গিত আছে। শিব এখানে কঠোর সন্ন্যাসী। তাঁর প্রতি কবির এতটুকু পক্ষপাত লক্ষ করা গেল না—

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একী সন্ন্যাসী
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।[১১৯]

'বৈশাখ' কবিতায় বৈশাখের শুষ্ক, কঠিন রূপের সঙ্গে রুদ্রের কঠিন মূর্তিকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রুদ্রের ধূলায় ধূসর পিঙ্গল জটাজাল, তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, ভয়াল বিষাণের ডাক মনে ত্রাস জাগায়। সেই ডাকে 'দগ্ধ তাম্র কোন্ দিগন্তের ছিদ্র হতে' ছায়ামূর্তির মতো অনুচরেরা ছুটে আসে। কবি বৈশাখের এই রুদ্রমূর্তি দেখে নিস্তব্ধ ও নির্বাক হয়ে যান। 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের ৬৩ সংখ্যক কবিতায় পতিত ভারতকে জাগাবার জন্য 'মহেশ'-এর প্রতীক্ষা করছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ৬৫ সংখ্যক কবিতায় কবি নিশ্চিত হয়ে লিখেছিলেন—

...বীভৎস আহার
বীভৎস ক্ষুধারে করে নির্দয় নিলাজ
তখন গর্জিয়া নামে তব রুদ্র বাজ।[১২০]

'উৎসর্গ' কাব্যগ্রন্থের ২৮ সংখ্যক কবিতায় শিবের তিন রকম মূর্তির কল্পনা রয়েছে। প্রথমত, 'অভেদাঙ্গ হরগৌরী', দ্বিতীয়ত, 'ধ্যানাসনে নিত্যকাল স্তব্ধ পশুপতি' তৃতীয়ত, তাঁর 'মহান-দরিদ্র, রিক্ত আভরণহীন দিগম্বর' মূর্তি।[১২১] ৪৭ সংখ্যক কবিতায় শিবের বিবাহযাত্রার ছবি রয়েছে। শ্মশানচারী শিবের জন্য গৌরীর প্রতীক্ষা এক বাস্তব ছবি তৈরি করেছে।

যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তাঁর কতমতো ছিল আয়োজন
ছিল কতশত উপকরণ।
তাঁর লটপট করে বাঘছাল

তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে
তাঁর বেষ্টন করি জটাজাল
যত ভুজঙ্গদল তরজে।
তাঁর ববম্‌ববম্‌ বাজে গাল
দোলে গলার কপালাভরণ,
তাঁর বিষাণে ফুকারি উঠে তান
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।[১২২]

'বলাকা'র ২ সংখ্যক কবিতায় রুদ্রকে 'সর্বনেশে' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ৩ সংখ্যক কবিতায় রুদ্রের আহ্বানের কথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তূর্য বাজিয়ে রুদ্রের আহ্বান, মাথার ওপরে জ্বলতে থাকা মধ্যদিনের সূর্য নতুন বিদ্রোহের ইঙ্গিত দেয়। এই কবিতায় শিবের আরেকটি নাম ঈশানের উল্লেখ আছে। ১১ সংখ্যক কবিতায় রুদ্রের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করেন। কিন্তু সে মার্জনা গর্জমান বজ্রাগ্নিশিখার মতো, সূর্যাস্তের প্রলয়শিখার মতো, অকস্মাৎ সংঘাতের মতো সাহসী মানুষদের জীবনে এসে পড়ে। রুদ্র নতুনের শুভ সূচনা করে। সেই কারণে ৪৫ সংখ্যক কবিতাটিতে পুরাতন রাত্রির অবসানে রুদ্রের ভূমিকাকে নত হয়ে মেনে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'রুদ্রের ভৈরব গান'-এ নতুনের আগমনের ইঙ্গিত রয়ে যায়। 'পলাতকা' কাব্যগ্রন্থের 'ভোলা' কবিতাটিতে বিজুর মৃত্যুতে কবিকথক লিখেছিলেন—

হঠাৎ আমার হল মনে
শিবের জটার গঙ্গা যেন শুকিয়ে গেল অকারণে।[১২৩]

'ভোলা' শব্দটির মধ্যে শিশু ভোলানাথের ইঙ্গিত রয়ে যায়। 'আসল' কবিতাটিতে মহেশ ছিল পাড়ার পাগল। তার সঙ্গে শিবের আর্কেটাইপকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। চার বছরের সুর্মিকে কাঁধে তুলে নিয়েছিল মহেশ। কবি তার বর্ণনা করেছিলেন এইভাবে—

ভোলানাথের জটায় যেন ধুতরো ফুলের কুঁড়ি।[১২৪]

'শিশুভোলানাথ' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতাটিতে রুদ্রের এক অভিনব কল্পনা লক্ষ করা যায়। রুদ্রের তাণ্ডবও কবির চোখে শিশুভোলানাথের খেলা। দুই হাত তুলে এই শিশুদেবতা যেখানে পদপাত করেন সেখানেই 'বিষম তাণ্ডবে' সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। 'লজ্জাহীন, সজ্জাহীন, বিত্তহীন, আপনা বিস্মৃত'[১২৫] এক নতুন রুদ্রের কল্পনা করেছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ। এই কাব্যগ্রন্থের অন্য কবিতাগুলিতে কোনো তথাকথিত দেবপ্রসঙ্গ নেই। কিন্তু শিশু ভোলানাথের আপনভোলা ভাব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কবিতার ছেলেমানুষ চরিত্রগুলির মধ্যে। 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থে 'উজ্জীবন' কবিতায় মদন ও রুদ্রের দ্বৈরথে সন্ন্যাসী রুদ্র পরাজিত হয়েছিলেন। 'বিজয়ী' কবিতায় গঙ্গা ও শিবের পৌরাণিক রূপকল্প ব্যবহার করা হয়েছে।

'শেষসপ্তক' কাব্যগ্রন্থের সাত সংখ্যক কবিতায় মহাকালের প্রসঙ্গ আছে। ৩২ সংখ্যক কবিতায় কথার টানে চলে এল শিবের বিয়ের রাতের কথা—

ঘরের প্রাঙ্গনে আবার শাঁখ উঠল বেজে,
জাগল হুলুধ্বনি;
দলবল নিয়ে রোখো দাঁড়াল সভায়
শিবের বিয়ের রাতে ভূতপ্রেতের দল যেন।
উলঙ্গপ্রায় দেহ সবার, তেলমাখা সর্বাঙ্গ
মুখে ভুষোর কালি।[১২৬]

'মৃত্যুঞ্জয়ী' কবিতা 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। এই কবিতায় রুদ্র এবং মদনের পৌরাণিক মিথ ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে রুদ্রের বৈদিক, ভয়ঙ্কর মূর্তি লক্ষ করা যায়। রুদ্রের দক্ষিণ হাতের শেল বজ্র টেনে আনে। মৃত্যুর আঘাতে মানুষের জীবনকে ক্ষতবিক্ষত করে চলেন এই দেবতা। এই কাব্যগ্রন্থের 'ধাবমান' কবিতাতেও রুদ্র প্রসঙ্গ লক্ষ করা যায়। 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের 'প্রণাম' কবিতায় নটরাজের তাণ্ডব নৃত্যের বর্ণনা রয়েছে।

চেতনাসিন্ধুর ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মৃদঙ্গগর্জনে
নটরাজ করেন নৃত্য, উন্মুখর অট্টহাস্যমনে।[১২৭]

আবার, মৃত্যুর সঙ্গে তিনি মিলিয়ে দিয়েছিলেন অতল অশ্রুর লীলা।

অতল অশ্রুর লীলা মিলে গিয়ে কলকলরোলে
উঠিতেছে রণি-রণি, ছায়ারৌদ্র যে দোলায় দোলে
অশ্রান্ত উল্লোসে।[১২৮]

এই কাব্যগ্রন্থের 'জন্মদিন' কবিতায় মহাদেবের তপস্বী মূর্তির বর্ণনা রয়েছে—

উগ্র তব তাপের আসন,
সেথায় তোমারে সম্ভাষণ
করেছিনু দিনে দিনে কঠিন স্তবনে
কখনো মধ্যাহ্নরৌদ্রে কখনো বা ঝঞ্ঝার পানে।[১২৯]

এই কাব্যগ্রন্থের 'পান্থ' কবিতাটিতে ইঙ্গিতে নটরাজের প্রসঙ্গ এসেছে—

চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে
চঞ্চলের নৃত্যে আর চঞ্চলের গানে
চঞ্চলের সর্বভোলা দানে—
আঁধারের আলোকে,
সৃজনের পর্বে পর্বে, প্রলয়ের পলকে পলকে।[১৩০]

'বনবাণী' কাব্যগ্রন্থের 'নারিকেল' কবিতাতে দক্ষিণ সাগর থেকে আসা তাণ্ডবনৃত্য এবং রুদ্র ডমরুর উল্লেখ রুদ্রের প্রসঙ্গ মনে করিয়ে দেয়। 'হাসির পাথেয়' কবিতায় হিমালয়ের গিরিপথের বর্ণনা দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ এইভাবে—

...ধূর্জটির তাণ্ডবের ডম্বরুর তালে
যেন গিরি-পিছে গিরি উঠিছে নামিছে বারেবারে...[১৩১]

'সেঁজুতি' কাব্যগ্রন্থের 'পত্রোত্তর' কবিতায় প্রবল ঝড়ের মধ্যেও 'চিরদিবসের শান্ত শিবের বাণী'র কথা বলে কবি কবিতার মধ্যে শিবের আশুতোষ মূর্তি এঁকে ফেললেন। 'অমর্ত্য' কবিতায় আছে নৃত্যপাগল

নটরাজের উল্লেখ—

চিরদিনের আলোক জ্বালা নীল আকাশের নীচে
যাত্রা আমার নৃত্যপাগল নটরাজের পিছে।[১৩২]

'জন্মদিন' কবিতায় যে 'মহাশিশুর আদিম খেলাঘর'-এর কথা আছে, সেই মহাশিশুই হলেন শিশু ভোলানাথ। 'প্রতীক্ষা' কবিতায় অসীম আকাশে মহাতপস্বী মহাকালের জেগে থাকার কথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থের 'রাজপুতানা' কবিতায় শিব হয়েছেন শঙ্কর—

শঙ্করের তৃতীয় নয়ন হতে
সম্মান নিলে না কেন যুগান্তের বহ্নি আলোতে।[১৩৩]

'পক্ষীমানব' কবিতায় রুদ্র হলেন ধ্বংসের দেবতা—

রুদ্রের বাণী দিক দাঁড়ি টানি
প্রলয়ের রোষানলে।[১৩৪]

'ক্যাণ্ডীয় নাচ' কবিতায় মহাদেবের তাণ্ডবনৃত্যের বর্ণনা রয়েছে। নটরাজ এমন পুরুষ যাঁর সাধন হল তাণ্ডব। তিনি— 'দুঃখবেগে জাগিয়ে তোলেন সকল ভয়ের ভয়।'[১৩৫] রবীন্দ্রনাথ তাই যেকোনো জয়ের নৃত্যে নটরাজকেই জিতিয়ে দিলেন। 'সানাই' কাব্যগ্রন্থের 'বিপ্লব' কবিতাতেও নটরাজের ডমরু ধ্বনিতে, তাণ্ডবের তালে জেগে ওঠা নৃত্যপাগল মনের বর্ণনা আছে। 'ভাঙন' কবিতায় রুদ্রের 'নিঠুর চরণ'-এর উল্লেখ রয়েছে। কবি তাঁকে বুকের গোপন বেদনার সঙ্গে জড়িয়ে নিলেন। 'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের ৯ সংখ্যক কবিতায় কবি নিজের শিল্পী মনের সঙ্গে নটরাজকে একাকার করে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। জীবনের শেষপর্বে তাঁর জীবনের একাকিত্ব নটরাজের 'একাকী' বেদনার সঙ্গে মিলে গিয়েছে।—

দেখিলাম, যুগে যুগে নটনটী বহু শত শত
ফেলে গেছে নানারঙা বেশ তাহাদের
রঙ্গশালা-দ্বারের বাহিরে।
দেখিলাম চাহি
শত শত নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্য প্রাঙ্গণে
নটরাজ নিস্তব্ধ একাকী।[১৩৬]

'জন্মদিনে'র ৯ সংখ্যক কবিতায় মহাকালের কালো ও সাদা দুই রূপের কথা বলা হয়েছে। আলো ও ছায়ার মতো। জীবনের প্রবাহ এবং মহাকালের রূপবদল একাকার হয়ে যায়।—

কভু দূরে কখনো নিকটে
প্রবাহের পটে
মহাকাল দুই রূপ ধরে
পরে পরে
কালো আর সাদা।
কেবলি দক্ষিণে বামে প্রকাশ ও প্রকাশের বাধা
অধরার প্রতিবিম্ব গতিভঙ্গে যায় এঁকে এঁকে

গতিভঙ্গে যায় ঢেকে ঢেকে।[১৩৭]

পূজা পর্যায়ের ৭১ সংখ্যক গানে শিবের উল্লেখ আছে। এই গানে কবি লিখেছিলেন—

তোমার জটে আমি তোমারি ভাবের জাহ্নবী,[১৩৮]

'জটা', 'জাহ্নবী' এবং 'তাপস' শিবের কথা মনে করিয়ে দেয়। ৯০ সংখ্যক গানে রুদ্রকে স্মরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই রুদ্র 'সঙ্কট', 'ক্ষতি' এবং 'আনন্দ'। রুদ্রকে এই গানে বন্ধুর মর্যাদা দিলেন রবীন্দ্রনাথ।

বজ্র এসো বক্ষ চিরে, তুমিই আমার বন্ধু।[১৩৯]

৯৫ সংখ্যক গানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণা ধারায় এসো।[১৪০]

এই গানে রবীন্দ্রনাথ রুদ্রকে অভিনব বিশেষণে, বিশেষিত করেছিলেন। রুদ্র, এখানে 'জীবননাথ' এবং 'উদারনাথ'। রুদ্র কবিকে অন্ধকার হতে আলোয় নিয়ে আসেন। ১০২ সংখ্যক গানে রুদ্র কবিকে বজ্রবেদনায় জাগিয়ে তোলেন। রুদ্রকে কবি 'চিরদিবসের রাজা' বলে সম্বোধন করেছিলেন। ১২৫ সংখ্যক গানে 'দেবদেব'-এর উল্লেখ আছে। তিনি 'সর্বলোকপরশরণ', 'সকল মোহকলুষহরণ'। তিনিই সত্য ও প্রেমরূপ। আমাদের অনুমান, এই 'দেবদেব' হলেন দেবাদিদেব মহাদেব। ২০৬ সংখ্যক গানটিতে রুদ্রের এক অভিনব মূর্তি খুঁজে পাওয়া যায়।

'অগ্নিবাণে তূণ যে ভরা, চরণভারে কাঁপে ধরা'[১৪১] এই রুদ্রের খোঁজ পাওয়া যায় 'মরণ মহোৎসবে।' ২১১ সংখ্যক গানে রুদ্রের এক স্পষ্ট মূর্তি খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর এক হাতে কৃপাণ, ধ্বংসলীলার ইঙ্গিতবাহী। এই দেবতা ছিনিয়ে নিতে পছন্দ করে। তাঁর পথ হল মরণের পথ। রুদ্রের ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য সবসময়ই কবির কাছে আরাধ্য। তাঁর চোখে রাত্রি রাঙা নয়ন মেলে রুদ্রদেবের দীপ্তালোকে। তাঁর জন্যই সাজানো থাকে রক্তশতদলের সাজি। রুদ্র এখানে 'প্রলয়'। ২১৪ সংখ্যক গানে রুদ্রের সঙ্গে কবির পুরানো সম্পর্কের উল্লেখ আছে। আঘাতের দিনে, ঝড়ের রাতে কবি রুদ্রের হাতে হাল ছেড়ে দেন। তিনি বুঝতে পারেন যে রুদ্রের সঙ্গে মিলে যাবার উপায় হল সব হারিয়ে রিক্ত হওয়া। ২১৫ সংখ্যক গানে লিখেছিলেন বেদনা, নিষ্ঠুরতা—সব রুদ্রের ভালোবাসারই অভিব্যক্তি। ২১৭ সংখ্যক গানে রুদ্রের প্রতি কবির ভীতি লক্ষ করা যায়। এই রুদ্রের তূণেও থাকে অগ্নিবাণ। ২১৮ সংখ্যক গানে রুদ্র হল 'ব্যথা পথের পথিক'। ২২১ সংখ্যক গানে রুদ্রকে 'ভীষণ' বলে সম্বোধন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই গানে রাবীন্দ্রিক রুদ্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায়—

কঠিন করে চরণ পরে প্রণত করো মন[১৪২]

২২৩ সংখ্যক গানে রুদ্রের বাঁশি বেজে ওঠে 'বজ্রে'। রুদ্র আরাম হতে ছিন্ন করে সুমহান শান্তির পথ দেখায়। ২২৪, ২২৫ সংখ্যক গানগুলিতে রুদ্র নিষ্ঠুর, কঠিন। ২২৬ সংখ্যক গানটি রুদ্রের আগমনের

এক পটভূমি তৈরি করে। প্রচণ্ড গর্জন, দুর্দিন, দারুণ ঘনঘটা, দামিনী-ভুজঙ্গ ক্ষত যামিনী, আকাশের অশ্রুবর্ষণ ইত্যাদি শব্দগুচ্ছগুলি প্রলয়ের প্রতীক। রুদ্র এখানে 'মৃত্যুঞ্জয় রূপে ভয়হরণ'। ২২৮ এবং ২৩০ সংখ্যক গানে দুঃখবেশী রুদ্রকে চিনে নেওয়া যায়। ২৩৩ সংখ্যক গানে জটাজুটধারী রুদ্রের এক ভয়ঙ্কর মূর্তি খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ২৩৪ সংখ্যক গানে রবীন্দ্রনাথ রুদ্রকে চিহ্নিত করেছিলেন 'ত্যাগী' হিসেবে—

তব দীপ্ত রৌদ্র তেজে নির্ঝরিয়া গলিবে যে
প্রস্তরশৃঙ্খলোন্মুক্ত ত্যাগের প্রবাহ।[১৪৩]

২৩৫ সংখ্যক গানটিতে রুদ্রের প্রেমের স্বরূপ বোঝা যায়—

তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নাইকো অবহেলা।[১৪৪]

২৩৬ সংখ্যক গানে রুদ্র এলেন 'মহাভিক্ষু'র বেশে। ২৩৭ সংখ্যক গানটি হল— 'পিনাকেতে লাগে টঙ্কার...।' রুদ্রের ভয়ানক তেজস্বী মূর্তি আঁকা হয়ে থাকে গানটিতে। ২৮২ সংখ্যক গানে মহাদেবের যোগী মূর্তির উল্লেখ আছে—

কোন্ মহাপুরুষ জাগে মহাযোগাসনে।[১৪৫]

৩৪০ ও ৩৪১ সংখ্যক গানে আবার আসে রুদ্রের প্রসঙ্গ। দ্বিতীয় গানটিতে রুদ্র 'ভিখারি' ও 'পথিক' বিশেষণে বিশেষিত হয়। ৩৫৪ সংখ্যক গানেও রুদ্র প্রসঙ্গ আছে। এই রুদ্র অন্ধকারের উৎস থেকে আলোর মতো উজ্জ্বল। ৩৭৩ সংখ্যক গানেও প্রভাতসূর্য আসে রুদ্র সাজে। ৩৭৬ সংখ্যক গানে রবীন্দ্রনাথ রুদ্রের জয়জয়কার করেছিলেন। ৫৩৫ সংখ্যক গানে এবং ৫৫৪ সংখ্যক গানে বৈদিক রুদ্রের স্পষ্ট মূর্তি ধরা পড়ে। ৫৭৫ সংখ্যক গানে আসে শিশু ভোলানাথের কথা।

আমাদের খেপিয়ে বেড়ায় যে কোথায় লুকিয়ে থাকেরে[১৪৬]

৫৭৮ সংখ্যক গানে রুদ্র হলেন 'মুক্তি পাগল বৈরাগী'। ৫৮৯ সংখ্যক গানে শিশু ভোলানাথের খেলার সাথী হতে চাইছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ৬১৬ সংখ্যক গানে যাত্রাবেলায় রুদ্রের উপস্থিতি বন্ধনডোর ছিন্ন করবে— এমন মত প্রকাশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রকৃতি পর্যায়ের ২২ সংখ্যক গানে খুঁজে পাওয়া যায় শুষ্ক, কঠোর রূপের রুদ্রকে। তাঁর পিঙ্গল জটা ও বহ্নিদৃষ্টির রূপকে গ্রীষ্ম আত্মপ্রকাশ করে।

তিন

'গুপ্তধন' গল্পে মৃত্যুঞ্জয় তান্ত্রিক মতে তাদের বহুকালের গৃহদেবতা জয়কালীর পূজায় বসত। মৃত্যুঞ্জয় হল শিবের আরেক নাম। মৃত্যুঞ্জয় গুপ্তধন খুঁজতে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তার আগে শংকর নামের এক পূর্বপুরুষও এর আগে গুপ্তধন খুঁজতে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। লক্ষ করার মতো শংকর ও মৃত্যুঞ্জয় নাম দুটি। মৃত্যুঞ্জয় শেষ পর্যন্ত উন্মুক্ত নীলাম্বরের, তৃণপত্রের গন্ধবাসিত বাতাসের মধ্যে মুক্তি

ও শান্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। ভোগী থেকে ত্যাগী হওয়ার যে যাত্রা, সেখানে সর্বত্যাগী শিবের নাম ব্যবহার করা অত্যন্ত সার্থক হয়েছে। 'গিন্নি' গল্পে ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের 'দুই তিন শ্রেণী নীচের পণ্ডিত শিবনাথ'।[১৪৭] নামটি দেবসমাজে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু বিদ্যালয়ে তাঁর রুদ্রতেজের যে ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন তার গুরুত্বও নেহাত কম নয়। তিনি তাঁর নাম সম্পর্কে কতটা সচেতন ছিলেন জানা নেই।

> কিন্তু নিজের উপেক্ষিত দেবমহিমা বালকদের মস্তকে সবেগে নিক্ষেপ করিতেন; এবং মাঝে মাঝে হুংকার দিয়া উঠিতেন,[১৪৮]

এই তেজ রুদ্রতেজের সমতুল্য সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর হুংকারের মধ্যে ইতর কথার মিশেল সেই বজ্রনাদের মহিমা ক্ষুণ্ণ করত। এইখানে রবীন্দ্রনাথ মিথকে ভেঙে দিয়েছিলেন। 'রাজটীকা' গল্পে নবেন্দুর সাহেব-ভজনা অনেকটা মহাদেবকে তুষ্ট করার সাধনার পর্যায়ে পৌঁছিয়ে গিয়েছিল। সাহেবের পেয়াদারা তাঁর কাছে 'রুষ্ট মহেশ্বরের ভূতপ্রেতগণ'।[১৪৯] ক্রোধ এবং মহাদেবের মধ্যে এই অভিনব সম্পর্ক স্থাপন রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন এই গল্পে। 'তিনসঙ্গী'র 'রবিবার' গল্পে কথার প্রসঙ্গে বিভাকে বলেছিলেন—

> সেকালের বুড়োশিব চোখ বুজে বসেছেন ধ্যানে, একালের নন্দীভৃঙ্গী আয়না হাতে নিয়ে নিজেদের চেহারাকে ব্যঙ্গ করছে— যাকে বলে debunking। জন্মেছি একালে, বোম্‌ভোলানাথের চেলা হয়ে কপালে চোখ তুলে বসে থাকতে পারব না; নন্দীভৃঙ্গীর বিদঘুটে মুখভঙ্গির নকল করতে পারলে আজকের দিনে নাম হবে।[১৫০]

'ল্যাবরেটরি' গল্পেও বোমভোলানাথের 'ভোঁ' হয়ে বসে থাকার কথা অর্থাৎ, নেশাগ্রস্ত ভাবের ইঙ্গিত আছে। ভোলানাথ যে সংসারী নন সে কথাও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। 'লিপিকা'র 'বাঁশি' কথিকাটিতে বাঁশির চিরদিনের বাণীর সঙ্গে 'শিবের জটা থেকে গঙ্গার ধারা'র তুলনা টেনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

> বাঁশির বাণী চিরদিনের বাণী—শিবের জটা থেকে গঙ্গার ধারা, প্রতিদিন মাটির বুক বেয়ে চলেছে;[১৫১]

'গোরা' উপন্যাসে সুচরিতার চোখে 'গোরা' যেন 'শুভ্রকায় মহাদেব'। বৌদ্ধপুরাণে শুভ্রকায় মহাদেবের অস্তিত্ব আছে। গোরার ব্যক্তিত্বর প্রতি ইঙ্গিত করেই রবীন্দ্রনাথ এই 'শুভ্রকায় মহাদেব'[১৫২]-এর কল্পনা করেছিলেন। 'প্রজাপতি নির্বন্ধ' উপন্যাসে ভূতনাথ ভবানীপতির অনুচরগুলোর ওপর সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। যেহেতু উপন্যাসটির মূল উপজীব্য ছিল বিবাহ, সেই কারণে ভূতনাথের মূল পরিচয় এখানে 'ভবানীপতি'।[১৫৩] 'শেষের কবিতা'র 'ঘটকালি' নামের পরিচ্ছেদে এল ভিখারি শিবের প্রসঙ্গ। অমিত-এর মতে অন্নপূর্ণার পূর্ণতা প্রকাশ করতে হবে বলেই শিব নিজেকে 'ভিখারি কবুল করেন, একটুও লজ্জা নেই।'[১৫৪] 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে এক একটি চরিত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে শিব এক এক রূপে প্রকাশিত হয়েছে। বিমলা শিবের থেকে অন্নপূর্ণাকে মহিমান্বিত করে দেখেছে। ভিখারি শিবের রুদ্রতেজ অন্নপূর্ণা তপস্যার জোরে সহ্য করতে পেরেছিলেন— এই হল বিমলার অভিমত।

নিখিলেশের কাছে এই একই মত বিনম্র শোভা পেল—

> অন্নপূর্ণা, তোমাদের হৃদয়ের দ্বারে
> আমাদের ভিক্ষা কোনোদিন ঘুচবে না।[১৫৫]

নিখিলেশের চোখে শিব প্রেমিক পুরুষও বটে। তিনি হরপার্বতীর মিলনের কল্পনা করেছিলেন কৈলাসে মানস সরোবরের পদ্মবনে। সন্দীপ নিজেকে নীলকণ্ঠ মহাদেব হিসেবে কল্পনা করেছিল। বিমলার প্রতি আসক্তির কারণে সে বিমলাকে 'মোহিনী' সম্বোধন করেছিল। মোহিনীর হাতের বিষপাত্র থেকে বিষপান করে সে বিষে জর্জর হয়ে হয় মৃত্যুবরণ করবে না হয় মৃত্যুঞ্জয় হবে। এই উপন্যাসে শিব প্রলয়ের দেবতা। তাঁকে আনন্দময় বলা হয়েছে। কারণ, তিনি বন্ধনমোচন করেন। 'মালঞ্চ' উপন্যাসে 'বিশ্বব্যাপী ছেলেমানুষ' এবং এক 'বিরাট পাগল'-এর কথা বলা আছে। সন্দেহ নেই, বিশেষণগুলি শিবের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

> এমন সম্পূর্ণ সৃষ্টিটাকে এতবড় নিরর্থক ভাবে উলটপালট করে দিতে পারলে কে?[১৫৬]

আমাদের মনে পড়ে যেতে পারে 'শিশু ভোলানাথ'-এর আর্কেটাইপ। 'দুইবোন' উপন্যাসে এসেছিল অন্নপূর্ণা ও ভিখারি শিবের প্রসঙ্গ। বিশেষ প্রয়োজনে শশাঙ্ক ভিখারি শিবের মতো 'ঘরের অন্নপূর্ণা'র কাছে ভিক্ষা চাইতেন। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে কুমুকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল সতীর রূপকল্প। ফলে, কুমুর মনের ইচ্ছার মধ্যে, পতির ধ্যানের মধ্যে সেই মহাতপস্বী রজতগিরিনিভ শিবকেই দেখেছে।[১৫৭] সেই মহাতপস্বী তপস্বিনী উমার পরম তপস্যার ধন। কিন্তু উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ স্বপ্ন আর বাস্তবের ফারাক দেখিয়েছিলেন। মধুসূদনের সঙ্গে তপস্বী শিবের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া গেল না। খুব আশ্চর্যজনক ভাবেই তপস্বী শিবের উপমান প্রযুক্ত হল কুমুর দাদা বিপ্রদাসের ওপর।

> কিন্তু কুমু এসে দেখলে তার দাদার সেই আবেশটা কেটে গিয়েছে। তার চোখে যে আগুন জ্বলেছে সে যেন মহাদেবের তৃতীয় নেত্রের আগুনের মতো। নিজের কোনো বেদনার জন্যে নয়— সে তার দৃষ্টির সামনে বিশ্বের কোনো পাপকে দেখতে পাচ্ছে, তাকে দগ্ধ করা চাই।[১৫৮]

রুদ্রের শুদ্ধ রূপ কুমুদিনীর চোখে বিপ্রদাসের মধ্যেই প্রতিফলিত হল।

'চার অধ্যায়' উপন্যাসে মহাদেব ও দশভুজার এক আশ্চর্য সম্পর্কের অবতারণা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথ অলকানন্দা তেলের ব্যবসা প্রসঙ্গে এই দেবদেবীকে ব্যবহার করেছিলেন—

> ইতিমধ্যে অলকানন্দা তৈল পাঁচ পিপে তৈরি করে রেখেছি। মহাদেবের জটা নিঙড়ে বের করা। একটা সার্টিফিকেট দিয়ো বৎসে, বোলো, অলকা তেল মাখার পর থেকে চুল বাঁধা একটা আপদ হয়েছে, দীর্ঘায়মানা বেণী সামলে তোলা স্বয়ং দশভুজা দৈবীর দুঃসাধ্য।[১৫৯]

চার

'লোকসাহিত্য' বইটির 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধে হরগৌরী বিষয়ক গ্রাম্যসাহিত্যগুলি নিয়ে আলোচনা

করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শিব এখানে 'অযোগ্য পাত্র'। এতটাই মানবিক ভঙ্গিতে শিব পার্বতীকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল যে কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সামনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং তার শিখররাজি আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি। 'সাহিত্য' বইটির 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধে শিবের অভ্যুত্থান ও আধিপত্যের ইতিবৃত্ত আলোচনা করা হয়েছিল। 'আর্যদেবসমাজে এই অদ্ভুতচারী দেবতা বলপূর্বক প্রবেশ করিলেন বটে কিন্তু ইহাকে অনেক জবাবদিহি করিতে হইয়াছিল।'[১৬০] দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস কেবল কাল্পনিক কথা নয় বলেই রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন। শিবের সেবক এবং আর্যদেব-পূজকদের প্রচণ্ড বিরোধের পরিণামে বৈদিক যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল এবং সেই 'শোণিতাক্ত অপবিত্র যজ্ঞবেদীর উপরে নবাগত দেবতার প্রাধান্য বলপূর্বক স্থাপিত হয়।'[১৬১] এই বইয়েরই 'সাহিত্য পরিষৎ' প্রবন্ধে রুদ্রদেবের কথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রুদ্রদেবের কাছে মানুষের দুর্নীতির সব হিসেব রাখা থাকে।

> রুদ্রদেব বজ্র হাতে আমাদের অনেক কালের পাপের হিসাব লইতে আসিয়াছেন; খবরের কাগজে মিথ্যা লিখিতে পারি, সভাস্থলে মিথ্যা বলিতে পারি, রাজার চোখে ধুলা দিতে পারি, এমন-কি নিজেকে ফাঁকি দেওয়াও সহজ; কিন্তু তাঁহাকে তো ভুল বুঝাইতে পারিলাম না।[১৬২]

'সাহিত্যের পথে' বইটির 'কবির কৈফিয়ত' প্রবন্ধে নীলকণ্ঠ মহাদেবের উল্লেখ রয়েছে। তিনি লিখেছিলেন যে যথার্থ আনন্দ সমস্ত দুঃখকে শিবের বিষপানের মতো সমস্তটা আত্মসাৎ করতে পারে। 'সমূহ' বইটির 'প্রসঙ্গ কথা-১'-এ কলকাতায় প্লেগ দেখা দেওয়ার সূত্রে শংকর এবং তাঁর ভূতপ্রেতের প্রবল প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছিলেন। ভারত গবর্মেন্টের মেজাজের সঙ্গে রুদ্রের তেজকে অনায়াসে মিলিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

> প্লেগ অপেক্ষা প্লেগ রেগুলেশন বেশি রুদ্রমূর্তি ধারণ করিয়া উঠিবে।[১৬৩]

'সমাজ' বইটির 'বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য' প্রবন্ধে সুইডেনবাসী এক সজ্জন সাহেবের কথা বলতে গিয়ে মহাযোগী মহেশ্বরের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এই উল্লেখ অনুসারে এই দেবতা সর্বজাতির প্রতি অপক্ষপাতী। 'কালান্তর'-এর 'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধে রুদ্রের প্রলয় রূপের কথা আছে। 'শক্তিপূজা' প্রবন্ধে শিবের দুই ধরনের রূপের কথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শাস্ত্রিক ও লৌকিক। শাস্ত্রিক শিব যোগী, বৈরাগী। লৌকিক শিব উন্মত্ত, উচ্ছৃঙ্খল। 'বাতায়নিকের পত্র'-এ 'মহাকালের রথযাত্রা'-র উল্লেখ পাওয়া গেল। সেই রথের লক্ষ লক্ষ অগ্নিচক্র। ধুলোহীন, শব্দহীন, চিহ্নহীন সেই রথের সঙ্গে বাঁধা হয়ে বিশ্বের সমস্ত চলা অহরহ চলেছে। এই 'মহাকালের রথ' রবীন্দ্রনাথের অভিনব ভাবনারই প্রকাশ। 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'র ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫-এর লেখাটিতে হর ও পার্বতীর মিলনকে ত্যাগ বা বৈরাগ্যের সঙ্গে অনুরাগের সমন্বয় হিসেবে দেখেছিলেন

রবীন্দ্রনাথ। ১৫ ফেব্রুয়ারির লেখাটিতে শিবের এলোমেলো ব্যক্তিত্বকে 'বিশিষ্ট' বিশেষণ দিয়ে সাজিয়ে তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'জাভাযাত্রীর পত্র'-এ ১৪ সংখ্যক পত্রটিতে 'উত্তানশায়ী শিবের বুকের উপরে মহামায়ার নাচ'-এর কথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৬ সংখ্যক পত্রটিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে শিবের নানারকম নাট্যমুদ্রা জাভার মূর্তিগুলিতে খুঁজে পাওয়া যায়। শিব এখানে 'গুরু' অথবা 'মহাগুরু'। এখানকার শিব 'নটরাজ', তাঁরই নাচের ছন্দে সংসারপ্রবাহ এগিয়ে চলে। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশে শিবভাবনার দুই রকম প্রকাশ লক্ষ করেছিলেন। একদিকে তিনি অনন্ত এবং নিষ্ক্রিয়, অন্যদিকে তাঁরই মধ্যে কালের ধারা এবং পরিবর্তন পরম্পরা এগিয়ে চলেছে। 'পথে ও পথের প্রান্তে' বইটির ৪৭ সংখ্যক অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ অন্যরকম কথা লিখেছিলেন—

> দরিদ্র শিবের আনন্দ নাচে। প্রতিদিনের দৈন্যটাই যদি একান্ত সত্য হত তাহলে এই নাচটা আমাদের একেবারেই ভালো লাগত না, এটাকে পাগলামি বলতুম। কিন্তু ছন্দের এই সুসম্পূর্ণ রূপলীলাটি যখন দেখি তখন মন বলতে থাকে এই জিনিসটি অত্যন্ত সত্য, তার ছন্দ ভাঙে না, সে অম্লান, সে অপরূপ।[১৬৪]

'পঞ্চভূত' বইটির 'অপূর্ব রামায়ণ' প্রবন্ধে খুব সুন্দর অভিব্যক্তি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি লিখেছিলেন যে আমাদের সর্বোচ্চ মঙ্গলের আদর্শ হল মৃত্যুনিকেতন। কারণ, 'আমাদের শিব শ্মশানবাসী'।[১৬৫] 'পঞ্চভূত'-এর মধ্যে ব্যোম এই উক্তিটি করেছিলেন। ব্যোম দার্শনিক স্বভাবের। ফলে, তাঁর বক্তব্য শিব সম্পর্কে রাবীন্দ্রিক দর্শনকে ধরে রাখে। 'সহজ পাঠ' বইতে সপ্তমপাঠে শৈল প্রসঙ্গের পরেই কথার টানে আসে 'কৈলাস' নামটি। অর্থাৎ গিরিবালা এবং কৈলাসবাসী মহেশ্বরের সম্পর্কটি রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল। 'সহজপাঠ'-এর দ্বিতীয় পাঠে আদ্যানাথ ও শ্যামা নাম দুটির ব্যবহারও পৌরাণিক গার্হস্থ্য মহাদেবের কথা মনে করিয়ে দেয়। 'ধর্ম' বইটির 'একটি রূপক' প্রবন্ধে শিবকে আনন্দের প্রতীক হিসেবে কল্পনা করেছিলেন। কারণ, অসীম অন্ধকার, কণ্ঠে পরিপূর্ণ বিষ, অঙ্গের ভূষণ সাপ, শ্মশানভূমি, বক্ষের ওপর বিচরণকারী কালী— কোনো কিছুই তার আনন্দের বিরাম ঘটাতে পারেনি। শিবকে বাইরে থেকে দেখে আপাত দুঃখী মনে হলেও তাঁর জটাজালের মধ্যে প্রচ্ছন্ন গঙ্গার স্রোতের মতো তাঁর অন্তরে আনন্দের ধারা বহমান। শিব রুদ্র নামে আর্যসমাজে প্রবেশ করলেও তাঁর মধ্যে আর্য ও অনার্য দুইটি মূর্তিই স্বতন্ত্র ছিল। আর্যের দিক থেকে তিনি যোগীশ্বর, কামকে ভস্ম করে নির্বাণের আনন্দে পরিপূর্ণ। অনার্যের দিকে তিনি বীভৎস রক্তাক্ত গজাজিনধারী, ভাঙ ও ধুতুরায় উন্মত্ত। 'খৃস্টধর্ম'-এর 'খৃস্ট' প্রবন্ধটিতে শিবকে 'বড়ো' অর্থাৎ 'উদার' বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

> মানুষের সেই বড়োর সঙ্গে মানুষের ছোটোর নিয়ত সংঘাতে যে দুঃখ জন্মাচ্ছে সেই দুঃখ পান করছেন কে? সেই বড়ো, সেই শিব।[১৬৬]

'বিশ্বভারতী'-র ৩ সংখ্যক প্রবন্ধে ভিখারি শিবের কল্যাণরূপী মূর্তির উল্লেখ করেছিলেন। বিশ্বভারতীকে

তিনি সমস্ত মানবের তপস্যার ক্ষেত্র মনে করেছিলেন। সেখানে কল্যাণরূপী শিব তাঁর ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়েছেন। সমস্ত মানুষের কাছে মেলে ধরেছেন সেই ভিক্ষার ঝুলি। 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর 'পাগল' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে পাগল শব্দটা আমাদের কাছে ঘৃণার শব্দ নয়। 'আমাদের খ্যাপা-দেবতা মহেশ্বর।'[১৬৭] এই দেবতা সকল দেবতার মধ্যে খাপছাড়া। এই 'পাগল দিগম্বর'-এর ডমরু বাজে মধ্যাহ্নের হৃদ্‌পিণ্ডের মধ্যে। এই উলঙ্গ শুভমূর্তি কর্মনিরত সংসারের মাঝখানে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের মতে— সুন্দর শান্ত ছবি। এই রুদ্র মঙ্গলময়। তাঁর ললাটের ধ্বক্ ধ্বক্ অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গ মাত্রেই অন্ধকারে গৃহের প্রদীপ জ্বলে ওঠে।

> সেই শিখাতেই লোকালয়ে সহস্রের হা হা ধ্বনিতে নিশীথ রাত্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। রুদ্র তাঁর কাছে 'পাগল'। এই পাগল কেন্দ্রাতিগ, তিনি কেবলই নিখিলের নিয়মকে বাইরের দিকে টানেন।[১৬৮]

'শান্তিনিকেতন'-এর 'আত্মবোধ' প্রবন্ধে রুদ্রকে বলেছিলেন 'চিরদিনের পরম দুঃখ', 'চিরজীবনের বিচ্ছেদবেদনা'। এই রুদ্র নিত্য দুঃখ এবং নিত্য বিচ্ছেদ হতে পরিত্রাণ করে যায়। 'ধর্ম' গ্রন্থের 'ততঃ কিম' প্রবন্ধে শিব ও শক্তির মিলনকে নিবৃত্তির ও প্রবৃত্তির সম্মিলন বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের কাছে শিব হলেন শুভ ও মঙ্গল।

পাঁচ

তথাকথিত 'আর্যামি'র প্রতি ব্যঙ্গ করে রবীন্দ্রনাথ 'ব্যঙ্গকৌতুক'-এর অন্তর্গত 'সারবান সাহিত্য' লিখেছিলেন। হরপার্বতীকে নিয়ে কৈলাস পর্বতের পটভূমিকাতে লেখা এই নাটকটি। এখানে হর ও পার্বতীর মধ্যে আধুনিকতা লক্ষ করা যায়। মহাদেব স্ট্যাম্প, টাকা, দলিল বিষয়ে এত মন্তব্য করেছিলেন যে তাঁর সর্বত্যাগী যোগী মূর্তিটিই পাঠকের কাছে অবাস্তব বলে মনে হতে পারে। 'স্বর্গীয় প্রহসন'-এ ইন্দ্রসভার পটভূমিতে আর্য ও অনার্য দেবতাদের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছিল। বৃহস্পতির কথার টানে মহাদেবের অনার্য আচরণ উঠে আসে। মহাযোগী মহেশ্বর 'গঞ্জিকা-ধুস্তর-সিদ্ধি-পানে উন্মত্ত হইয়া' মহাদেবীর সঙ্গে অশ্রাব্য ভাষায় কলহ করে নীচ জাতীয় স্ত্রী-পল্লীর মধ্যে নিজের বিহারক্ষেত্র বিস্তার করেছিলেন। 'চিরকুমারসভা' নাটকে অক্ষয় ও পুরবালার মধুর দাম্পত্য কলহের সূত্রে চলে আসে কালী ও ভোলানাথের প্রসঙ্গ। অক্ষয় পুরবালাকে 'কালী' বলে ব্যঙ্গ করতে চাইলে পুরবালাও মহাদেবের নন্দিভৃঙ্গীর কথা বলে। পাঠকের মনে ভূতপ্রেত পরিবেষ্টিত মহাদেবের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে মহাদেবের আনন্দিত মূর্তি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ।—

> যে আনন্দে মহাদেব করেন বিরাজ

পেয়েছি পেয়েছি সেই আনন্দ আভাস।[১৬৯]

'সতী' কাব্যনাট্যে অমাবাই রুদ্রকেই 'ধর্মরাজ' বলে সম্বোধন করেছিলেন। ক্ষুদ্র শত্রুর উৎপাতের ওপর দেবদেবের বজ্রাঘাত প্রার্থনা করছিলেন অমাবাই। কারণ রুদ্রই মানুষকে ক্ষুদ্র ধর্ম থেকে বার করে নিত্যধর্মে যুক্ত করে। 'মুক্তধারা' নাটকে ভৈরবপন্থীদের মহাদেব স্তুতিতে মহাদেব 'তিমির হৃদ্‌বিদারণ'। কিন্তু ভৈরবপন্থীরা নিজেদের মনের অন্ধকারের কারণে তারা রুদ্রের প্রকৃত স্বরূপ দেখতে পায়নি। রণজিৎ যখন সাধারণ মানুষদের হয়ে বিপ্লবের বিরুদ্ধ নেতৃত্ব দেয় তখন রণজিৎ বলে—

যিনি উত্তরকূটের পুরদেবতা আমাদের জয়ে তাঁরই জয়।[১৭০]

অথচ বিশ্বজিৎ স্পষ্ট বলে যে বিশ্বের সকল তৃষিতের জন্য দেবদেব কমণ্ডলু থেকে জলধারা ঢেলে দিচ্ছেন। 'রুদ্রচণ্ড' নাটকে রুদ্রচণ্ড চরিত্রের মধ্যে উগ্র রুদ্রমূর্তির প্রভাব আছে। পরে এই চরিত্রটিই ভুল বুঝে সন্ন্যাসীবেশে শ্মশানে শ্মশানে ভ্রমণ করতে চায়। আমরা বলতে পারি, রবীন্দ্র নাটকে শিবের যোগী মূর্তির পাশাপাশি রুদ্রমূর্তিও খুঁজে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রসাহিত্যে শিবের আর্য ও অনার্য দুটি রূপই খুঁজে পাওয়া যায়। শিব রবীন্দ্রসাহিত্যের দেবলোকে কখনো তপস্যায় মগ্ন থাকেন। কখনো রুদ্রতেজে ভস্ম করে দেন কন্দর্পের কোমল শরীর। নটরাজ রূপে কখনো ছড়িয়ে দেন নৃত্যছন্দ। আবার, শিশু ভোলানাথ হয়ে বিরাট বিশ্ব নিয়ে শুরু করেন খেলা। লৌকিক রূপে তিনিই নেশাগ্রস্ত হয়ে অন্ত্যজ আচরণ করেন। আবার তিনিই কঠিন আঘাতে ক্ষুদ্রকে মিলিয়ে দেন বৃহতের সঙ্গে। আসলে, রবীন্দ্রসাহিত্যের দেবলোকে শিব এক মঙ্গলময় দার্শনিক উপলব্ধি হয়ে প্রকাশিত হয়েছেন। যার প্রভাবে লৌকিক শিবের মহিমা অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে।

বিশ্বকর্মা

বিশ্বকর্মা হলেন দেবশিল্পী। একদিকে তিনি মহান কারিগর, অন্যদিকে তিনিই বর্মধারী মহযোদ্ধা। বিশ্বকর্মা এই বিশ্বযজ্ঞে নিজেকেই নিজে আহুতি দিয়েছেন। তিনি এই বিশ্বের পালনকর্তা। এই পৃথিবী তাঁর কর্ম, তাই তিনি বিশ্বকর্মা। বৈদিক মতে তিনি সর্বজ্ঞ। পুরাণে তাঁর ভূমিকা দেবশিল্পীর। তিনি হাজার রকম কাজের অধিকর্তা। বিভিন্ন পুরাণে তাঁর পিতা হলেন অষ্টবসুর অন্যতম প্রভাস এবং মা হলেন বৃহস্পতির বোন বরবর্ণিনী। আবার, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে ব্রহ্মার নাভিদেশ থেকে বিশ্বকর্মার জন্ম হয়। বেদে বিশ্বকর্মাকে অজাত পুরুষ বা সনাতন পুরুষ হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। পৌরাণিক বিশ্বকর্মার শিল্পনৈপুণ্য তুলনাহীন। বিমান, অলঙ্কার, দেবতাদের পোশাক— সবই হল বিশ্বকর্মার সৃষ্টি। অগস্ত্যের ভবন, কুবেরের অলকাপুরী, রাবণের স্বর্ণলঙ্কা, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা— বিশ্বকর্মার বাস্তুবিদ্যা ও নগর

পরিকল্পনার সুচারু প্রকাশ। সুন্দ-উপসুন্দকে হত্যা করেন তিলোত্তমা। এই আশ্চর্য সুন্দর নারীও বিশ্বকর্মার সৃষ্টি। বিশ্বকর্মার বাহন হাতি।[১৭১] শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বিশ্বকর্মার কর্মক্ষেত্র শুধু প্রাসাদ নির্মাণ, রাজধানী নির্মাণ বা দেবতাদের অস্ত্রনির্মাণেই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর কর্মক্ষেত্র বাহ্যলোক থেকে প্রসারিত মানুষের অন্তরলোকেও, তিনি হৃদয়েরও অধিপতি।[১৭২]

দুই

রবীন্দ্রনাথও তাঁর কথার তুলি দিয়ে এই কর্মী দেবতার ছবি এঁকেছেন। 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থের 'আমি' কবিতায় মানুষের অহংকারপটে 'বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প'কে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন তিনি। আত্মচেতনার রঙে যেখানে পান্না সবুজ আর গোলাপ সুন্দর হয়ে ওঠে সেই আত্মসচেতন অহংবোধ নতুন সৃষ্টি করে। যেমন ভাবে বিশ্ব সৃষ্টি করেন দেবকারিগর বিশ্বকর্মা। রবীন্দ্রনাথ তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, পুলকিত মনে বিশ্ব আমির রচনার আসরে বিশ্বস্রষ্টাকে অনুসরণ করেছিলেন তখন তাঁর হাতে তুলি, পাত্র ভরা রঙ।[১৭৩] 'পলাতকা'র 'ছিন্নপত্র' কবিতাটির চরিত্রের কর্মব্যস্ততার সূত্রে বিশ্বকর্মার উল্লেখ করেছিলেন।[১৭৪] বিশ্বকর্মা এখানে স্রষ্টা। 'শুভদৃষ্টি' গল্পের মূক ও বধির মেয়েটির সৌন্দর্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

> মেয়েটির সৌন্দর্য নিরতিশয় নবীন, যেন বিশ্বকর্মা তাহাকে সদ্য নির্মাণ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।[১৭৫]

আমাদের মনে পড়ে যেতে পারে পৌরাণিক বিশ্বকর্মার ভাস্কর্যের কথা। সুন্দ-উপসুন্দকে বধ করেছেন যে নারী, সেই তিলোত্তমার সৌন্দর্যের স্রষ্টা বিশ্বকর্মা গল্পের মধ্যে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেন।

তিন

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলিতেও বিশ্বকর্মার উল্লেখ রয়েছে। প্রবন্ধগুলিতে বিচিত্র ও বিবিধ মানসিকতার প্রকাশের মুহূর্তে এই দেবতাকে ব্যবহার করলেন প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ। প্রথমেই আমাদের চোখে পড়ে একাগ্র স্রষ্টা বিশ্বকর্মাকে। এই বিশ্বকর্মা আমাদের মনের গহনে বসে, আড়াল থেকে জাগতিক সব সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করেন। 'পঞ্চভূত'-এর 'গদ্য ও পদ্য' প্রবন্ধে সমীর যাঁর কথা বলেছিলেন। আমাদের মনের মধ্যের বিশ্বকর্মা, যিনি আমাদের অন্তরের নিভৃত সৃজনকক্ষে বসে নানা গঠন, নানা বিন্যাস, নানা প্রয়াস, নানা প্রকাশচেষ্টায় সর্বদা নিযুক্ত আছেন।[১৭৬] 'সাহিত্যের স্বরূপ' বইটির 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজের সৃষ্টিসত্তার সঙ্গে বিশ্বকর্মাকে একাত্ম করে দেখাতে চেয়েছিলেন। তিনি যখন বাংলাদেশের নদী বেয়ে, তার প্রাণের লীলা অনুভব করেছিলেন, তখন তাঁর

অন্তরাত্মা সেই সকল সুখ-দুঃখকে নিজের অন্তরে সংগ্রহ করে রেখেছিল। এর আগে তা আর কেউ করেননি। এর কারণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ বলেন,

> কারণ সৃষ্টিকর্তা তাঁর রচনাশালায় একলা কাজ করেন। সে বিশ্বকর্মারই মতন আপনাকে দিয়ে রচনা করেন।[১৭৭]

'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধমালার মাঘ, ১৩৯৮-তে লেখা প্রবন্ধটিতেও এই স্রষ্টা বিশ্বকর্মার কথাই বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যিনি 'মহাত্মা', বড়ো প্রচ্ছন্ন হয়ে জনগণের হৃদয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়েই কাজ করেন। তাঁর কাজ ক্রমেই এগিয়ে চলেছে। আমরা তা জানি না বলেই কাজে আনন্দের অভাব আছে। সেই বিশ্বকর্মার কাজে আমাদের যেটুকু যোগ দেবার আছে, তা দিইনি বলেই আমাদের জীবন তাৎপর্যহীন হয়ে রয়েছে। কিন্তু তবু বিশ্বকর্মার স্বাভাবিক জ্ঞান, বল, ক্রিয়া প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তেই কাজ করছে। তিনি আমাদের জীবনের একটি সূর্যকরোজ্জ্বল দিনকে চন্দ্রতারাখচিত রাত্রির সঙ্গে গাঁথছেন। আবার সেই জ্যোতিষ্কপুঞ্জখচিত রাত্রিকে জ্যোতির্ময় আর একটি দিনের সঙ্গে গেঁথে চলেছেন।[১৭৮] স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বকর্মার কাজে যোগ দিতে চেয়েছেন।—

> আমি যদি তাঁর সঙ্গে যোগ দিতুম তবে সেই আনন্দ আমারও হত। এই আশ্চর্য শিল্পরচনায় কত ছিদ্র করতে হচ্ছে, কত বিদ্ধ করতে হচ্ছে, কত দগ্ধ করতে হচ্ছে, কত আঘাত করতে হচ্ছে— এই সমস্ত আঘাতের মধ্যেই বিশ্বকর্মার সৃজনের আনন্দে আমার অধিকার জন্মাত।[১৭৯]

রবীন্দ্রনাথ মানুষের অন্তরের গুহায় অবিরল কাজ করে যাওয়া এক 'আনন্দিত বিশ্বকর্মা'র[১৮০] কথা বলেছিলেন। এই বিশ্বকর্মা মনের চৈতন্যের আকাশকে অরুণরাগে প্লাবিত করে দেন। মনের জমিতে সোনার সুতো, রূপার সুতো, রঙ-বেরঙের সুতো দিয়ে অহরহ একটা আশ্চর্য বুনানি বুনছেন। সার্বিক প্রক্রিয়াটিই ঘটছে মানুষের অন্তরলোকে।[১৮১]

রবীন্দ্রনাথ এই স্রষ্টার সঙ্গে মিল রেখে, তাঁর কাজে তাল মিলিয়ে চলতে বললেন। 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'তে রাণুকে লিখছিলেন একই কথা।—

> বিশ্বকর্মার কাজে আমরা যখন যোগ দিই তখন যে পরিমানে তার সঙ্গে মিল রেখে, ছন্দ রেখে চলি সেই পরিমানে আমাদের কাজ অক্ষয়কীর্তি হয়ে ওঠে, যে পরিমাণে বাধা দিই সেই পরিমাণে আমরা প্রলয়কে ডেকে আনি।[১৮২]

এই প্রলয় থেকে বাঁচার জন্য প্রতিদিনের 'আমি-তুমি'র ছন্দ মিলিয়ে চলার কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কারণ, সেই ছন্দেই 'মানুষের সৃষ্টি মানুষের ইতিহাস অমরতা লাভ করে।'[১৮৩]

রবীন্দ্রনাথের চোখে বিশ্বকর্মা আবার মানুষ গড়ার কারিগরও বটে। 'চারিত্রপূজা' প্রবন্ধ গ্রন্থের 'বিদ্যাসাগর চরিত' প্রবন্ধটিতে মজা করেই বললেন বিধাতার নিয়মের আশ্চর্য ব্যতিক্রমের কথা।

> বিশ্বকর্মা যেখানে চারকোটি বাঙালি নির্মাণ করিতেছিলেন সেখানে হঠাৎ দু-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন।[১৮৪]

একটু অন্যরকম ভাবনার প্রকাশ দেখা যায় 'জাভাযাত্রীর পত্র'-এর এক সংখ্যক পত্রটিতে। এইখানে বিজ্ঞানকে বিশ্বকর্মা বলা হল। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করলেন বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ তপস্যা সকল দেশের সকল কালের মানুষকে দেবতার শক্তি দিয়েছে। সকল রকম দুঃখ দৈন্য পীড়াকে মানবলোক থেকে দূর করার জন্য সে অস্ত্র গড়ছে। রবীন্দ্রনাথ দৃপ্তভাবে বললেন, 'মানুষের অমরাবতী নির্মাণের বিশ্বকর্মা এই বিজ্ঞান।'[১৮৫] এখানে বিশ্বকর্মার এক যুক্তিবোধসম্পন্ন, তপস্বী মূর্তি খুঁজে পাওয়া যায়।

রাবীন্দ্রিক বিশ্বকর্মা আবার উল্টোপথেও চলেন। 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-র 'মা ভৈঃ' লেখাটিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> বিশ্বকর্মা নৈয়ায়িক ছিলেন না, সেইজন্য পৃথিবীতে অযৌক্তিক ব্যাপার পদে পদে দেখিতে পাই।[১৮৬]

বিশ্বকর্মার কাজ করাতেই আনন্দ। সেই কারণেই 'জাভাযাত্রীর পত্র'-এ পাঁচ সংখ্যক পত্রটিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন যে বিশ্বকর্মার বাঁশিতে নিয়তই যে ছুটির সুর বাজে। এই কারণে সাধারণ মানুষ তা শুনতে পায় না। এই ছুটির সুরেই বিশ্বকাজের ছন্দ বাঁধা থাকে।[১৮৭]

'আত্মপরিচয়'-এর চার সংখ্যা অধ্যায়টিতে রবীন্দ্রনাথ এক চপল বিশ্বকর্মার কথা বলেছিলেন। সত্তরের কোঠায় পা রেখে রবীন্দ্রনাথ নিজেকেও বলেছিলেন, 'চঞ্চলের লীলা সহচর'। স্মৃতিচারণের ভঙ্গিতে বলেন যে বিশ্বের বিচিত্র লীলায় নানা সুরে চঞ্চল হয়ে উঠেছে নিখিলের চিত্ত, তারই তরঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথ চপল, চঞ্চল। তাঁর গাম্ভীর্যের ত্রুটির জন্য তিনি বিশ্বকর্মাকে দায়ী করেন।—

> ...কিন্তু বিশ্বকর্মার ফর্মাশের যে অন্ত নেই। তিনি যে চপল, তিনি যে বসন্তের অশান্ত সমীরণে অরণ্যে অরণ্যে চিরচঞ্চল। গাম্ভীর্যে নিজেকে গড়খাই করে আমি তো দিন খোয়াতে পারি নে। এই সত্তর বৎসর নানা পথ আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। আজ আমার আর সংশয় নেই, আমি চঞ্চলের লীলাসহচর। ... খেলেন তিনি 'কিন্তু আসক্তি রাখেন না— যে খেলাঘর নিজে গড়েন তা আবার নিজেই ঘুচিয়ে দেন।[১৮৮]

এমনই ভাবলেশহীন রসিক, কর্মী বিশ্বকর্মার কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের পথে'-র 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধে। তিনি জানিয়ে দিলেন যে সৃষ্টির বাজে খরচের বিভাগেই অসীমের খাসতহবিল। ঐখানেই যত রঙের রঙ্গিমা, রূপের ভঙ্গি। যারা মুনাফার হিসেব রাখে তারা বলে, এটা অসংযম। এই প্রবন্ধে আমরা হাপর হাতুড়ি নিয়ে ব্যস্ত এক বিশ্বকর্মাকে খুঁজে পাই, যিনি এর দিকে তাকান না। রবীন্দ্রনাথ তাঁকেই বললেন 'বিশ্বকবি' যিনি এই বাজে খরচের বিভাগে তাঁর থলিঝুলি কেবলই উজার করে দিচ্ছেন, অথচ রসের ব্যাপারে আজও দেউলে হন না।[১৮৯]

'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধের ভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথ বললেন যে আমাদের অন্তরে এমন একজন আছেন, যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।'[১৯০] তিনি সর্বজনীন, সর্বকালীন মানব। এই মানবকেই নাকি মানুষ নানা নামে পূজা করেছে। তাঁকেই বলেছে— 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা'।[১৯১] সকল মানবের ঐক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তাঁকে পাবে আশা করে মানুষ তাঁর উদ্দেশে প্রার্থনা জানিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ স্বীকারোক্তির মতো করে বললেন,

> সেই মানব, সেই দেবতা, য একঃ, যিনি এক, তাঁর কথাই আমি এই বক্তৃতাগুলিতে আলোচনা করেছি।[১৯২]

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকর্মাকেই কথান্তরে বলেন 'বিশ্বদেবতা', যাঁর আসন লোকে, লোকে, গ্রহচন্দ্রতারায়।'[১৯৩]

'খৃস্টোৎসব' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'উপরের সঙ্গে নীচের যে মিলন, বিশ্বকর্মার কর্মের সঙ্গে ক্ষুদ্র আমাদের কর্মের যে মিলন, বিশ্বে নিরন্তর তারই লীলা চলছে। তার দ্বারা সব পূর্ণ হয়ে আছে।'[১৯৪] এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বড়ো আমি ছোটো আমি'র তত্ত্বকথা মনে পড়ে যেতে পারে।

'রাশিয়ার চিঠি'র ৭ অক্টোবর ১৯২৪ তারিখে লেখা পত্রটিতে লিখেছিলেন যে বিশ্বকর্মার লীলাখেলার স্রোতটার মধ্যে হঠাৎ পড়ে গেলে শুকনো ডাঙার কথাটা একেবারেই মনে থাকে না। 'রাশিয়ার চিঠি'র সাত সংখ্যক অধ্যায়ে বিশ্বকর্মাকে সমবেত শক্তির প্রতীকে প্রকাশ করলেন। রাশিয়ায় গিয়ে তিনি বিরাট চিত্তের স্পর্শ পেয়েছিলেন। শিক্ষার বিরাট পর্ব আর কোনো দেশে এমন করে দেখেননি। এখানে প্রত্যেকের শিক্ষায় সকলের শিক্ষা। কারণ, রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে সম্মিলিত শিক্ষার যোগে এরা সম্মিলিত মনকে বিশ্বসাধারণের কাজে সফল করতে চায়। এরা বিশ্বকর্মা, অতএব এদের বিশ্বমনা হওয়া চাই। অতএব এদের জন্যেই যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়।[১৯৫]

'জাভাযাত্রীর পত্র'-এর ২০ সংখ্যক পত্রটিতে কৌতুক করে বলেন— 'আমাদের জাহাজ দুটি দ্বীপ ঘুরে যাবে, তাই দুদিনের পথে তিনদিন লাগবে। এই জায়গাটাতে বিশ্বকর্মার মানিব্যাগ ছিঁড়ে অনেকগুলি ছোটো দ্বীপ সমুদ্রের মধ্যে ছিটকে পড়েছে।'[১৯৬] মনে মনে আধুনিক পোশাক পরা বিশ্বকর্মার এক মানিব্যাগ সম্বলিত নতুন চেহারা ভেসে ওঠে। বলাই বাহুল্য তা রবীন্দ্রকল্পনার সূত্রেই সম্ভব হয়।

চার

'ব্যঙ্গকৌতুক' গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথ 'স্বর্গীয় প্রহসন' নামে এক ব্যঙ্গনাটক লিখেছিলেন। নাটকটির চরিত্ররা ছিলেন দেবসমাজের অনেক দেবদেবী। এমনকি লৌকিক দেবদেবীদের নিয়েও রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ করেছিলেন এই নাটকে। বিশ্বকর্মাকে কিন্তু এই দেবচরিত্রগুলির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। খুঁজে পাওয়ার কথাও নয়। কারণ, বিশ্বকর্মা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বোধের জগৎ, উপলব্ধির পৃথিবী অধিকার করে। রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশ্বকর্মা এমন একজন দেবতা যিনি তাঁর সৃষ্টিসত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। যিনি কর্ম করেন, কিন্তু ফলের আশা করেন না। যিনি রবীন্দ্রনাথের অন্তর্লোকের গুহায় নিভৃতে কাজ করে যান। বৈদিক বা পৌরাণিক প্রভাবকে অতিক্রম করে ঔপনিষদিক ভাবনার প্রকাশ রাবীন্দ্রিক বিশ্বকর্মাকে জ্যোতির্ময় করে তোলে, যে বিশ্বকর্মা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল সত্তাকে আলোর সন্ধান দেন।

গণেশ

গণেশ হলেন পৌরাণিক দেবতা। বৈদিক যুগে এই দেবতাটি বৈদিক ঋষিদের পুজো পাননি। পৌরাণিক মিথ অনুসারে, গণেশ, শিব-পার্বতীর পুত্র। কখনো বলা হয় গণেশ শুধুই পার্বতীর সন্তান। হিমালয় কন্যা পার্বতী সন্তানলাভের জন্য পুণ্যক ব্রত অনুষ্ঠান করেছিলেন। এক বছর এই ব্রত করার পর বিষ্ণুর কাছ থেকে পার্বতী পুত্রলাভের বর পেয়ে গণেশকে লাভ করেন। নবজাত গণেশ ছিলেন সর্বাঙ্গসুন্দর। কিন্তু শাপগ্রস্ত শনির দৃষ্টিতে শিশু গণেশের ধড় থেকে মাথা আলাদা হয়ে যায়। বিষ্ণু এক ঘুমন্ত হাতির মাথা কেটে নিয়ে আসেন এবং গণেশের গলায় যুক্ত করেন। অসম্পূর্ণ চেহারার জন্য গণেশ যাতে সকলের কাছে অনাদৃত না হন, সেইজন্য দেবতাদের মধ্যে নিয়ম জারি হয় গণেশের পুজো না হলে তাঁরাও পুজো গ্রহণ করবেন না। আরও একটি পৌরাণিক উপাখ্যান অনুসারে পার্বতীর শরীরের দিব্য গাত্রমল থেকে গণেশের জন্ম হয়। মহাদেব পার্বতীকে খুশি করার জন্য একটি গজমস্তক গণেশের শরীরে যুক্ত করেন। পার্বতী ও মহাদেবের আশীর্বাদধন্য এই দেবতা গণের অধিপতি, বিঘ্ন বিনাশক ও সর্বসিদ্ধিদাতা। গণেশের খর্ব দেহ, ত্রিনয়ন, চারটি হাত, হাতির মতো মাথা তথাকথিত দেবসুলভ আভিজাত্য বহন করে না। কিন্তু এই দেবতা জ্ঞানের প্রতীক। ইনিই ব্যাসদেবের কাহিনিকে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী এই অসুন্দর দেবতাটি তপস্যায় মগ্ন থাকতেন অনেক সময়। তুলসি তাঁকে পতি হিসাবে কামনা করে প্রত্যাখ্যাত হন এবং তাঁরই অভিশাপে গণেশকে পুষ্টি নামের এক কন্যাকে বিবাহ করতে হয়। এই সেই দেবতা যিনি শিবের সঙ্গে সম্মুখ সমরে নেমেছিলেন।

পরশুরামের কুঠারের আঘাতে একটি দাঁত হারিয়ে তিনি হয়েছিলেন একদন্ত। গজাসুরকে বধ করে তিনি হয়েছিলেন গজানন। তাঁর অদ্ভুত চেহারার কারণে তাঁকে লম্বকর্ণ, লম্বোদর ইত্যাদি বিশেষণেও বিশেষিত করা হয়।[১৯৭]

দুই

রবীন্দ্রসাহিত্যে গণেশের প্রসঙ্গ এসেছে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষেত্রে। গণেশ দেবসমাজের অভিজাত, সুপুরুষ দেবতাদের পাশে আপাতভাবে বেমানান। তাঁর এই অসম্পূর্ণতা তাঁকে দেবী দুর্গার আরো স্নেহের পাত্র করে তুলেছে বলেই মনে হয়। খর্বাকৃতির দেহে হাতির মাথা তাঁকে শিশুদের কাছে উপভোগ্য দেবতায় পরিণত করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের 'বিজ্ঞ' কবিতায় খুব মজাদার ভঙ্গিতে গণেশের উল্লেখ করেন। কবিতাটিতে যে খুকির কথা আছে, তার আধো আধো বোল তার অগ্রজের কাছে বেশ আকর্ষক। সে যে কিছু বোঝে না, কেবল চাঁদ ধরতে চায়, সেটাই তার দাদার কাছে বড়ো খবর। সিদ্ধিদাতা গণেশের পরিচয় জানে বলেই তাঁর দাদা আশ্চর্য হয়ে মাকে বলে— 'গণেশকে ও বলে যে মা গানুশ।'[১৯৮] এই পঙ্‌ক্তিটি পাঠকের কাছে দুটি দিক তুলে ধরে। প্রথমত, দেবতা গণেশ সম্পর্কে দুটি শিশুই সচেতন। দ্বিতীয়ত, খুকির ছেলেমানুষী ভরা পৃথিবীতে 'গণেশ' 'গানুশ' হয়ে আদর পায়। 'গণেশ' এখানে শুধুই পার্বতীনন্দন। 'খাপছাড়া'র ১৩ সংখ্যক ছড়াটিতে 'ইতিহাস বিশারদ গণেশ ধুরন্ধর' একলাই নাকি বোম্বাই বন্দর ইজারা নিয়েছেন।[১৯৯] এখানে গণেশের এক বুদ্ধিদীপ্ত ছবি খুঁজে পাওয়া যায়।

তিন

'পঞ্চভূত' গ্রন্থের একটি প্রবন্ধ হল 'সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ'। এইখানে আবার গণেশের উল্লেখ করা হয়। বলা হয়, ভারতীয়দের কাছে গজমুণ্ড গণপতির মূষিকবাহন মূর্তি কিছুই বিসদৃশ ঠেকে না। আসলে এই প্রবন্ধে কথা হচ্ছিল নারীদেহের রূপবর্ণনা বিষয়ে। সেদিন বৈঠকী আড্ডায় বলা হয়েছিল যে ভারতবাসীর প্রকৃতিই হল বস্তুর থেকে ধর্মকে বিযুক্ত করে দেখা। ফলে কৌতুক তাদের বিচলিত করতে পারে না। ক্ষিতির মতে, শুধু কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, জ্ঞানরাজ্যেও ভারতবাসীর এই স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যোম ও সমীর এই প্রসঙ্গে গ্রিকদের সঙ্গে ভারতবর্ষীয়দের স্বভাবের তুলনা করে বলেছিলেন যে গ্রিকদের কাছে বর্হিজগৎ অতিমাত্রায় জাজ্বল্যমান ছিল। তাই, তাঁদের দেবদেবীর রূপ রচনায় বা নরনারীর মূর্তি নির্মাণের বাস্তবতায় এই রূপবিচ্যুতি কখনোই প্রশ্রয় পায়নি। বাইরের আদর্শের

সঙ্গে সযত্নে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তাঁরা নিজেদের শিল্পকর্মগুলি সৃষ্টি করেছিলেন। ভারতীয়রা কবিশিল্পীকে 'নিয়তিকৃতনিয়মরহিত' ভাবে কল্পনালোকে অবাধ বিচরণের ছাড়পত্র দিয়েছে। সেই কারণেই গণেশের 'গজমুণ্ড', 'খর্বাকৃতি', 'মূষিকবাহন' রূপ ভারতবাসীর ভক্তিকে প্রতিহত করতে পারেনি।[২০০]

'জীবনস্মৃতি'র অন্তর্গত একটি অধ্যায় হল 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ'। এই অধ্যায় গান সম্পর্কে নিজের মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি 'গণপতি'র উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে তিনি গানের বই ছাপাতে সংকোচ বোধ করেন। কারণ, গানের বইতে আসল জিনিসই বাদ পড়ে যায়। তিনি রসিকতা করে বলছেন, 'সংগীত বাদ দিয়া সংগীতের বাহনগুলিকে সাজাইয়া রাখিলে কেমন হয়, যেমন গণপতিকে বাদ দিয়া তাঁহার মূষিকটাকে ধরিয়া রাখা।'[২০১] এখানে রুচিবোধ ও সংস্কৃতির প্রতীক হয়ে উঠেছেন দেবতা গণেশ। আবার তার ঠিক বিপ্রতীপে অন্তঃসারশূন্যতার প্রতীক হল মূষিকটি।

'বাংলা শব্দতত্ত্ব' বইটির 'অনুবাদ চর্চা' প্রবন্ধে গণেশের দেবসমাজে সকলের আগে পূজা পাওয়ার মিথটির উল্লেখ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বলেছেন, ''বাংলা ভাষায় 'যাহারা' সর্বনামটি গণেশের মতো বাক্যের সর্বপ্রথম পূজা পাইয়া থাকে।''[২০২]

'পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরি'তে ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪-এর চিঠিতে গণপতির উল্লেখ আছে। গণেশ এখানে কর্মব্যস্ত, হিসেবি দেবতা। গণেশের মূষিক যেন সকল কাজেই ছিদ্র অন্বেষণের জন্য ব্যাকুল। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলছেন,

> কাব্যসরস্বতীর সেবক হয়ে গোলেমালে আজ গণপতির দরবারের তকমা পরে বসেছি, তার ফলে কাব্যসরস্বতী আমাকে প্রায় জবাব দিয়েছেন, আর গণপতির বাহনটি আমার সকল কাজেই ছিদ্র অন্বেষণ করছেন।[২০৩]

৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪-এর পত্রটিতে বেশ স্পষ্ট করেই রবীন্দ্রনাথ ইঙ্গিত দিলেন যে শারীরিক অসঙ্গতির কারণেই গণেশ পার্বতীর বিশেষ স্নেহের পাত্র। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রটিতে দিব্যি বলেছেন যে দেবতার মনের ভাব তাঁর জানা নেই বলে তিনি অভিমান রাখেন না। তবে, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস এই যে কার্তিকের চেয়ে গণেশের ওপর দুর্গার স্নেহ বেশি। এমনকি লম্বোদরের অযোগ্য ক্ষুদ্র বাহনটার ওপরেও রয়ে যায় দেবী দুর্গার কৃপাদৃষ্টি। ইঁদুর যখন তাঁর ভাঁড়ারে ঢুকে তাঁর ভাঁড়গুলোর গায়ে সিঁধ কাটেন, তখন হেসে তিনি তাকে ক্ষমা করেন। স্নিগ্ধ কণ্ঠে তাকে প্রশ্রয় দেন।[২০৪] কারণটা রাবীন্দ্রিক ব্যাখ্যায় পৌরাণিক মিথ ভেঙে হয়ে যায় অন্যরকম। রবীন্দ্রনাথের মতে, বাক্যের অপূর্ণতাকে সংগীত

যেমন আপন রসে পূর্ণ করে তোলে, প্রেম তেমনি সুযোগ্যতার অপেক্ষা করে না, অযোগ্যতার ফাঁকের মধ্যে সে নিজেকে ঢেলে দেওয়ার সুযোগ পায়। গণেশ এখানে নান্দনিক অসম্পূর্ণতার প্রতীক।

'জাভাযাত্রীর পত্র'তে গণেশের প্রসঙ্গ ইতস্তত ছড়িয়ে থাকে। পত্রে রবীন্দ্রনাথ চলে যাচ্ছেন মানুষের ইতিহাসের শুরুর দিনে। যেদিন গুহাগহ্বরে, অরণ্যের ছায়ায় ছায়ায় দুই পায়ের ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়ালো চটুল জীব। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'নড়ে চড়ে ছাড়িয়ে লম্বোদর হয়ে উঠেছে।' এমন লম্বোদর, যে বস্তুর সংখ্যাধিক্য বিস্তারের প্রচণ্ড উন্মত্ততায় সুন্দরকে সে জায়গা ছেড়ে দিতে চায় না, 'পেটুকতার আধিপত্য ঘটে'। এই প্রতিটি উপমাই হল গণেশের বিসদৃশ চেহারার প্রতি কটাক্ষ করে। এখানে দেবতা গণেশের প্রসঙ্গ সদর্থক অর্থে ব্যবহার করেননি রবীন্দ্রনাথ। 'জাভাযাত্রীর পত্র'তে আরেক প্রসঙ্গে গণেশের কথা আনলেন রবীন্দ্রনাথ 'গণেশের হাতির মুণ্ডে মানুষের সিদ্ধির মূর্তি'[২০৫] — এই মন্তব্যের এক অভিনব ব্যাখ্যা দিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলেছেন, বুনো হাতি মূর্তিমান উৎপাত, বজ্রবৃংহিত ঝড়ের মেঘের মতো। এতটুকু মানুষ সেই বিশাল প্রাণীটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে। সে শুধু জঙ্গলে নয়, লোকালয় এবং ফসলক্ষেতেও। এ এক গভীর অধ্যাবসায়। সেই জন্যই এই সিদ্ধির দুই দিকে দুই জন্তুর চেহারা, একদিকে রহস্যসন্ধানকারী সূক্ষ্মঘ্রাণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি খরদন্ত চঞ্চল কৌতূহল, সেটা ইঁদুর, সেইটেই বাহন। আর একদিকে বন্ধন বশীভূত বন্যশক্তি, যা দুর্গমের ওপর দিয়ে বাধা ডিঙিয়ে চলে, সেইটে হল যান— সিদ্ধির যানবাহন যোগে মানুষ কেবলই এগিয়ে চলছে। তার ল্যাবরেটরিতে ছিল ইঁদুর আর তার এরোপ্লেনের মোটরে আছে হাতি। রবীন্দ্রনাথ এখানে গণেশ দেবতাকে মানবসভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে দিব্যি মিলিয়ে দিয়েছিলেন।

চার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত উপন্যাস হল 'শেষের কবিতা'। এই উপন্যাসের 'অমিত' অংশে অমিত যখন পকেট থেকে একটা সরু লম্বা ক্যাম্বিস বাঁধা খাতা বের করে, সেই খাতা থেকে পাঠ করা একটি কবিতায় গণেশের উল্লেখ আছে।—

আনিলাম
অপরিচিতের নাম
ধরণীতে।
পরিচিত জনতার সরণীতে
আমি আগন্তুক,
আমি জনগণেশের প্রচণ্ড কৌতুক
খোলো দ্বার,

বার্তা আনিয়াছি বিধাতার।
মহাকালেশ্বর
পাঠায়েছে দুর্লক্ষ্য অক্ষর,
বল্ দুঃসাহসী কে কে
মৃত্যু পণ রেখে
দিবি তার দুরূহ উত্তর।[২০৬]

গণেশ এখানে জনতার প্রচণ্ড শক্তির প্রতীক। তার সঙ্গে 'মহাকালেশ্বর' এখানে যেন নিয়তির প্রতিনিধি হয়ে আসেন। এই কবিতাটিতে জনগণেশ এবং মহাকালেশ্বরের ইঙ্গিতে শিব ও গণেশের পৌরাণিক দ্বৈরথের কথা মনে পড়ে যায়। জনগণেশ এখানে আধুনিক মন ও মনন।

পাঁচ

'হাস্যকৌতুক'-এর অন্তর্গত একটি কৌতুক নাটক 'আশ্রমপীড়া'। সেখানে 'গণেশ' নামের একটি চরিত্রই সৃজন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি আবার লেখার কথা বলেন—

> লেখাটা তো শেষ করেছি, এখন শোনাই কাকে? খাতা হাতে যেখানেই যাই কাউকে দেখতে পাই নে। আজ কাউকে শোনাতেই হবে সন্ধান করে দেখি গে।[২০৭]

গণেশ নামের চরিত্রটির লেখা কেউ শুনতে চায় না। দেবতা গণেশও মহাভারত লিপিবদ্ধ করেছিলেন। পৌরাণিক গণেশের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। রাবীন্দ্রিক এই গণেশ নিজের গুরুত্ব সকলকে উপলব্ধি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটকে কেদার আর তিনু গণেশকে নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন। কেদার বলেন গণেশের সিদ্ধিদাতা হওয়ার কারণ। তিনি যে মোটা লোকটি, চেপে বসে থাকতে জানেন, কোনো কিছুতেই কোনো গরজ নেই। তিনকড়ি চিন্তিত হয়ে যায় তাঁর ইঁদুরটিকে নিয়ে।

গণেশের সিদ্ধ মূর্তির উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ অনেক দার্শনিক ও নান্দনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন। গণেশ এখানে একদিকে সর্বগ্রাসী লোলুপ সত্তার আর অন্যদিকে নান্দনিক বোধের প্রতীক।

কার্তিক

কার্তিক হলেন দেবসেনাপতি। তিনি স্কন্দ নামেও পরিচিত। রামায়ণ এবং মহাভারতে তাঁকে শিব বা রুদ্রের সন্তান বলা হয়েছে। তাঁর জন্ম কোনো নির্দিষ্ট নারীর গর্ভে হয়নি। শিবের তেজ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয় এবং গঙ্গা তা ধারণ করেন। ছয়টি মাথার জন্য তাঁকে ষড়ানন বলেও সম্বোধন করা হয়। ছয় জন কৃত্তিকা তাঁকে স্তন্যদান করেন। গঙ্গা এবং পার্বতী দুজনেই তাঁর মা। তারকাসুর বধের জন্য স্বর্গের দেবতাদের পূর্বপরিকল্পনা অনুসারেই কার্তিকের জন্ম হয়েছিল। তীরধনুক হাতে, ময়ূরের পিঠে বসে থাকা বিগ্রহটি আমাদের সকলেরই পরিচিত। কার্তিক চিরকুমার, এমন মিথও যেমন বহুচর্চিত, তেমনি

‘দেবসেনা’ নামে কার্তিকের পত্নীর কথাও পুরাণসিদ্ধ। কার্তিক যুবশক্তির প্রতীক। তাঁর ব্রহ্মচর্য ও তারুণ্যের শক্তির কাছে শুধু অসুর কেন, প্রবীণ দেবতারাও নত হয়েছিলেন। সুসন্তান লাভের জন্য কার্তিকের পূজা বহু প্রচলিত। কার্তিক বীর দেবতা। যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাবু কালচারের প্রতি কটাক্ষ করে ‘বাবুকার্তিক’ কথাটি চলে আসে, তবু কার্তিক সৌন্দর্য ও বীর্যের বৈভব নিয়ে সাহসিকতার মূর্ত প্রতীক।[২০৮]

রবীন্দ্রনাথের লেখার টানে কখনো কখনো কার্তিকের প্রসঙ্গ এসেছে। ‘বাবুকার্তিক’ নয়, বীর, কিশোর কার্তিককেই রবীন্দ্রনাথ গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন বেশি। ‘ছন্দ’ বইটির ‘পত্রধারা তৃতীয় পর্যায়’ অংশে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে ‘গদ্যছন্দ’-এর আলোচনার সূত্রে জানিয়েছিলেন যে দেবসেনাপতি কার্তিক যদি কেবল স্বর্গীয় পালোয়ানের আদর্শ হতেন। তাহলে শুম্ভ নিশুম্ভের চেয়ে ওপরে উঠতে পারতেন না। গদ্যকবিতা বোঝাতে গিয়ে তিনি কার্তিকের উপমাটি ব্যবহার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, কার্তিকের পৌরুষ কমনীয়তার সঙ্গে মিশ্রিত বলেই তিনি দেবসাহিত্যে গদ্য কাব্যের সিংহাসনের উপযুক্ত নন। রবীন্দ্রনাথ কার্তিকের বীর্যবান মূর্তিটির চিরপ্রতিষ্ঠা চেয়ে একটি মন্তব্যও করেন—

> দোহাই তোমার, বাংলাদেশে ময়ূরে চড়া কার্তিকটিকে সম্পূর্ণ ভোলার চেষ্টা করো।[২০৯]

‘সাহিত্যে চিত্রবিভাগ’ প্রবন্ধে আর্টের সম্পূর্ণতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আবার টেনে আনলেন কার্তিকের প্রসঙ্গ। কার্তিকের জন্মগ্রহণের পর স্বর্গ উদ্ধার করলে তবেই ‘প্রবলেমের শান্তি’ হয়। কিন্তু আর্টে ‘প্রবলেমকে ঠাণ্ডা’ করার প্রয়োজন নেই। নিজের রূপটিকে সম্পূর্ণ করাই তার কাজ। ‘পশ্চিমযাত্রীর ডায়রি’র ‘যাত্রী’ অংশে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ তারিখের চিঠিতে আবার কার্তিকের উল্লেখ করেছিলেন। মজা করে বলেছিলেন যে দেবতার মনের ভাব জানেন বলে তাঁর অভিমান নেই। কিন্তু তাঁর নাকি দৃঢ় বিশ্বাস কার্তিকের চেয়ে গণেশের ওপর দুর্গার স্নেহ বেশি। এমনকি লম্বোদরের অতি অযোগ্য ক্ষুদ্র বাহনের ওপর কার্তিকের খোশ পোশাকি ময়ূর লোভদৃষ্টি দেয় বলে তার পেখমের অপরূপ সৌন্দর্য সত্ত্বেও তিনি বিরক্ত। কার্তিকের কীর্তি এবং গণেশের অযোগ্যতার লড়াই-এ কার্তিক বারবার পিছিয়ে পড়ে। আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এক স্নেহের কাঙাল কার্তিক সৃজন করে ফেলেছিলেন এই সুযোগে।[২১০]

দুই

রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত গল্প হল 'গিন্নি'। সেখানেও কার্তিকের উল্লেখ রয়েছে। শিবনাথ পণ্ডিতের কথা বলতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথ কার্তিকের উল্লেখ করেছিলেন। ইনি আক্ষেপ করতেন পুরাকালের মতো গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ এখন আর নেই। এই বলে নিজের উপেক্ষিত দেবমহিমা বালকদের মাথায় সবেগে নিক্ষেপ করতেন। আর ছাত্রদের মনস্তত্ত্ব ছিল অন্যরকম।

> স্কুলের এই তৃতীয় শ্রেণির দ্বিতীয় বিভাগের দেবতাটিকে ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ অথবা কার্তিক বলিয়া কাহারও ভ্রম হইত না। কেবল একটি দেবতার সহিত তাঁহার সাদৃশ্য উপলব্ধি করা যাইত, তাহার নাম যম।[২১১]

কার্তিক এখানে সুপুরুষ। অভিজাত দেবতাদের সমগোত্রীয়। 'বিচারক' গল্পে জজ মোহিতমোহন দত্ত ছিলেন স্ট্যাটুটরি সিভিলিয়ন। পরিণত বয়সে রক্ষণশীল হয়ে উঠলেও তাঁর যৌবনে ঠিক এতটা সংযমী ছিলেন না। মোহিত যখন কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়তেন তখন আকারে ও আচারে সম্পূর্ণ অন্যমানুষ ছিলেন। মাথায় টাক ও টিকি, মুণ্ডিত মুখের মোহিতমোহনই ছিলেন সোনার চশমায়, গোঁফ দাঁড়িতে এবং সাহেবী ধরনের কেশবিন্যাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর নতুন সংস্করণ কার্তিকটির মতো ছিলেন।[২১২] এখানে রবীন্দ্রনাথ সেই 'বাবুকার্তিক'-এর ইঙ্গিত করেছেন।

'শেষকথা' গল্পে নবীনমাধবের মুখে রবীন্দ্রনাথ কার্তিক প্রসঙ্গ নিয়ে এলেন। বিলেত যাওয়ার পর নিজের চেহারার প্রতি নবীনমাধবের বেশ গর্ব জন্মেছিল। কিন্তু বিলেত ফেরত এক বন্ধুর কাছে নবীনমাধব শুনেছে যে বাঙালি মেয়েদের রুচি আলাদা। তারা মোলায়েম মেয়েলি রূপই পুরুষের রূপে খোঁজে। 'চলিত কথায় হচ্ছে— কার্তিকের মতো চেহারা। বাঙালি কার্তিক আর যাইহোক, কোনো পুরুষে দেবসেনাপতি নয়।'[২১৩] রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধের ক্ষেত্রে কার্তিকের যে বীর্যবান সত্তা তৈরি করেছিলেন, গল্পের পৃথিবীতে নিজেই তা ভেঙে দিলেন। তাঁর গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে কেবল জেগে রইল কার্তিকের সুপুরুষ, বিলাসী চেহারাটুকু।

তিন

'ব্যঙ্গকৌতুক'-এ 'অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি' নাটকে গোকুলনাথ দত্ত মৃত্যুর পরে ইন্দ্রলোকে গিয়েছেন। সেখানে তিনি নির্ভয়ে, নিজের বক্তব্য রেখেছেন। দেবতাদের সমালোচনা করতেও ছাড়ছেন না। কার্তিককে 'ষড়ানন' বলে যথেষ্ট অপমান করলেন। তাঁর মতে, কার্তিকের একটা স্কন্দে ছয়টা মুণ্ডু নেহাতই বাহুল্য। মিথোলজির কারণে কার্তিকের ছয়টি মাথা হলেও ফিজিওলজিতে তার গুরুত্ব নেই।

কারণ নাকি কার্তিকের পাকযন্ত্র একটাই। গোকুলনাথের মতে কার্তিকের ডিপার্টমেন্ট নাকি 'মিলিটারি ডিপার্টমেন্ট'। যদিও কার্তিক চিরকুমার, তবু নাকি 'চিত্রলেখার বিরহ' নাটক দেখে তাঁর বিগলিত প্রায় দশা।[২১৪] আবার, 'প্রাচীন দেবতাদের নতুন বিপদ' নাটকে দেবতারা মানুষের অত্যাচারে একযোগে নিজের নিজের কাজে রিজাইন দিতে উদ্যত হল, সকলে 'সায়েন্স' নামক দানবের হাত থেকে মুক্তি চান। কার্তিক এখানে 'সাময়িক পত্রের সম্পাদকের উপর নিজের কাজের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন।'[২১৫] 'স্বর্গীয় প্রহসন'-এ ইন্দ্রসভায় বসে দেবগুরু বৃহস্পতি মর্তলোকের প্রলোভনের প্রসঙ্গে কার্তিকের উল্লেখ করেছেন। দেবসেনাপতি কার্তিক যে বীরবেশ পরিত্যাগ করে সূক্ষ্মবসন, লম্বকচ্ছে কামিনীমোহন নির্লজ্জ নাগর মূর্তি ধারণ করেছেন— এই কথাটি সহজ সত্যের মতোই যেন উচ্চারিত হল দেবসভায়। 'গুরুবাক্য' নাটকে কার্তিক নামক চরিত্রটির মহাবিপদ। কারণ, 'বাড়িতে কার্তিক পূজার সময় স্ত্রী কার্তিককে নাস্তিক বলে, নাম খারাপ করার দরুন ঠাকুরের কিংবা তার মার কোনো অসন্তোষ ঘটে কিনা এও জিজ্ঞাস্য।'[২১৬] 'গোড়ায় গলদ' নাটকে ইন্দুমতির জন্য নির্দিষ্ট পাত্রটিকে কার্তিকের সঙ্গে তুলনা করেছেন নিবারণ। এই প্রসঙ্গে ইন্দুমতির বক্তব্যও উল্লেখযোগ্য— 'না, সত্যি, দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। যদি কার্তিককে এঁর মতো দেখতে হয় তা হলে কার্তিককে ভালো দেখতে বলতে হবে।'[২১৭] 'শোধবোধ' নাটকে নলিনী সতীশকে ব্যঙ্গ করে বলে যে স্বর্গে তাঁর কম্পিটিশন কার্তিককে নিয়ে। আর মর্তে মিস্টার নন্দীর সঙ্গে। কারণ, কন্যাকর্তাদের সব দামী অর্কিড তারই বাটন্‌হোলে।[২১৮] সুকুমারীও সতীশকে প্রবল ভর্ৎসনার সময় 'বিলিতি কার্তিক'[২১৯] বলে ব্যঙ্গ করেন। সতীশের যে আত্মসম্মানবোধ নেই একথা বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন সুকুমারী। 'চিরকুমার সভা' নাটকে বার বার কার্তিক প্রসঙ্গ আসে। আসলে চিরকুমার দেবতা বলেই এই নাটকে তাঁর এমন প্রতিপত্তি। প্রথম দৃশ্যে পুরবালা যখন স্বামীর সঙ্গে প্রণয়কলহের সময় অক্ষয়কে বলেন, '...বাবা ভোলানাথের নন্দীভৃঙ্গীর অভাব ছিল না, আমাকে বুঝি তিনি দয়া করেছিলেন।' তখন অক্ষয়ও উত্তর দেয়— 'তা হতে পারে সেই জন্যেই কার্তিকটি পেয়েছে।'[২২০] পুরবালার কথার উত্তরে অক্ষয় বলেন, 'কার্তিকের কথাটা বুঝি ঠাট্টা?'[২২১] আর এরপর সমগ্র নাটক জুড়ে রবীন্দ্রনাথ কার্তিকের চিরকৌমার্যের মিথটি নিয়ে ঠাট্টাই করেছিলেন। দ্বিতীয় দৃশ্যে বিপিন বলেন— কার্তিকদের ময়ূরে চেপে রাস্তায় বেরোনোর কথা।[২২২] শ্রীশ আবার আধুনিক মন্তব্য করেন 'ময়ূর না পাওয়া যায় ট্রাম আছে, পদব্রজেও নারাজ নই।'[২২৩] তিনিই বলেন যে কার্তিক কেবল সুপুরুষ ছিলেন না, তিনিই ছিলেন স্বর্গের সেনাপতি।[২২৪] বিপিনের বক্তব্য কার্তিকের লড়াইয়ের জন্য দুটি মাত্র হাত এবং বক্তৃতার জন্য তিন জোড়া মুখ।[২২৫] এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ মজার ছলে আরো একবার প্রমাণ করলেন যে তিনিও শ্রীশের

মতো পালোয়ানিকে বীরের আদর্শ বলে মানেন না।[২২৬]

কার্তিক সম্পর্কে একটি সিদ্ধ মিথ এই যে সে চিরকুমার, সুপুরুষ এবং দেবসেনাপতি। রবীন্দ্র-কবিতায় কার্তিকের প্রসঙ্গ আমরা লক্ষ করিনি। কিন্তু গদ্য, নাটক এবং গল্পে রবীন্দ্রনাথ কার্তিককে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। আমাদের মনে হয়েছে ষড়াননের বুদ্ধিবৃত্তির দিকটিকে রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন বেশি। সেই কারণে কার্তিকের লড়াই করার প্রবণতাটি তাঁর কাছে 'পালোয়ানি' এবং সাজপোশাকে বিশেষ পারিপাট্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে 'বাবুয়ানা'। রবীন্দ্রসাহিত্যের দেবলোকে কার্তিক একজন অভিজাত দেবতা হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

মদন

কামদেব হলেন পুরাণের দেবতা। তিনি ছিলেন বসন্তসখা। পুরাণ অনুসরণ করলে জানা যায়, মদন তথা কামদেব হলেন দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। যুবক এই দেবতাটির বাহন হল টিয়াপাখি। মদন যৌবনের দেবতা। ভ্রমরে গাঁথা তাঁর পুষ্পধনু। মদনের ফুলবাণের পাঁচটি ফুল হল— অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমল্লিকা এবং রক্তোৎপল। তাঁর স্ত্রীর নাম হল রতি। মদনকে ঘিরে থাকেন অপ্সরা এবং গন্ধর্বরা। তাঁদের হাতে থাকে মকর আঁকা লাল ধ্বজা— 'মদনের ধ্বজা'। মদনের আরেক নাম হল মকরকেতন। এই দেবতাটিকে কেন্দ্র করে অনেক গল্পকথা লোকের মুখে মুখে পল্লবিত হয়েছিল। তার মধ্যে একটি হল ব্রহ্মার মন থেকে 'সন্ধ্যা' নামের এক পরমাসুন্দরী নারীর আবির্ভাবের পর, তার উপযুক্ত এক দৈবপুরুষ সৃজন করেছিলেন ব্রহ্মা। এই দৈবপুরুষই হলেন মদন। অনেক পরে কামদেবকে বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীর সন্তান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। পার্বতী একবার শিবের অনুরাগ পাওয়ার জন্য এই দেবতার সাহায্য নিয়েছিলেন। কিন্তু পুষ্পধনুতে সম্মোহন বাণ যুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই মদন শিবের তৃতীয় নয়নের আগুনে ভস্ম হয়ে যান। পুরাণে এই ঘটনা 'মদনভস্ম' নামে পরিচিত। এরপর রতির কাতর আবেদনে শিব দয়াপরবশ হলে কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন রূপে মদন নবজন্মলাভ করেন। মদনপূজা আর বসন্তোৎসবের মধ্যে পার্থক্য নেই কোনো। চৈত্র মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী বা চতুর্দশীতে মদনপূজা হয়।[২২৭] পাশ্চাত্য পুরাণের দুজন দেবতার সঙ্গে প্রাচ্য কামদেবের মিল আছে। তাঁরা হলেন গ্রিক পুরাণের এরস এবং রোমান পুরাণের কিউপিড। এরস যুগলপক্ষযুক্ত। তাঁর হাতে থাকে তীর-ধনুক এবং তূণীরে থাকে দুই রকম তীর। একটি আকর্ষণের ও অন্যটি বিকর্ষণের জন্য। রোমান দেবতা কিউপিডের হল বালকমূর্তি। তিনি হলেন রোমান পুরাণের কামদেবতা, প্রেমের দেবী ভেনাসের পুত্র

কিউপিড। কিউপিডও যুগলপক্ষ বিশিষ্ট। কিউপিডের প্রেমিকা সাইকি। কিউপিড ও সাইকির প্রণয় পাশ্চাত্য সাহিত্যের বহুচর্চিত বিষয়।[২২৮]

দুই

রবীন্দ্র-কবিতায় একাধিকবার এসেছে মদন প্রসঙ্গ। 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষাযাপন' কবিতায় মদনের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মদনের কিশোর বয়স। রবীন্দ্রনাথ 'কিশোর মদন' বলে সম্বোধন করেছিলেন। ঝর ঝর মুখর বাদল সন্ধ্যায় রাধার বর্ষাভিসারের সঙ্গী আর কেউ নয়, 'শুধু এক কিশোর মদন'।[২২৯] বর্ষাভিসারের পটভূমিতে কবি এঁকে দিলেন মদনের এক কিশোর অবয়ব। এর ঠিক পরে প্রকাশিত হয়েছিল 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যের 'বিজয়িনী' কবিতায় বসন্তসখা মদন লুকিয়ে বসে থাকেন বকুলতলায়, পুষ্পাসনে। মাটিতে লুটিয়ে থাকে তাঁর পীত উত্তরীয়। মালতীমালায় সাজানো তাঁর কেশ। মোহিনী সুন্দরীর স্নানলীলা কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে উপভোগ করলেন তিনি। কিন্তু শেষবেলায় সুন্দরী সেই নারীর শুচিস্নিগ্ধ স্বর্গীয় সৌন্দর্যের কাছে নত হলেন স্বয়ং দেবতা। তাঁর পুষ্পধনু, পুষ্পশর কাজেই এল না কোনো। তার ফলে,

...নিরস্ত্র মদন পানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।[২৩০]

'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থে দুটি কবিতা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। একটি 'মদনভস্মের পূর্বে' এবং অপরটি 'মদনভস্মের পরে'। কবিতা দুটিতেই মদনের প্রতি কবির প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় লক্ষ করা যায়। 'মদনভস্মের পূর্বে' কবিতায় মদনের 'কুসুমতরী'র প্রসঙ্গটি অভিনব। 'মদনভস্মের পরে' কবিতায় অনঙ্গের অস্তিত্ব কবি অনুভব করেছিলেন জ্যোৎস্নালোকে, নীল আকাশে এবং কোমল তৃণে। 'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থের 'অতিবাদ' কবিতায় কৌশলে মদনকেই প্রাধান্য দেওয়া হল। কবির গানে, প্রিয়ার কানে এবং পঞ্চশরের পুষ্পবাণে মোহনমধুর ছলনার আবাহন করা হল। 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের 'উজ্জীবন' কবিতায় ভস্ম, অপমান শয্যা ছেড়ে অতনুকে আবার জেগে উঠবার জন্য মন্ত্র উচ্চারণ করেন কবি। 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের 'তপোভঙ্গ' কবিতাটিতে এর আগেই মদনের বলিষ্ঠ উপস্থিতি লক্ষ করা গিয়েছিল। কবিসত্তা এই কবিতায় মদনের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছে। কবির মন্তব্যটি এই সূত্রে মনে রাখার মতো—

তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রে, হে রুদ্র সন্ন্যাস
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে
যুগে আসি ত তপোবনে।[২৩১]

'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের 'নির্ভয়' কবিতায় পঞ্চশরের উল্লেখ আছে—

পঞ্চশরের বেদনামাধুরী দিয়ে
বাসররাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে।[২৩২]

'পরিশেষে' কাব্যগ্রন্থের 'মৃত্যুঞ্জয়' কবিতায় মদনের একটি রূপকল্প খুঁজে পাওয়া যায়। শিব হলেন এই কবিতার মৃত্যুদেবতা। তাঁর দক্ষিণ হাতের শেল 'বজ্র টেনে আনে।'[২৩৩] দুরু দুরু বুকে সেই মৃত্যুর সম্মুখীন হন কবি। তাঁকে ঘিরে তৈরি হয়ে যায় মদনের চালচিত্র। কিন্তু মৃত্যুরূপী শিবের ভ্রূকুটিভঙ্গে নেমে আসে 'আসন্ন আঘাত'। ওই আঘাত সহ্য করতে করতে মদনের রূপকল্পের আড়ালে লুকিয়ে থাকা রবীন্দ্রনাথই হয়ে যান মৃত্যুঞ্জয়।

'পূজা পর্যায়ে'র ২৩৮ সংখ্যক গানে রবীন্দ্রনাথ 'বনে তোর লাগাস আগুন, তবে ফাগুন কিসের তরে বৃথা তোর ভস্ম পরে মরিস যুঝে।'[২৩৪] পূজা পর্যায়েরই ৫৩০ সংখ্যক গানটিতে মদনকে 'সুন্দর' বলা হল। 'চিত্রাঙ্গদা'র গানগুলিতে মদনের শরনিক্ষেপের ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারা যায়। গানগুলিতে মদনের বাণকে 'নিষ্ঠুর' মনে করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'প্রেম' পর্যায়ের ২৭১ সংখ্যক এবং ২৭২ সংখ্যক গানগুলির উল্লেখ করা যায়। 'প্রকৃতি' পর্যায়ের ২৩৮ সংখ্যক গানে আবার মদনের তরীর উল্লেখ পাওয়া যায়—

বকুলগন্ধে বন্যা এল দখিন হাওয়ার স্রোতে
পুষ্পধনু ভাসাও তরী নন্দনতীর হতে।[২৩৫]

'প্রকৃতি' পর্যায়ের ২০৮ সংখ্যক গানে রবীন্দ্রনাথ এই দেবতাকে বালকমূর্তিতে এঁকেছেন। গন্ধে উদাস হাওয়ায় উড়তে থাকে এই দেবতার উত্তরীয়। তাঁর কানে কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী। তরুণ হাসির আড়ালে লুকিয়ে থাকে আগুন, গোপন তূণে লুকানো থাকে অস্ত্র। এখানে, আমাদের মনে পড়তে বাধ্য রোমান পুরাণের কিউপিডের কথা।

তিন

'গল্পগুচ্ছ'-এর একটি গল্প হল 'মেঘ ও রৌদ্র'। এই গল্পে মদনের প্রসঙ্গ এসেছে খুব সরস ভঙ্গিতে। মদনের তীরের সংখ্যা মাত্র পাঁচ। বালিকা গিরিবালার কাছে পুষ্পশর ছিল না। কিন্তু জামের আঁটি ছিল। 'জামের আঁটির একটা গুণ এই যে একে একে অনেকগুলি নিক্ষেপ করা যায়। চারিটি নিষ্ফল হইলে অন্তত পঞ্চমটি ঠিক স্থানে গিয়া লাগিতে পারে।'[২৩৬] 'চোখের বালি' উপন্যাসে মদনকে 'ফুলশর' বলে সম্বোধন করেছেন লেখক। 'এতক্ষণ ফুলশর ঘরের কোণে খেলা করিতেছিল, সে যেন দ্বিতীয়বার ভস্মসাৎ হইয়া গেল।'[২৩৭] এখানে 'ফুলশর' বলতে মদনের কথাই বোঝানো হয়েছে। ফাল্গুন মাসের শুক্লা চতুর্দশীর দিন হল মদনপূজা। দোল আর মদনপূজার দিনটি এক। রবীন্দ্রনাথ 'মালঞ্চ'

উপন্যাসে এই দিনটিকে ব্যবহার করেছিলেন অভিনব উপায়ে। ঐদিনই রমেন সরলার সঙ্গে দেখা করতে আসবে বলেছিল। কিন্তু আশ্চর্যভাবে আদিত্য আর সরলার মন বিনিময় হয় এই রাতেই। ভালোবাসার দেবতা তাদের ওপর তাঁর পুষ্পবাণ নিক্ষেপ করেন এই মদনপূজার রাতেই।

চার

মদন যেখানে কামনা মাত্র, রবীন্দ্রনাথ সেখানে তাঁকে পরাজিত করেছেন। 'প্রাচীন সাহিত্য' বইটির 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে, মদনের চেষ্টায় দৈবশাপ লেগেছে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে ধর্ম যেখানে দুটি হৃদয়কে একত্র করে সেখানে মদনের সঙ্গে কারো বিরোধ বাধে না। সে যখন ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বাঁধাতে চায়, তখনই বিপ্লব উপস্থিত হয়। তখনই প্রেমের মধ্যে ধ্রুবত্ব এবং সৌন্দর্যের মধ্যে শান্তি থাকে না। ইন্দ্রসভার কোনো প্রয়াস ছাড়া, মদনের মোহ বা বসন্তের আনুকূল্যের ঊর্ধ্বে যে প্রেম তাকেই রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন। কারণ, সেই ভালোবাসা 'আপনার নির্মলতায় মঙ্গলতায় আপনি অক্ষুব্ধ, আপনি সম্পূর্ণ।'[২৩৮] হয়তো তাই 'বিজয়িনী' কবিতাতেও মদনের মধুর পরাজয় ঘটে। 'পঞ্চভূত'-এর 'মন' প্রবন্ধে খুব নিপুণ ভাবে কন্দর্পের প্রসঙ্গ ব্যবহার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রকৃতির কথা বলতে গিয়ে লিখেছিলেন,

> কোনো কৌতুকপ্রিয় শিশুদেবতা যদি দুষ্টামি করিয়া একটি ফোঁটা মন ফেলিয়া দেয়, তবে তাহার মধ্যে না থাকে পল্লবমর্মর, না থাকে সেই ছায়া, না থাকে সর্বাঙ্গব্যাপ্ত সরস সম্পূর্ণতা।[২৩৯]

এই শিশুদেবতার কল্পনাটি রোমান পুরাণের কিউপিডের দ্বারা প্রভাবিত।

পাঁচ

রবীন্দ্রনাটকে আমরা অভিনব কিছু মদন-প্রসঙ্গ খুঁজে পেয়েছি। 'রক্তকরবী' নাটকে বালকবীর মদনের আদলেই গড়েছিলেন কিশোরকে। সে রোজ নন্দিনীকে 'মারের মুখ' থেকে ফুল এনে দিত— লাল রক্তকরবীর ফুল! তার 'বালিকার মতো কচি মুখ', উদ্ধত বাক্য এবং রাজার মুখোমুখি হওয়ার সাহস— তাকে বিশিষ্ট করে তোলে। এই নাটকে রাজা হলেন মকররাজ। আমাদের মনে পড়বে, মদনও কিন্তু মকরবাহন। এই রাজা একটা জালের মধ্যে আবদ্ধ। আমাদের অনুমান এই হল কামনার জাল। কারণ, নন্দিনীর প্রতি রাজার আকর্ষণের মূলে আছে স্থূল এক রকম কামনা। রাজা একটা লোভী ছেলের মতো নন্দিনীর দিকে চেয়ে থাকে। রাজা বলে, 'দাড়িমের দানা ফাটিয়ে দশ আঙুলের ফাঁকে ফোঁকে যেমন তার রস বের করে, তেমনি তোমাকে আমার এই দুটো হাতে...।'[২৪০] রাজার এত দাহ দেখে মনে হয় রাজা হলেন সদ্য ভস্মীভূত হওয়া দগ্ধ মদন। রাজার ক্রোধ, রাজার সংশয়, রাজার দাহ, প্রতিশোধ

স্পৃহার ঠিক বিপ্রতীপ হল কিশোর। তার অমলিন প্রেম ও পবিত্র আবেগ তাকে কিশোর মদনের মহিমা দেয়। বিশু যেমন রঞ্জনের আলো না পড়া উল্টোপিঠ, কিশোরের অন্ধকার ও পিঠটা তাহলে রাজা। নন্দিনী রাজাকে 'ধ্বজাদণ্ডের দেবতা' বলে সম্বোধন করে। এই প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গে কোচবিহার জেলার গ্রামগুলিতে মদন ত্রয়োদশী ও মদন চতুর্দশী তিথি দুটিকে কেন্দ্র করে মদনপূজার উল্লেখ করা যায়। মদনের এই প্রতীক পূজা ইন্দ্রধ্বজ পূজার সাদৃশ্যে কল্পিত। 'রক্তকরবী' নাটকে রাজারও ধ্বজা ছিল। সে ধ্বজা অজেয় শল্যের মতো একদিকে পৃথিবী, অন্যদিক দিয়ে স্বর্গকে বিদ্ধ করেছে। নাটকের শেষে রাজা যখন নিজেই ধ্বজা ভাঙতে চলেন, তখন এই নাটকে রাজাকে ঘিরে আমাদের মদনকল্পনা আরও দৃঢ় হয়। রাজা বলেন,

...এই আমার ধ্বজা, আমি ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেল ওর কেতন।[২৪১]

আমাদের অনুমান রবীন্দ্রনাথ মকররাজ চরিত্রের অন্তরালে কামনার দেবতার কাঠামো তৈরি করেছেন। কিশোর হল প্রেমের শুদ্ধ রূপ। তার আত্মদানের পুণ্য লগ্ন থেকেই যক্ষপুরীতে বিপ্লব শুরু হয়। রাজা হলেন কিশোরের অন্ধকার উল্টোপিঠ। এই রাজা নিজেই নিজের ধ্বজা ভাঙেন। ধ্বজাটি মদনের ধ্বজা বলেই আমাদের অনুমান। শীতের কঠোরতার সব আড়ম্বর ভেঙে যায়। আসন্ন ফাল্গুনে শুরু হয় নতুন গল্প।

রোমান পুরাণে কিউপিডের সঙ্গে আমাদের প্রেমের দেবতা মদনের মিল রয়েছে। ভেনাস অর্থাৎ কিউপিডের মা মর্ত্যনারী সাইকির প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁকে শাস্তি দিতে চান। কিউপিডের ওপর দায়িত্ব দেন পুষ্পশর নিক্ষেপের, যাতে সাইকি পৃথিবীর সবচেয়ে কুদর্শন মানুষকে বরণ করে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু, কিউপিড নিজেই সাইকির প্রতি আকৃষ্ট হলেন। ঘটনার শুরুতে অ্যাপোলোর একটি ভবিষ্যৎবাণীও স্মরণ করার মতো। অ্যাপোলো সাইকির বাবাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সাইকিকে বধূবেশে সাজিয়ে রাতের অন্ধকারে নির্জন পাহাড়ের এক চূড়ায় রেখে আসতে। সেখানে সাইকি অপেক্ষা করবে এমন এক স্বামীর জন্য, যার ভয়ে মানুষ তো তুচ্ছ, দেবতারা পর্যন্ত সর্বদা ভীত, বিচলিত। পৃথিবীর নির্জনতম স্থানে কিউপিড তৈরি করে রেখেছিলেন এক সুরম্য অট্টালিকা, সেখানেই মিলন হয়েছিল কিউপিড আর সাইকির। সাইকি তার স্বামীকে দেখলেন না। অন্ধকারেই তাদের মিলন হল। অদৃশ্য এই পুরুষ সাইকিকে এই গোপনতা বজায় রাখতে বলেছিলেন। কিন্তু সাইকি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে, স্বামীকে কুৎসিৎ সন্দেহ করে দেখে ফেললেন তাঁর ভুবনভোলানো রূপ। ফলে বিচ্ছেদ এল। অনেক কঠিন পরীক্ষার পর মিলন হয়েছিল কিউপিড আর সাইকির।[২৪২]

আমাদের অনুমান, রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকের অন্তরালে রয়েছে এই রোমান উপাখ্যানটি। 'রাজা' নাটকেও সুদর্শনা তার স্বামীকে না দেখেই ভালোবেসে ছিল। এই নাটকের শুরুতেই ছিল এক দৈববাণীর প্রসঙ্গ— 'মার কাছে শুনেছি তাঁকে এক দৈবজ্ঞ বলেছিল, তাঁর মেয়ে যাঁকে স্বামীরূপে পাবে তাঁর মতো পুরুষ আর নেই।'[২৪৩] সুদর্শনার ঘরে একদিনও আলো জ্বলত না। ঐ ঘর মাটির আবরণ ভেদ করে পৃথিবীর বুকের মাঝখানে তৈরি। রাজা এই ঘর কেবল সুদর্শনার জন্যই বিশেষভাবে নির্মাণ করিয়েছিলেন। সুরঙ্গমার মতে, রাজা যতই ভয়ঙ্কর ততই সুন্দর। আমাদের বক্তব্য রাজা কিউপিডেরই রাবীন্দ্রিক রূপ। রাজার সুগন্ধী বাসন্তী রঙের উত্তরীয়, কানে কুণ্ডল, হাতে অশোকের মঞ্জরী, তানে তানে তার বীণার সবকটি তার উতলা। লক্ষ লোকের মধ্যে যখন রাজাকে চিনে নেবার সময় আসে, তখন নির্ধারিত হয় বসন্তপূর্ণিমার দিনটি। অর্থাৎ, মদন উৎসবের দিন। সুদর্শনা বসন্তসখা মদনের পূজার পুষ্পে মহারাজার অভ্যর্থনা করেছিলেন। সব মিলিয়ে রাজাকে ঘিরে কিউপিড এবং মদনের মিলিত চালচিত্র তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু রাজা কালো, রাজা ভয়ানক, এইখানেই মিথকে মিথ্যে করে চলে আসে রাবীন্দ্রিক স্বকীয়তা। রূপে নয়, ভালোবাসায় ভোলাবার সংকল্পে শেষ হয় 'রাজা' নাটক। সবশেষে অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে যায়। রাজা আর সুদর্শনার জীবন ভরে ওঠে নতুন আলোয়। একটু মনোনিবেশ করলেই কিন্তু কিউপিড সাইকির এই উপাখ্যানটির সঙ্গে 'রাজা' নাটকের মিল খুঁজে পাওয়া কষ্টকর নয়।

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কাব্যনাট্য হল 'চিত্রাঙ্গদা'। এখানে মদন হলেন একটি বিশিষ্ট চরিত্র। তিনি এখানে মনসিজ। কারণ, মনের সব রহস্য তাঁর জানা। তাঁর নিজের কথায়—

> আমি সেই মনসিজ
> টেনে আনি জগতের নরনারী-হিয়া
> বেদনা বন্ধনে।[২৪৪]

'চিত্রাঙ্গদা'য় মদনের পঞ্চশরের পাঁচ রকম তাৎপর্য রয়েছে। এক একটি শরে হাসি, অশ্রু, আশা, ভয় এবং বিরহ-মিলন-আশা-ভয়-দুঃখ-সুখ সব পঞ্চম শরটিতে থাকে। চিত্রাঙ্গদার মদন কিন্তু নির্দয়। ভালোবাসা তাঁর কাছে 'রণ'। চিত্রাঙ্গদাকে তিনি উপদেশ দেন,

> থাক্। ভাঙিয়ো না খেলা! ... দয়া করিয়ো না/ ...অমৃত-বিষেতে আঁকা খর বাক্য বাণ হানো
> বুকে/শিকারের দয়ার বিধি নাই।[২৪৫]

ইংরেজি অনুবাদ হল 'Chitra'। সেখানে দেবতা মদনের পরিবর্তে Cupid-এর স্পষ্ট উল্লেখ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। হতে পারে, পাশ্চাত্যের পাঠক মদনের চেয়ে Cupid-কেই বেশি চিনবেন। তাই, বাংলা সাহিত্যের মদন ইংরেজি অনুবাদে Cupid-এ পরিণত হলেন।

রবীন্দ্রসাহিত্যে মদনের পুনরাবৃত্ত উপস্থিতির একটা কারণ হয়তো এই যে মদন প্রসঙ্গ ঠাকুরবাড়িতে বহুচর্চিত। 'মানময়ী' নাটকে কিশোর রবীন্দ্রনাথ নিজে মদনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ইন্দিরা দেবীও তাঁর স্মৃতিচারণার সূত্রে জানিয়েছেন যে বির্জিতলার বাড়ির বারান্দায় 'মায়ার খেলা'র অভিনয় হয়েছিল। মায়াকুমারীর চরিত্রের অভিনেত্রী পাওয়া না যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বসন্ত ও মদন সেজে গান গেয়েছিলেন। এমনটা হতেই পারে, রাবীন্দ্রিক মদনের নব রূপায়ণের অন্তরালে আসলে রয়ে যায় রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কবিসত্তা। যা রুক্ষ, কঠিন মনের প্রতিস্পর্ধী হয়ে বারবার অনঙ্গের মতোই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

কৃষ্ণ

কৃষ্ণ হলেন বৈষ্ণবদের উপাস্য দেবতা। দ্বিভুজ বংশীধারী প্রেমিক কৃষ্ণ যেমন আমাদের পরিচিত, তেমনি মহাভারতের কূটনীতিজ্ঞ, বুদ্ধিদীপ্ত কৃষ্ণ হিন্দুদের কাছে দেবতার মর্যাদা পেয়েছেন। ঋগ্বেদেও কৃষ্ণের উল্লেখ রয়েছে— কৃষ্ণ নামের এক ঋষি হিসেবে। ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রথম 'দেবকীনন্দন' কৃষ্ণের কথা জানা যায়। পুরাণে কৃষ্ণ হলেন বিষ্ণুর অষ্টম অবতার। পৌরাণিক কৃষ্ণ কংস থেকে শুরু করে পুতনা, বকাসুর, কালীয়নাগের মতো ভয়ানক অসুরদের বধ করেছিলেন। আঙুলের স্পর্শ-ডগায় গিরিগোবর্ধন ধারণ করে ইন্দ্রের অহংকার চূর্ণ করতে পেরেছিলেন। এরপরে শিশুপাল বধ এবং হস্তিনাপুরে কৌরবদের দমনের মতো ঘটনার মূল গুরুত্ব আমার সকলেই জানি।[২৪৬] দ্রৌপদীর সখা কৃষ্ণ, অর্জুনের মিত্র কৃষ্ণ এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দার্শনিক কৃষ্ণ হিন্দু সমাজের মন ও মননে জড়িয়ে আছে। কিন্তু বৈষ্ণবদের রাধাকৃষ্ণ এই সমাজের ভক্তি তথা প্রেমভাবনার শিকড়। পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ এবং অংশশক্তি রাধার মিলনের অন্তরালে জটিল বৈষ্ণব তত্ত্ব থাকতে পারে। কিন্তু এই তত্ত্বনিরপেক্ষ রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম সাধারণ জনসমানসে প্রভাব বিস্তার করেছিল। আরেক কৃষ্ণের ছবিও হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল। লৌকিক কৃষ্ণের ছবি। এই কৃষ্ণ লম্পট এবং প্রতারক। এই কৃষ্ণের ছবি যদুবংশের রাজা অবতার শ্রীকৃষ্ণের পৌরুষদীপ্ত চরিত্রের সঙ্গে মেলে না।

দুই

হিন্দুদের দেবসমাজে কৃষ্ণ হলেন প্রেমিক দেবতা। প্রেমিক কবি রবীন্দ্রনাথ সেই কারণে বিচিত্র প্রসঙ্গে কৃষ্ণের উল্লেখ করেছিলেন। 'ছবি ও গান' বইয়ের 'সুখের স্মৃতি' কবিতায় 'অতি দূরে বাজে ধীরে বাঁশি'।[২৪৭] মন উদাস করা এই বাঁশি যে বাজায়, সে নিশ্চয়ই কৃষ্ণ। এই বইটির 'মধ্যাহ্নে' কবিতায়

কবি নিজের ওপর কৃষ্ণসত্তা আরোপ করেছিলেন।—

সাধ যায় বাঁশি করে বন হতে বনান্তরে
চলে যাই আপনার মনে।[২৪৮]

'ভানুসিংহের পদাবলী'তে রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গই মুখ্য। এই কাব্যগ্রন্থ বৈষ্ণব পদাবলীর ব্রজবুলিতে লেখা পদগুলির অনুকরণে লেখা। কবি নিজেকে মঞ্জরীভাবের সাধক হিসেবে কল্পনা করেছিলেন। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রাধা ও কৃষ্ণের মিলন। 'কড়ি ও কোমল'-এর 'মথুরায়' কবিতায় আবার কবিসত্তা এবং কৃষ্ণসত্তা একাকার হয়েছে। মথুরার উপবন সেজে উঠলেও— 'বাঁশরি বাজাতে চাহি, বাঁশরি বাজিল কই?'[২৪৯] এই কৃষ্ণ ভাবনার অন্তরালে বিরহবোধ প্রধান। 'খেলা' কবিতাটিতে রাধাকৃষ্ণ রূপকল্প একটু অভিনব ভঙ্গিতে ধরা পড়েছিল।—

রাখাল ছেলের বাঁশি বাজে
সুদূর তরুছায়।
খেলতে খেলতে মেয়েটি তাই
খেলা ভুলে যায়।[২৫০]

'বাঁশি' কবিতাতেও কৃষ্ণ ইমেজ ফিরে আসে বনফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায়। 'বিরহ' কবিতায় কবি রাধার মতো মৃত্যু তথা কৃষ্ণের জন্য প্রতীক্ষা করেন—

আমি কার পথ চাহি এ জনম বাহি
কার দরশন যাচি রে!
যেন আসিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া
তাই আমি বসে আছি রে।[২৫১]

কবির কাছে প্রেমচেতনার, বিরহের মূর্ত বিগ্রহ হলেন রাধাকৃষ্ণ। 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষাযাপন' কবিতায় রাধার অভিসার প্রসঙ্গ কুঞ্জে অপেক্ষারত কৃষ্ণের কথা মনে করিয়ে দেয়। 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের 'পিয়াসী' কবিতায় কৃষ্ণের প্রতীক্ষারত ভঙ্গির সঙ্গে গোপবধূদের প্রসঙ্গ মিলিয়ে প্রকাশ করেছিলেন নিজের বিরহী হৃদয়। 'পসারিণী' কবিতায় পসারিণীর প্রতি কবির মন্তব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র 'ভারখণ্ড' মনে করিয়ে দেয়।—

ওগো পসারিণী,
মধ্যদিনে রুদ্ধ ঘরে সবাই বিশ্রাম করে,
দগ্ধ পথে উড়ে তপ্ত বালি
দাঁড়াও যেয়ো না আর, নামাও পসারভার
মোর হাতে দাও তব ডালি।[২৫২]

'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থে লঘু প্রেমের কবিতা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই কাব্যগ্রন্থের 'জন্মান্তর' কবিতায় কবি পরজন্মে 'ব্রজের রাখাল বালক' হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ননি ছানার গ্রামে, অশোক গাছের ছায়ায় ব্রজের গোপবালক হতে পারলে তিনি নবযুগের চালক হতেও চাইবেন না। 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের ৩১ সংখ্যক কবিতায় মোহন কৃষ্ণের কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এখানে 'বিশ্বমোহন' শব্দটি ব্যবহার

করেছিলেন:

তোমার ভুবন মাঝে ফিরি মুগ্ধমম
হে বিশ্বমোহন নাথ।[২৫৩]

'শিশু' কাব্যগ্রন্থের মেরুদণ্ডই হল মা ও ছেলের বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্য। প্রায় প্রতিটি কবিতাতেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষ্ণ-যশোদার রূপকল্প রয়েছে। আমরা 'খেলা' কবিতাটির উল্লেখ করতে পারি—

তাথেইথেই তালির সাথে
কাঁকন বাজে মায়ের হাতে,
রাখাল বেশে ধরেছ হেসে
বেণুর পাঁচনি।
কিসের সুখে সহাস মুখে
নাচিছ বাছনি।[২৫৪]

'শিশু' কাব্যগ্রন্থের মা-ছেলে, দুই ভাই এই রূপকল্পগুলি ফিরে ফিরে আসে। আমরা খুব সহজেই যশোদা-কৃষ্ণ এবং কানাই-বলাই নামের পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে তাদের ওপর আরোপ করতে পারি। 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের ৪ সংখ্যক কবিতায় বুদ্ধিদীপ্ত ইঙ্গিতে কৃষ্ণের প্রসঙ্গ আছে। এই কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ। যে কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য বাজিয়ে সত্যের যুদ্ধে আহ্বান করেন। কবি সেই শঙ্খকে অভয় শক্তি হিসেবে মনে করতে থাকেন—

বক্ষে আমার দুঃখে তব
বাজবে জয়ডঙ্ক।
দেব সকল শক্তি, লব
অভয় তব শঙ্খ।[২৫৫]

'বনবাণী'র 'নীলমনিলতা' কবিতায় আশ্চর্য সুন্দর ভাবে নীল কৃষ্ণের কথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—

তবে নীল লাবণ্যের বংশীধ্বনি দূর শূন্যে বাজে।[২৫৬]

'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থের 'বাঁশিওয়ালা' কবিতায় একজন শিল্পীকে কৃষ্ণের নির্মোক দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এখানে বাঁশিওয়ালার ডাক হল শিল্পের আহ্বান। সৌন্দর্যবোধও বলতে পারি। সেই কারণে, তার ডাক শুনে অন্ধকার গৃহকোণ থেকে বেরিয়ে আসে ঘোমটা খসা নারী। বাঁশির সুরের নিরাপদ দূরত্বে বসে অর্মত্যলোকের ডাক শোনে। 'জেগে ওঠে বিদ্রোহিণী।'[২৫৭]

'গীতাঞ্জলি'র 'পূজা' পর্যায়ের ৮২ সংখ্যক গানটিতে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে কৃষ্ণসখা মনে করেছিলেন—

সঙ্গে তারই চরাই ধেনু,
বাজাই বেণু।[২৫৮]

২২২ সংখ্যক গানে লিখেছিলেন—

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি, সে কি সহজ গান।
সেই সুরেতে জাগব মেতে, দাও মোরে সেই কান।[২৫৯]

কৃষ্ণের এক প্রচণ্ড শক্তিশালী মূর্তির নির্মাণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এই গানে।

৩৮১ সংখ্যক গানে বিরামহারা ঘরছাড়াকে ব্যাকুল বাঁশি আপনি ডাক দেয়। ৩৮৮ সংখ্যক গানেও কৃষ্ণ ও প্রেম একাকার হয়ে গেছে। ৫২০ সংখ্যক গানটি অত্যন্ত সুন্দর। এই গানে কৃষ্ণকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনের রাখাল' বলে সম্বোধন করেছিলেন। 'মহাগগনতলে' এই রাখাল বালক যেন সূর্য, তারা তথা আলোকধেনু চড়িয়ে বেরাচ্ছেন। কবি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তাঁর শক্তি। সেই কারণেই বুঝি লিখেছিলেন—

আশা তৃষা আমার যত ঘুরে বেড়ায় কোথায় কত
মোর জীবনের রাখাল ওগো ডাক দেবে কি সন্ধ্যা হলে?[২৬০]

৫৭০ সংখ্যক ('আমার বাঁশী তোমার হাতে...'), ৫৭১ সংখ্যক গান ('কখন পথের বাহির থেকে হঠাৎ বাঁশি যায় যে ডেকে...'), ৬০৩ সংখ্যক ('তোমার বাঁশি বাজাও আসি/ আমার প্রাণের অন্তঃপুরে।') গানেও একই ভাবে রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণচেতনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। 'প্রেম' পর্যায়ের ৫৬ সংখ্যক গানে কৃষ্ণের বাঁশির কথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।—

কুঞ্জবনের ভ্রমর বুঝি বাঁশির মাঝে গুঞ্জরে
বকুলগুলি আকুল হয়ে বাঁশির গানে মুঞ্জরে।
যমুনারই কলতান কানে আসে, কাঁদে প্রাণ—[২৬১]

৫৮ সংখ্যক গানে যে সুধাবচন, যে সুখপরশের উল্লেখ আছে সেই স্পর্শ এবং বাক্য কৃষ্ণের। যাঁর জন্য রাধার 'মন মানে না।' ৫৯ সংখ্যক গানেও কৃষ্ণমুখী এক বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল। কারণ, তখন রবীন্দ্রনাথের মনে ভর করেছিল রাধার সত্তা। সেই মন থেকে উচ্চারিত হয়েছিল অমোঘ বাক্য— 'মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে।' ১১৫ সংখ্যক এবং ১১৭, ১৪৪ সংখ্যক গানেও একই বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৪ সংখ্যক গানে কৃষ্ণকে 'চিরচেনা পরদেশী' বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ২২০ সংখ্যক গানে কৃষ্ণকে 'কিশোর' সম্বোধন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—

এসো গো এসো দোলবিলাসী বাণী তোমার দোলো
ছন্দে মোর চকিতে আসি মাতিয়ে তারে তোলো।[২৬২]

২৯৭ ('কী সুর বাজে আমার প্রাণে...'), ৩০০ ('ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে...'), ৩০১ ('কোন্ উদাসী দূরে বাজায় অলস বাঁশি...') ইত্যাদি গানগুলিতে প্রেমিক কৃষ্ণের ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। ৩০৫ সংখ্যক গানটিতে কৃষ্ণের বেদনা খুঁজে পাওয়া যায়।—

বাঁশরি বাজাতে চাহি, বাঁশরি বাজিল কই।[২৬৩]

৩৬৭ সংখ্যক গানে কৃষ্ণের বাঁশি এক 'অধরা মাধুরী'র ইঙ্গিত দেয়। ৩৭২ সংখ্যক গানে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি লক্ষ করা যায়।

বনে এমন ফুল ফুটেছে,

মান করে থাকা আজ কি সাজে।
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
চলো আজ কুঞ্জমাঝে।[২৬৪]

তিন

'অতিথি' গল্পের তারাপদ ছিল গৌরবর্ণের। তার বড়ো বড়ো চোখ এবং প্রসন্ন হাস্যময় ওষ্ঠাধরে ছিল একটি সুললিত সৌকুমার্য। তারাপদ সকলের স্নেহের। সে ঘর ছাড়লেও কেউ তার পর ছিল না। তারাপদ বাঁশি বাজাতে পারত। সোনামণি তারাপদকে যে বাঁশি বানিয়ে দিয়েছিল— এই কথা শোনামাত্র চারুশশী

> তারাপদর ঘরে গিয়ে তাহার শখের বাঁশিটি বাহির করিয়া তাহার উপর লাফাইয়া মাড়াইয়া সেটাকে নির্দয়ভাবে ভাঙিতে লাগিল।[২৬৫]

রবীন্দ্রনাথ তারাপদ চরিত্রটিকে ঘিরে তৈরি করেছিলেন কৃষ্ণের আর্কেটাইপ। তবে এই কৃষ্ণ শুভ্রবর্ণের। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটিতে মৃত্যু ও কৃষ্ণ একাকার হয়ে যায়। বিন্দুর মৃত্যুতে মৃণালের এক নতুন উপলব্ধি হল। তাঁর জীবনের যমুনাপারে প্রথম যেদিন 'মৃত্যুর বাঁশি' বেজেছিল সেদিন মৃণালের মনে প্রশ্ন জেগেছিল অনেক।

> কিন্তু মৃত্যুর বাঁশি বাজতে লাগলে— কোথায় রে রাজমিস্ত্রীর গড়া দেয়াল, কোথায় রে তোমাদের ঘোরো আইন দিয়ে গড়া কাঁটার বেড়া, কোন্ দুঃখে কোন্ অপমানে মানুষকে বন্দী করে রেখে দিতে পারে! ঐ তো মৃত্যুর হাতে জীবনের জয়পতাকা উড়ছে।[২৬৬]

আমরা বুঝতে পারি এই মৃত্যুর বাঁশি হল কৃষ্ণের বাঁশি। যখন এর ঠিক পরেই মীরাবাঈ-এর উল্লেখ করে মৃণাল, তখন আমাদের ধারণাটি আরো দৃঢ় হয়। এই কৃষ্ণ বদ্ধ মনের আগল ভাঙতে শেখায়। 'সমস্যাপূরণ' গল্পে ঝিঁকড়াকোটার জমিদার কৃষ্ণগোপাল সরকার কাশীতে থাকেন। এই নামটি কৃষ্ণের দেবত্ব স্মরণ করায়। কিন্তু তাঁর ঔরসে এক রমণীর গর্ভে অছিমুদ্দিনের জন্ম হয়েছিল। এই বিষয়টিতে তথাকথিত ধর্মীয় সংস্কার আহত হলেও লৌকিক কৃষ্ণের লাম্পট্য মনে পড়ে যায়। 'মানভঞ্জন' গল্পে নায়িকার নাম গিরিবালা এবং নায়ক হল গোপীনাথ। 'মানভঞ্জন' নামটির মধ্যেও রাধাকৃষ্ণের প্রণয়ের ইঙ্গিত আছে। কিন্তু গোপীনাথ লম্পট। তাই তাদের মিলন অসম্ভব। আবার গিরিবালা রাধার মতো হতে চায়। সুধো নামের দাসীকে দিয়ে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নির্জন ছাদের উপর গান গাওয়ায়—

দাসখত দিলেম লিখে শ্রীচরণে,
সকলে সাক্ষী থাকুক বৃন্দাবনে।[২৬৭]

'মণিহারা' গল্পে মণিমালিকাকে যে ঘর ছাড়ার পরামর্শ দেয়, তার নাম হল মধুসূদন। অর্থাৎ কৃষ্ণ। রবীন্দ্রসাহিত্যে মধুসূদন নামটির নেতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। যেমন, 'যোগাযোগ' উপন্যাসের মধুসূদন। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে কৃষ্ণ প্রসঙ্গ এবং বৈষ্ণব আবহাওয়া অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা গ্রহণ করে।

কুমুদিনীর মায়ের নাম ছিল নন্দরাণী, যার পিতৃগৃহ ছিল বৃন্দাবনে। মুকুন্দলাল মৃত্যুর মুহূর্তে কৃষ্ণের কথা স্মরণ করেছিলেন—

কার বাঁশি ওই বাজে বৃন্দাবনে।
সই লো সই,
ঘরে আমি রইব কেমনে![২৬৮]

কুমুদিনীর স্বামীর নাম মধুসূদন। কিন্তু তিনি দর্পের প্রতিমূর্তি, দর্পহারী নন। কুমুকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথ পার্বতীর রূপকল্প তৈরি করেছিলেন, ফলে তাঁর ও মধুসূদনের মনের মিল হবে না এইটিই ছিল অবশ্যম্ভাবী। অথচ, কুমু মানস বৃন্দাবনে অভিসারিণী ছিল। 'মনমোহন প্যারে'র উদ্দেশে সে ছিল নিবেদিত প্রাণ। কিন্তু তাঁর কৃষ্ণভাবনার সঙ্গে মধুসূদনের মিল হল না। নামের মিল সত্ত্বেও। তখনই মনে মনে কুমুদিনী আশ্রয় নিল গীতার দার্শনিক কৃষ্ণের কাছে। বিপন্ন মুহূর্তে নীরব জপের ধারা চলতে লাগল—

পিতেব পুত্রস্য সখেব সুখ্যঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্।[২৬৯]

এই উপন্যাসে লৌকিক কৃষ্ণের লাম্পট্য নয়, দার্শনিক কৃষ্ণের রক্ষক মূর্তি প্রকট হয়ে উঠল। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে শচীশ ও পুরন্দরের বাবার নাম হরিমোহন। তাঁর স্বভাব নীতিগতভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে কৃষ্ণের বাঁশিতে গৃহবধূ রাধার ব্যাকুল পরিস্থিতির সঙ্গে বিমলা নিজের পরিস্থিতির তুলনা করেছিল।

চার

'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র'-এ ষষ্ঠ পত্রটিতে রবীন্দ্রনাথ কৌতুক করে 'কৃষ্ণমূর্তি'র[২৭০] কথা লিখেছিলেন। বিদেশে থাকাকালীন নিজেদের গায়ের রঙ নিয়ে সঙ্কোচের কারণেই এই মন্তব্য। 'পঞ্চভূত' বইটির 'কৌতুকহাস্য' প্রবন্ধটিতে হুঁকা হাতে শ্রীকৃষ্ণের এক অভিনব মূর্তি খুঁজে পাওয়া যায়। সমীর ক্ষিতিকে একটি গানের কথা বলেন। সেই গানে, শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রাভঙ্গের পর সকালবেলা হুঁকা হাতে রাধার কুটীরে একটু অঙ্গারের প্রার্থনা করেছিল। রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণ মনস্তত্ত্বের একটি পরিচয় আমরা এই সূত্রে সমীরের মন্তব্য থেকে অনুমান করতে পারি। সমীর বলেছিল—

কিন্তু হুঁকা হস্তে শ্রীকৃষ্ণের কল্পনা সুন্দরও নহে কাহারো পক্ষে আনন্দজনকও নহে—[২৭১]

অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ বংশীধারী কৃষ্ণের মোহনরূপটিকেই গ্রহণযোগ্য মনে করেছিলেন। একই বইয়ের 'সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ' প্রবন্ধে সমীর কৃষ্ণের কথা বলে। যেটাকে উপলক্ষ করে আমরা প্রেম বা ভক্তির উপভোগ অথবা সাধনা করে থাকি সেই উপলক্ষটাকে আমরা সম্পূর্ণ ও স্বাভাবিক করে

তুলতে দায়বদ্ধ থাকি— এমনটাই ছিল সমীরের বক্তব্য। সেই কারণে মানুষের ঘননীলবর্ণ আমাদের কাছে সুন্দর মনে না হলেও 'ঘননীলবর্ণে চিত্রিত কৃষ্ণের মূর্তিকে সুন্দর বলিয়া ধারণা করিতে আমাদিগকে কিছুমাত্র প্রয়াস পাইতে হয় না।' 'আলোচনা' বইটিতে 'বৈষ্ণব কবির গান' প্রবন্ধের 'বাঁশির স্বর' অংশে লিখেছিলেন— 'সৌন্দর্য স্বরূপের হাতে সমস্ত জগৎই একটি বাঁশি।'[২৭২] কৃষ্ণ তাঁর কাছে সৌন্দর্যস্বরূপ। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন অসীম সৌন্দর্যের আহ্বান আমাদের সকলের কানেই আসে।—

> কে বাঁশি বাজাইয়া আমাদের মন হরণ করিল, তাহাকে দেখিতে পাই না; সংসারের ঘরে ঘরে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াই। অন্য যাহারই সহিত মিলন হউক না কেন, সেই মিলনের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী বিরহের ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে।[২৭৩]

'লোকসাহিত্য' বইটির 'কবিসংগীত' প্রবন্ধে লিখেছিলেন কবিওয়ালাদের গানে 'কৃষ্ণের উপরেও শ্রদ্ধা হয় না।'[২৭৪] একই বইয়ের 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধে লিখেছিলেন— 'কৃষ্ণরাধা বিষয়ে বাঙালির ভাবের কথা ব্যক্ত করিতেছে।'[২৭৫]

'সাহিত্যের স্বরূপ' বইটির 'সাহিত্যে চিত্রবিভাগ' প্রবন্ধে শিশুকৃষ্ণের ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। সেই শিশুকৃষ্ণ 'আমাদের ঘরের ছেলে'।[২৭৬] 'সাহিত্য' বইয়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রবন্ধে ঐতিহাসিক মিথ্যার সূত্রে রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলেন এভাবে—

> মনে করো আজ যদি নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় যে, সুরাসক্ত অনাচারী যদুবংশ গ্রীকজাতীয় এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বাধীন বনবিহারী বংশীবাদক গ্রীসীয় রাখাল, যদি জানা যায় যে তাঁহার বর্ণ জ্যেষ্ঠ বলদেবের বর্ণের ন্যায় শুভ্র ছিল, যদি স্থির হয় নির্বাসিত অর্জুন এশিয়া-মাইনরের কোনো গ্রীক রাজ্য হইতে য়ুনানী রাজকন্যা সুভদ্রাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং দ্বারকা সমুদ্র তীরবর্তী কোনো গ্রীক উপদ্বীপ। যদি প্রমাণ হয় নির্বাসনকালে পাণ্ডবগণ বিশেষ রণবিজ্ঞানবেত্তা প্রতিভাশালী গ্রীসীয় বীর কৃষ্ণের সহায়তা লাভ করিয়া স্বরাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাঁহার অপূর্ব বিজাতীয় রাজনীতি, যুদ্ধনৈপুণ্য এবং কর্মপ্রধান ধর্মতত্ত্ব বিস্মিত ভারতবর্ষে তাঁহাকে অবতার রূপে দাঁড় করাইয়াছে— তথাপি বেদব্যাসের মহাভারত বিলুপ্ত হইবে না এবং কোনো নবীন কবি সাহসপূর্বক কালাকে গোরা করিতে পারিবে না।[২৭৭]

এখানে কৃষ্ণ সম্পর্কে সিদ্ধ মিথকেই সমর্থন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'সাহিত্য' বইটির 'বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জগতের সত্যের সঙ্গে তিন রকম যোগের কথা লিখেছিলেন— বুদ্ধির যোগ, প্রয়োজনের যোগ এবং আনন্দের যোগ। আনন্দের যোগের প্রসঙ্গে কৃষ্ণের উল্লেখ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—

> এই সৌন্দর্যের বা আনন্দের যোগে সমস্ত পার্থক্য ঘুচিয়া যায়; সেখানে আর অহংকার থাকে না; সেখানে নিতান্ত ছোটোর কাছে, দুর্বলের কাছে আপনাকে একেবারে সঁপিয়া দিতে আমাদের কিছুই বাধে না। সেখানে মথুরার রাজা বৃন্দাবনের গোয়ালিনীর কাছে আপনার রাজমর্যাদা লুকাইবার আর পথ পায় না।[২৭৮]

এই প্রবন্ধে মথুরার রাজা কৃষ্ণ এবং গোয়ালিনী রাধার প্রেমকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

'জাভাযাত্রীর পত্র'-এ ৭ সংখ্যক পত্রটিতে কৃষ্ণের রাজকীয় মহিমার উল্লেখ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই প্রবন্ধ অনুসারে কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রবর্তন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণ প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধে একটি নতুন কথা লিখেছিলেন—

> ভারতবর্ষে একটা দ্বন্দ্ব ছিল অরণ্যের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রের, আর একটা দ্বন্দ্ব বেদের ধর্মের সঙ্গে কৃষ্ণের ধর্মের। লঙ্কা ছিল অনার্যশক্তির পুরী, সেইখানে আর্যের হল জয়; কুরুক্ষেত্র ছিল কৃষ্ণবিরোধী কৌরবের ক্ষেত্র, সেইখানে কৃষ্ণভক্ত পাণ্ডব জয়ী হলেন।[২৭৯]

'জাপানযাত্রী' প্রবন্ধের ৭ সংখ্যক প্রবন্ধটিতে কৃষ্ণ, অভিসার এবং মনোহরণ বাঁশির প্রসঙ্গ আছে। এখানে কৃষ্ণ হলেন কালো 'অনন্ত'। রাধা হলেন 'শুভ্র জ্যোতির্ময়ী আনন্দমূর্তি'। এক 'কালোর বাঁশি'র সুরের কথাও আছে প্রবন্ধটিতে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> মানুষের মধ্যে যে-সব মহাজাতি কুলত্যাগিনী তারাই এগচ্ছে, ভয়ের ভিতর থেকে অভয়ে, বিপদের ভিতর দিয়ে সম্পদে। যারা সর্বনাশা কালোর বাঁশি শুনতে পেলে না তারা কেবল পুঁথির নজির জড়ো করে কুল আঁকড়ে বসে রইল, তারা কেবল শাসন মানতেই আছে।[২৮০]

এই প্রবন্ধেই কালো সমুদ্রের কথা বললেন রবীন্দ্রনাথ। কালো কৃষ্ণ আর কালো সমুদ্রকে অনন্তের সূত্রে মিলিয়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে লিখেছিলেন 'ছেলেবেলা'। সেখানেও তাঁর স্মৃতিচারণে উঠে এসেছিল ব্রাহ্ম পরিবারের অন্দরমহল শিশু রবীন্দ্রনাথের 'রাধাকৃষ্ণ' বলার স্মৃতি—

> আমাদের পালোয়ান জমাদার সোভারাম থেকে থেকে বাঁও কষত, মুগুর ভাঁজত মস্ত ওজনের, বসে বসে সিদ্ধি ঘুঁটত, কখনো বা কাঁচা শাকসুদ্ধ মুলো খেত আরামে আর আমরা তার কানের কাছে চীৎকার করে উঠতুম 'রাধাকৃষ্ণ'। সে যতই হাঁ হাঁ করে দুহাত তুলত আমাদের জেদ ততই বেড়ে উঠত। ইষ্টদেবতার নাম শোনবার জন্যে ঐ ছিল তার ফন্দি।[২৮১]

পাঁচ

'শারদোৎসব' নাটকের প্রথম দৃশ্যের প্রথম গানে যে রাখাল ছেলের উল্লেখ আছে সে আমাদের চিরপরিচিত ব্রজের রাখাল।—

> রাখালছেলের সঙ্গে ধেনু
> চরাবো আজ বাজিয়ে বেণু,
> মাখব গায়ে ফুলের রেণু
> চাঁপার বনে লুটি।[২৮২]

'হাস্যকৌতুক' এর প্রথম নাটক 'ছাত্রের পরীক্ষা'। এই নাটকে দুটি চরিত্র— মধুসূদন ও কালাচাঁদ। 'পেটে ও পিঠে' নাটকের একটি চরিত্র বনমালী। 'ভাব ও অভাব' নাটকের একটি চরিত্র হল কুঞ্জবিহারী। 'একান্নবর্তী' নাটকের অন্যতম চরিত্র হল কানাই। 'অন্ত্যেষ্টি সৎকার'-এর মূল চরিত্রের নাম কৃষ্ণকিশোর, সংক্ষেপে কৃষ্ণ। অর্থাৎ সমস্ত নাটকে এতগুলি নাম কৃষ্ণের সমার্থক। রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবেই এই এতগুলি কৃষ্ণ নাম ব্যবহার করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রেমিক কবি। তিনি একইসঙ্গে দার্শনিক। তাঁর কৃষ্ণচেতনাও প্রেমচেতনার সঙ্গে একই সূত্রে গাঁথা। সেইসঙ্গে কৃষ্ণের সঙ্গে অনন্ত ও অসীমের ধারণাকে মিলিয়ে 'দূরদেশী সেই রাখালছেলে'কে নিজের সাহিত্যের দেবলোকে রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসন।

ঊষা

ঊষা ঋগ্বেদের দেবী। ঋগ্বেদের কুড়িটি সূক্তে তাঁকে স্তুতি করা হয়েছিল। জ্যোতির্বসনা এই দেবী চিরযৌবনা এবং সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি। তিনি প্রজাপতির মেয়ে। প্রজাপতি চন্দ্রের সঙ্গে ঊষার বিয়ে ঠিক করতে চেয়েছিলেন। তখন অন্য দেবতারা ঊষার পাণিপ্রার্থী হয়ে পড়েন। তখন প্রজাপতি ঘোষণা করেছিলেন অনন্ত আকাশপথ অনুধাবনে যিনি কৃতকার্য হবেন এবং যিনি সঙ্গে সঙ্গে যত বেশি বেদসূক্ত উচ্চারণ করতে পারবেন, তাঁর হাতেই ঊষাকে সমর্পণ করবেন প্রজাপতি। এই শর্তপূরণে সফল হয়ে ঊষাকে লাভ করেন। সূর্য ও ঊষার বিচিত্র সম্পর্কের কথা ঋগ্বেদে আছে। একদিকে ঊষা সূর্যের প্রণয়িনী তথা বন্ধু, অন্যদিকে ঊষা হলেন সূর্যের মা। ঊষা হলেন দীপ্তিমতী ও শুভ্রবর্ণা। গ্রিকদেবী এথেনার সঙ্গে বৈদিক ঊষার আংশিক মিল রয়েছে।[২৮৩]

দুই

রবীন্দ্রসাহিত্যে বৈদিক ঊষার উল্লেখ খুব সামান্য হলেও রয়েছে। 'কবিকাহিনী'র প্রথম সর্গে ঊষার উল্লেখ আছে। নিশীথের শিশিরাশ্রু জলে 'ঊষাদেবী'র 'সুরভি নিশ্বাস'-এর কথা কবিতায় স্পষ্ট লেখা আছে। সেইসঙ্গে বৈদিক ঊষার একটি ছবিও পাওয়া যায়—

> স্বর্ণময় জলদের সোপানে সোপানে
> উঠিছেন ঊষাদেবী হাসিয়া হাসিয়া।[২৮৪]

এই সূত্রেই কবি যখন নিশাদেবীর উল্লেখ করেছিলেন তখন বোঝা যায়, রাত্রি ও ঊষার বৈদিক সম্পর্ক এই পঙ্‌ক্তিগুলির মূল ভিত্তি। রবীন্দ্রনাথের লেখা অনুবাদ কবিতাগুলিতেও ঊষার প্রসঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন,

> বহু ঊষা আজ হয়নি উদিত, সেসব ঊষার মাঝে,
> আমার জীবন করিয়া পালন লাগাও তোমার কাজে।[২৮৫]

অনুবাদটি মূলত ছিল বরুণদেবকে উদ্দেশ্য করে। কিন্তু ঊষার ভোরের আলো মাখা রূপটির সঙ্গে এই কবিতার 'ঊষা'র মিল খুঁজে পাওয়া যায়। 'লেখন' কাব্যগ্রন্থের কবিতাতেও সূর্য ও ঊষার সম্পর্কে প্রচলিত পৌরাণিক মিথটি খুঁজে পাওয়া যায়। নানারঙের ফুলের মতো ঊষা মিলিয়ে গেলে, শুভ্র ফলের

মতোন সূর্য সগৌরবে জেগে ওঠেন— কবিতাটির প্রতিপাদ্য বিষয় এইটিই। এর অনুবাদটিও লক্ষ করার মতো—

> Dawn—the many coloured flower fades and the sun comes old; the fruit of the simple white light.[২৮৬]

এই কাব্যগ্রন্থেরই আরেকটি কবিতায় ঊষা ও সূর্যের অপরিপূর্ণ সম্পর্কের ইঙ্গিত রয়েছে।

> ঊষা একা একা আঁধারের দ্বারে ঝংকারে বীণাখানি,
> যেমনি সূর্য বাহিরিয়া আসে মিলায় ঘোমটা টানি।[২৮৭]

এইটির অনুবাদটিও উল্লেখ করা যাক—

> Dawn plays her lute before the gate of darkness.
> till the sun comes old and sees her vanish.[২৮৮]

'লেখন'-এর অন্য একটি কবিতায় শুকতারা মনে করে অরুণের আলো বুঝি তার একার, ঊষা সব স্বত্ব ছেড়ে দিয়ে বলে, 'ভালো, সেই ভালো।'[২৮৯]

'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'শিশুতীর্থ' কবিতায় মেরি ও যীশুর উপমান হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছিলেন ঊষা ও শুকতারাকে।[২৯০] রবীন্দ্রসাহিত্যে ঊষা হলেন মূর্তিমতী পবিত্রতা। 'পয়লা আশ্বিন' কবিতায় খুব সুন্দরভাবে ঊষার উল্লেখ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—

> তপস্বিনী উষার পরা পুজোর চেলির গন্ধ যেন
> আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।[২৯১]

এখানে ঊষার ওপর আরোপিত হয়েছে পার্বতীর ছায়া। 'বিচিত্রিতা' কাব্যগ্রন্থের 'দান' কবিতায় ঊষার প্রতি এক অজানা প্রেমিকের প্রচ্ছন্ন ভালোবাসার ইঙ্গিত দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—

> হে ঊষা তরুণী,
> নিশীতের সিন্ধুতীরে নিঃশব্দের মন্ত্রস্বর শুনি
> যেমনি উঠিলে জেগে, দেখিলে তোমার শয্যাশেষে
> তোমারি উদ্দেশে
> রেখেছে ফুলের ডালি
> শিশিরে প্রক্ষালি
> কোন্ মহা অন্ধকারে কে প্রেমিক প্রচ্ছন্ন সুন্দর।[২৯২]

আমাদের মনে হয়, মহাঅন্ধকারে, সুপ্তিঢাকা রাতের যে প্রেমিক সে চন্দ্র। ঊষার পিতা প্রজাপতি প্রথমে চন্দ্রের সঙ্গেই ঊষার পরিণয় ঘটাতে চেয়েছিলেন। এই কবিতায় ঊষা ও চন্দ্রের সেই পরিণতি না পাওয়া সম্পর্কের ইঙ্গিত থাকতে পারে। 'শ্যামলী'র 'দ্বৈত' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নিজের মানসীর কথা বলতে গিয়ে ঊষার কথা বলেন।—

> ঊষা তখন আপন ভোলা—

যখন যে পায়নি আপন ডাক নামটি পাখির ডাকে,
পাহাড়ের চূড়ায়, মেঘের লিখনপত্রে।
তারপরে সে নেমে আসে ধরাতলে
তার মুখের উপর থেকে
অসীমের ছায়া ঘোমটা খসে পড়ে
উদয় সাগরের অরুণরাঙা কিনারায়।
পৃথিবী তাকে সাজিয়ে তোলে
আপন সবুজ সোনার কাঁচলি দিয়ে,
পরায় তাকে আপন হাওয়ার চুনরি।
তেমনি তুমি এনেছিলেন তোমার ছবির অনুরেখাটুকু
আমার হৃদয়ের দিক্ প্রান্তপটে।[২৯৩]

মাটির পৃথিবীর অধরামাধুরী আর প্রেমিকের অধরা ঊষা কোথায় যেন একাকার হয়ে যায়। 'লেখন' কাব্যগ্রন্থে কবি ঊষার হাতে বীণা দিয়েছিলেন, 'গীতাঞ্জলি'র 'পূজা' পর্যায়ের ৩৩৬ সংখ্যক গানেও লিখলেন—

বাজায় ঊষা নিশীথকুলে যে গীতভাষা
সে ধ্বনি নিয়ে জাগিবে মোর নবীন আশা।[২৯৪]

'যোগাযোগ' উপন্যাসে কুমুদিনীর রূপ বর্ণনা করতে ঊষার সৌন্দর্যের উল্লেখ করেছিলেন কথক রবীন্দ্রনাথ— 'কিন্তু কি সুন্দর। কী এক দীপ্যমান শুচিতা, শুভ্রতা, যেন নির্জন তুষার শিখরের উপর নির্মল উষা দেখা দিয়েছে।'[২৯৫] 'সমাপ্তি' গল্পে রাত্রি ও উষার মাতা-কন্যা সম্পর্কের ইঙ্গিত আছে।—

'হারমোনিয়াম শিক্ষা' বহির সঙ্গে একখানি পরিপূর্ণর খাতা নিশীথ গর্ভে ভাবী উষার ন্যায় প্রকাশের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে।[২৯৬]

ঋগ্বেদের অসংখ্য শ্লোকের মধ্যে মাত্র কয়েকটিতে দেবী ঊষার স্তুতি রয়েছে। রবীন্দ্রনাথও খুব অল্প ক্ষেত্রে ঊষার উল্লেখ করেছেন। দেবী ঊষার মিথটিকে প্রেমিক কবি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছিলেন অচরিতার্থ প্রেমের সার্থক উপমান হিসেবে।

সরস্বতী

বেদে দেবী সরস্বতীকে যজ্ঞাগ্নি বলা হত। তাঁকে সূর্যের শক্তি বা তেজও মনে করা হত। বেদে বাগ্‌দেবী হিসেবে দেবী সরস্বতীর দেখা পাওয়া যায় না। বেদে সরস্বতী সম্বন্ধে তিনটি সার্থক সম্বোধন প্রযুক্ত হয়েছে। এখানে তিনি দেবীশ্রেষ্ঠা, মাতৃশ্রেষ্ঠা এবং নদীশ্রেষ্ঠা। নদী কেবল জলের আধার নয়। নাদেরও উৎস। বাক্‌দেবী সরস্বতী তাই নিত্য সঙ্গীতময়ী। দেবী সরস্বতী হলেন সর্বশুক্লা। হাতে পুস্তক ও লেখনি। পুরাণে দেবী সরস্বতী হলেন বাক্য, বুদ্ধি, বিদ্যা, জ্ঞান প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। পুরাণে তাকে নারায়ণের পত্নী বলা হয়েছে। নদীরূপে তিনি হলেন ব্রহ্মার স্ত্রী। মেধা ও সৃজনী শক্তি রূপে তিনি মানুষের মনে

প্রথম প্রেরণার সঞ্চার করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁকে কবিদের রসনায় অবস্থান করার বর দেন। কিন্তু দেবী সরস্বতী আদি কবি বাল্মীকিকে বেছে নিয়েছিলেন। ক্রৌঞ্চমিথুনের শোকে বাল্মীকির সংবেদনশীল মনের প্রকাশ ঘটেছিল দেবী সরস্বতীর প্রেরণায়— এমনটাই লোকবিশ্বাস। শোক থেকে জন্ম নিয়েছিল সেই বিখ্যাত শ্লোক—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাংত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধী কামমোহিতম্।।

বায়ুপুরাণে সরস্বতী হলেন ব্রহ্মার কন্যা। আবার, তাঁরা দুজনে একই সঙ্গে প্রজা সৃষ্টি করেন। তন্ত্রশাস্ত্রে মাতৃকাশক্তিও বলা হয় সরস্বতীকে। গ্রিক দেবী এথেনা ও মিউজদের সঙ্গে দেবী সরস্বতীর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর বাহন হল শ্বেতহংস।[২৯৭]

দুই

হিন্দুমেলায় পাঠ করা একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রথম লিখেছিলেন নদীরূপা সরস্বতীর কথা—

তুমি শুনিয়াছ সরস্বতীকূলে,
আর্যকবি গায় মনপ্রাণ খুলে।[২৯৮]

'প্রকৃতির খেদ' কবিতায় নদী সরস্বতীর প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—

ঋষিগণ সমস্বরে
এই সামগান করে
....সরস্বতী নদীকূলে[২৯৯]

এই কবিতাতেই মধুর স্বরে মুখরিত বীণার কথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'শৈশবসঙ্গীত'-এর 'ভারতী বন্দনা' কবিতায় জননী রূপে দেবী সরস্বতীর কথা লিখেছিলেন। ভারতীর শোভা দেখে— 'ফুটিয়া উঠিবে শতেক কুসুম' এবং 'গাহিয়া উঠিবে শতেক পিক'। 'মানসী' পর্বে এসে সরস্বতীর মাতৃমূর্তি আর খুঁজে পাওয়া গেল না। 'কুহুধ্বনি' কবিতায় পৃথিবীর বুকের কাছে যে 'সরলা সুন্দরী' বসে থাকেন, তিনিই সরস্বতী।—

যেন সেই রূপবতী সংগীতের সরস্বতী
সম্মোহন বীণা করে ধরি—
সুকুমার কর্ণে তার ব্যথা দেয় অনিবার
গণ্ডগোল দিবসে নিশীথে,
জটিল সে বঞ্চনায় বাঁধিয়া তুলিতে চায়
সৌন্দর্যের সরলসঙ্গীত।[৩০০]

'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'মানসসুন্দরী' কবিতায় সেই সরস্বতীই হয়ে ওঠেন কবির প্রেরণা, তাঁর প্রাণপ্রতিমা। বীণা ফেলে দিয়ে দুটি রিক্ত হাতে কবির কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে কবিকে তিনি প্রেরণা দেবেন—

এমনটাই কবির অভিলাষ।

বীণা ফেলে দিয়ে এসো, মানসসুন্দরী,
দুটি রিক্ত হস্ত শুধু আলিঙ্গনে ভরি
জড়াইয়া দাও, কণ্ঠে— মৃণাল পরশে
রোমাঞ্চ অঙ্কুরি উঠে মর্মান্ত হরষে।[৩০১]

'পুরস্কার' কবিতাতেও শুক্লা সরস্বতীর বন্দনা করেছিলেন কবি। এই কবিতার শেষে কবির বিজয়মাল্য গলায় পরেছিল কবির গৃহলক্ষ্মী। আর সেই মুহূর্তে কবির মনে হয়েছিল 'বাঁধা পল এক মাল্য-বাঁধনে লক্ষ্মী-সরস্বতী।'[৩০২] 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্যামী কবিতায় দেবী সরস্বতীর অবয়বেই কবির জীবনদেবতা আবির্ভূত হয়েছিলেন। কবি যেন তাঁর বীণাযন্ত্র।—

আমি কি গো বীণাযন্ত্র তোমার,
ব্যথায় পীড়িয়া হৃদয়ের তার
মূর্ছনা ভরে গীতঝঙ্কার
ধ্বনিছ মর্মমাঝে?
আমার মাঝারে করিছ রচনা
অসীম বিরহ, অপার বাসনা,
কিসের লাগিয়া বিশ্ববেদনা
মোর বেদনায় বাজে?
মোর প্রেমে দিয়ে তোমার রাগিনী
কহিতেছ কোন অনাদি কাহিনী
কঠিন আঘাতে ওগো মায়াবিনী
জাগাও গভীর সুর।[৩০৩]

'সাধনা' কবিতায় দেবীকে 'ছিন্নতন্ত্রী এক দীন হীন বীণা' উপহার দিতে চেয়েছিলেন কবি। আর কিছু নয়, স্তবহীন হয়ে, বুকের ধনের মতো এই যন্ত্রটি নিয়ে কবি সরস্বতীকে তা উপহার দিলেন। 'নীরব তন্ত্রী' কবিতাতেও একইভাবে দেবীকে বীণা উপহার দিয়েছিলেন কথক কবি। 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থের নয় সংখ্যক কবিতায় লক্ষ্মী-সরস্বতীর যুগলমূর্তি কল্পনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

...স্নেহাতুর হিয়া
নিখিল নারীর চিত্তে গিয়েছে লাগিয়া।
সেই বিশ্বমূর্তি তব আমারই অন্তরে
লক্ষ্মী সরস্বতী রূপে পূর্ণরূপ ধরে।[৩০৪]

'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের 'একাকী' কবিতায় এক মহাশ্বেতা, তপস্বিনী দেবীর কথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের অনুমান, এই দেবী সরস্বতী, কবির একাকিত্বের সঙ্গী, প্রেরণাস্বরূপ।

'গীতাঞ্জলি'র ১১ সংখ্যক গানটিতে রবীন্দ্রনাথ শারদলক্ষ্মীর কথা লিখেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি লেখেন—

ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে
তোমার চরণমূলে।

গুঞ্জরতান তুলিয়ো তোমার
সোনার বীণার তারে
মৃদু মধু ঝংকারে,
হাসিঢালা সুর গলিয়া পড়িবে
ক্ষণিক অশ্রুধারে।[৩০৫]

তখন, 'বীণা' এবং 'মরাল' কল্পনা শারদলক্ষ্মীর ওপর সরস্বতীর রূপকল্প আরোপ করে।

'গীতিমাল্য'-এর ৫০ সংখ্যক গানে দেবীর সুরে সুর মিলাবার জন্য কবি বীণাযন্ত্র চেয়েছিলেন—

গাব তোমার সুরে
দাও সে বীণাযন্ত্র।
শুনব তোমার বাণী
দাও সে অমর মন্ত্র।[৩০৬]

৫১ সংখ্যক গানে সরস্বতীর রূপকল্প খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে আবার বীণাবাদিনীকে 'প্রভু' সম্বোধন করা হয়েছে। 'গীতালি'র ৫৫ সংখ্যক গানেও সরস্বতীকে 'প্রভু' বলা হয়েছে। তার সঙ্গে অগ্নিবীণার উল্লেখ সেই সরস্বতীর কথা মনে করিয়ে দেয়, যিনি বেদের যুগে সূর্যের জ্যোতি ছিলেন। '৮৫' এবং '৯৩' সংখ্যক গানেও আছে সরস্বতী প্রসঙ্গ। 'গীতবিতান'-এর ২০৯ সংখ্যক গানে এক দেবীকে উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

যখন তুমি বাঁধছিলে তার সে যে বিষম ব্যথা
বাজাও বীণা ভুলাও ভুলাও সকল দুখের কথা।[৩০৭]

'৪০৯' সংখ্যক গানে সরস্বতীর বীণার প্রসঙ্গ আসে। 'প্রেম' পর্যায়ের ২৯ সংখ্যক গানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে
আমার নিভৃত নব জীবন পরে।[৩০৮]

৩৩ সংখ্যক গানে লিখেছিলেন—

আমারে কর তোমার বীণা, লহো গো লহো তুলে,
উঠবে বাজি তন্ত্রীরাজি মোহন অঙ্গুলে।[৩০৯]

তিন

উপন্যাস ও ছোটোগল্পগুলিতে বিদ্যা, জ্ঞান ও শিল্পের অধিষ্ঠাত্রীদেবীকে খুঁজে পাওয়া যায়। শিল্পচর্চায় এতটুকু অসঙ্গতি সরস্বতীকে কষ্ট দেয়। 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে রমেশ একদিন নির্জন অবকাশে অন্নদাবাবুর ঘরে বেহালা নিয়ে ছড়ির একটি টান মাত্র আঘাতে—

> সরস্বতী এমনি আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাহার পক্ষে বেহালাচর্চা নিতান্ত নিষ্ঠুরতা হইবে বলিয়া সে আশা সে পরিত্যাগ করে।[৩১০]

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে বিমলা সন্দীপের বক্তৃতা শুনে মনে মনে ভেবেছিল—

> আমার মন বললে, আমরাই চোখের শিখায় এই আগুন ধরিয়ে দিলে। আমরা কি কেবল লক্ষ্মী, আমরাই তো ভারতী।[৩১১]

রবীন্দ্র উপন্যাসের নায়িকারা শুধু লক্ষ্মী ছিলেন না, সরস্বতী রূপে জ্ঞানের জ্যোতিতে উজ্জ্বল ছিলেন। 'মনিহারা' গল্পে ফণীভূষণের ঘরে লক্ষ্মী-সরস্বতীর জোড়া ছবি টাঙানো ছিল। হতে পারে রবীন্দ্রনাথের মনের আদর্শ গৃহিণীর রূপ ওই ছবিটিতে প্রতিফলিত হয়েছিল। 'পয়লা নম্বর' গল্পে কথক রবীন্দ্রনাথ সরস্বতীর সাধকদের কথা লিখেছিলেন। এরা শিল্পসাধক, তাই কলেজের বাইরে সরস্বতীর যে বীণা বাজে তার ডাকেও তারা উতলা হয়ে ওঠে। পুথিগত বিদ্যার বাইরে যে জ্ঞান ও শিল্পের পৃথিবী এই দেবী শিল্পসাধকদের অধিষ্ঠাত্রী। 'খাতা' গল্পে অন্তঃপুরে সরস্বতীর গোপন সমাগম না হওয়ার বেদনা স্পষ্ট— হয়ে উঠেছে। 'জয়পরাজয়' গল্পে শেখর ব্যঙ্গ করে শ্বেতভুজা বীণাপাণিকে মল্লভূমিতে দাঁড়াবার কথা লিখেছিলেন।[৩১২]

চার

'আধুনিক সাহিত্য' বইতে 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে বাংলা ভাষার উন্নতি বোঝাতে গিয়ে সরস্বতীর বীণাযন্ত্রের উল্লেখ করেছিলেন।

> বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন।[৩১৩]

এই বইয়েরই 'বিহারীলাল' প্রবন্ধের সরস্বতীভাবনা রবীন্দ্রনাথের মনে সরস্বতী ভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে সরস্বতী সম্বন্ধে সাধারণত পাঠকের মনে যেরূপ ধারণা আছে কবির সরস্বতী তা থেকে স্বতন্ত্র। বিহারীলালের সরস্বতী কখনো জননী, কখনো প্রেয়সী, কখনো কন্যা। তিনি সৌন্দর্যরূপে জগতের অভ্যন্তরে বিরাজ করেন এবং দয়া, স্নেহ, প্রেমে মানুষের মনকে বিচলিত করেন। শেলির 'Spirit of Beauty' এবং বিহারীলালের সরস্বতীকে তুলনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন 'বাল্মীকি প্রতিভা' নাটকের মূল ভাবটি এমনকি তার ভাষা পর্যন্ত বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল'-এর আরম্ভভাগ থেকে গৃহীত। রাবীন্দ্রিক সরস্বতী শালীনতা ও প্রেরণার প্রতিমূর্তি। সেই কারণেই 'লোকসাহিত্য'-এর 'কবিসংগীত' প্রবন্ধে কবিওয়ালাদের সরস্বতী সাধনার পক্ষে ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ। চার জোড়া ঢোল, চার খানা কাঁসি এবং সম্মিলিত কণ্ঠের প্রাণপণ চিৎকারে যে বিজনবিলাসিনী সরস্বতী তেমন সভায় বেশিক্ষণ টিঁকতে পারে না— একথা ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।[৩১৪] সরস্বতীকে পুজো করার অধিকার অরসিকের নেই। রসিক গুণীজন অন্য ধর্মের হলেও সরস্বতীর সাধনা করতে পারেন। অনেকটা এমন কথাই তিনি 'সাহিত্যের

পথে' বইটির 'সাহিত্য সম্মিলন' প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

> সাহিত্যে যদি সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিভেদ থাকিত তবে গ্রীকসাহিত্যে গ্রীক দেবতার লীলার কথা পড়িতে গেলেও আমাদের ধর্মহানি হইতে পারিত। মধুসূদন দত্ত খৃষ্টান ছিলেন। তিনি শ্বেতভূজা ভারতীয় যে বন্দনা করিয়াছেন, সে সাহিত্যিক বন্দনা, তাহাতে কবির ঐহিক পারত্রিক লোকসানের কোনো কারণ ঘটে না।[৩১৫]

এই বইটির 'বাস্তব' প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে নলের গলায় যেমন দময়ন্তী মালা দিয়েছিলেন, রসভারতী তেমনি সকলকে ছেড়ে রসিককেই খুঁজে নেবেন। রসিক হওয়া এবং বিদ্বান হওয়াকে রবীন্দ্রনাথ সরস্বতীর সাধকদের কুলের পরিচয় বলে মনে করতেন। 'সাহিত্যবিচার' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, সাহিত্যের সরস্বতীর মন্দিরের পাণ্ডারা দ্বারের কাছে কুলের বিচার করতে সংকোচ করে না। 'সাহিত্য' বইতে 'সাহিত্যের বিচারক' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পুথিগত বিদ্যার প্রতি কটাক্ষ করেছিলেন। সরস্বতীর সাধকদের দীনহীন বেশ, সাজপোশাকে অপটু বিন্যাস সত্ত্বেও দেবী তাদের কোলে তুলে নেন, 'মস্তকাঘ্রাণ' করেন। তবে সকলে তাদের চেনে না। যারা নিজেরাও সরস্বতীর সন্তান তারা 'ঘরের লোকের মর্যাদা বোঝেন।'[৩১৬] এই বইটির 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> আমাদের শুভ্রবসনা কমলালয়া দেবী সরস্বতী একাধারে Truth এবং Beauty-র মূর্তিমতী।[৩১৭]

প্রাচ্য শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার মেলবন্ধনের কথা ভাবতেন রবীন্দ্রনাথ। সেই কারণে যতদিন প্রাচ্যবিদ্যার প্রতি যে অবজ্ঞা ছিল ততদিন 'মাতা সরস্বতীর ঘরে গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে।'[৩১৮] 'সঞ্চয়' বইটিতে 'রূপ ও অরূপ' প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে একজন খ্রিস্টানও তাঁর কাব্যে সরস্বতীর বন্দনা করতে পারেন।

> কারণ সরস্বতী তাহার কাছে ভাবের প্রকাশমাত্র— গ্রীসের এথেনীও তাঁহার কাছে যেমন সরস্বতীও তেমনি।[৩১৯]

ভক্তিকে বিশেষ রূপের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেখার কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'বিশ্বভারতী' গ্রন্থে ১০ সংখ্যক অধ্যায়ে প্রকৃতি ও দেবী সরস্বতীকে একাকার করে দিয়েছিলেন তিনি।

> প্রকৃতির কোলে থেকে সরস্বতীকে মাতৃরূপে লাভ করা, এ পরম সৌভাগ্যের কথা।[৩২০]

এই ভাবনা থেকেই বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হয়েছিল। 'সমাজ' বইটিতে 'আদিম আর্যনিবাস' প্রবন্ধে রসিকতা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে লেখাপড়া শিখে যারা সরস্বতীর কাছে কড়ি ফিরিয়ে দেবার প্রার্থনা করে—

> মা সরস্বতী অনেকসময় তাঁহাদের প্রার্থনানুসারে বিদ্যা ফিরাইয়া নেন, কিন্তু কড়ি ফিরাইয়া দেন না।[৩২১]

তার লেখায় লক্ষ্মী-সরস্বতীর দ্বন্দ্বের কথাও রয়েছে। 'কালান্তর'-এর 'রায়তের কথা' প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

> সরস্বতীর বরপুত্র যে ছবি রচনা করে লক্ষ্মীর বরপুত্র তাকে অধিকার করে বসে।[৩২২]

'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'র ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪-এর লেখাটিতে লিখেছিলেন সরস্বতী অমৃতভাণ্ডারে ডাক দেয় এবং লক্ষ্মী অন্নের ভাণ্ডারে। শ্বেতপদ্মের অমরাবতী এবং সোনার পদ্মের অলকাপুরী যে পাশাপাশি নয়, একথাও ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কখনো কখনো তাঁর সরস্বতীর প্রতি পক্ষপাতিত্বও লক্ষ করা যায়। আবার 'সমাজ' বইটিতে 'আদিম আর্যনিবাস' প্রবন্ধটিতে লিখেছিলেন—

> জনসমাজে লক্ষ্মীরই চাঞ্চল্য অপবাদ প্রচার হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার সপত্নীর যে নিতান্ত অটল স্বভাব এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় না।[৩২৩]

তার লেখায় সরস্বতী 'ভাবরূপা'। কলাসরস্বতীর পদ্মাসন বিকশিত হয় মনের মধ্যে। 'শিক্ষা' বইটিতে 'ছাত্রসম্ভাষণ' প্রবন্ধে অন্যভাবে লিখেছিলেন,

> লক্ষ্মী কৃপণ; কারণ লক্ষ্মীর সঞ্চয় সংখ্যাগণিতের সীমায় আবদ্ধ। ব্যয়ের দ্বারা তার ক্ষয় হতে থাকে। সরস্বতী অকৃপণ; কেননা, সংখার পরিণাম তাঁর ঐশ্বর্যের পরিণাম নয়, দানের দ্বারা তার বৃদ্ধিই ঘটে।[৩২৪]

আবার 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে ভাগের মা হয়ে গেলে সরস্বতীর আর সদ্‌গতি হয় না।[৩২৫] সরস্বতীর রসবোধ সম্পর্কে বেশ সচেতন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'সাহিত্যের পথে' বইটির 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে লিখেছিলেন পাঠকের রসবোধের কথা মাথায় রেখেই সরস্বতীর পদ্মাসন। দেবী সরস্বতীর অমর্যাদাও তিনি পছন্দ করতেন না। সেই কারণেই 'জাপানে পারস্যে' বইটির ৭ সংখ্যক অধ্যায়ে অরসিককে ব্যঙ্গ করতে গিয়ে লিখেছিলেন—

> এখানেও যে খুশি সরস্বতীর বীণায় রবারের তার চড়িয়ে তাকে কেবলমাত্র গায়ের জোরে টেনে টেনে দীর্ঘ করতে পারে।[৩২৬]

অথচ, রবীন্দ্রনাথের কল্পনার আকাশ সরস্বতী নীলপদ্মের দোলায় দাঁড়িয়ে থাকে। 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'র ৮ সংখ্যক পত্রটিতে লিখেছিলেন—

> বৃষ্টি ধোওয়া রোদ্দুরটি যেন সরস্বতীর বীণার তারগুলি থেকে বেজে ওঠা গানের মতো সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেচে।[৩২৭]

পাঁচ

রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথমদিককার নাটক হল 'বাল্মীকি প্রতিভা'। এখানে দেবী সরস্বতীর প্রথাসিদ্ধ পৌরাণিক রূপ আমরা লক্ষ করি। ব্যাধের ক্রৌঞ্চবধ এবং সরস্বতীর আশীর্বাদ বাল্মীকির দেবভাষায় কথা বলা এবং মহাকবি হয়ে ওঠার পৌরাণিক গল্পকে নাটকে মান্যতা দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এখানে লক্ষ্মীকে পর্যন্ত অলকার পথ দেখিয়েছিলেন বাল্মীকি। শুক্লা সরস্বতীর জ্যোতির্ময়ী রূপে মুগ্ধ হয়েছেন বাল্মীকি। বীণাপাণি নিজের বীণা উপহার দেন বাল্মীকিকে। তাঁকে জানান তিনি বাল্মীকিকে গান শেখাতে এসেছেন।

বসি তোর পদতলে কবি বালকেরা যত
শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সংগীত কত
এই নে আমার বীণা দিনু তোরে উপহার
যে গান গাহিতে সাধ ধ্বনিবে ইহার তার।[৩২৮]

পৌরাণিক এই শিল্প-প্রেরণার দেবীমূর্তিকেই কবি নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠা দেবেন পরবর্তীকালে। 'একান্নবর্তী' নাটকের একটি চরিত্রের নাম হল জয়নারায়ণ। তাঁর আবার দুইটি স্ত্রী। আমাদের মনে হয়, পুরাণের নারায়ণপত্নী সরস্বতী ও লক্ষ্মীর ইঙ্গিত এই কৌতুক নাটকটিতে রয়েছে।

আজীবন দেবী সরস্বতীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব ছিল রবীন্দ্রনাথের। কারণ তিনি বিদ্যা ও সুরের সাধক। যদিও ছোটোবেলায় লেখাপড়ায় অনীহা থেকে সেকালের মাতা সরস্বতীর মধ্যে মাতৃভাবের কোনো লক্ষণ দেখেননি কিশোর রবীন্দ্রনাথ। আবার 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'পুরস্কার' কবিতায় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন—

সুরের খাদ্যে জানো তো মা বাণী।
নরের মেটে না ক্ষুধা।[৩২৯]

তবু জীবনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের শতদলপদ্মে প্রতিষ্ঠা দিলেন তাঁর জীবনদেবতাকে দেবী সরস্বতীর রূপে। সেই বীণাবাদিনীর শতকলরবে সমৃদ্ধ হল তাঁর সাহিত্যভাণ্ডার। রবীন্দ্র সাহিত্যের দেবলোকে দেবী সরস্বতী হলেন তাঁর প্রেরণা এবং শক্তিস্বরূপিনী।

লক্ষ্মী

ঋগ্বেদে লক্ষ্মী হলেন শ্রী ও ঐশ্বর্যের দেবী। তৈত্তিরীয় সংহিতায় লক্ষ্মী ও শ্রী-কে সূর্যের দুই স্ত্রী হিসেবে দেখানো হয়েছিল। পুরাণের যুগে তিনি ঐশ্বর্যের দেবী ও বিষ্ণুর স্ত্রী হিসেবে মর্যাদা পেয়েছিলেন। লক্ষ্মীর হাতে পাশ ও অঙ্কুশ গায়ের রঙ হল সোনার মতো। শালিধানের মঞ্জরি, পদ্ম এবং কৌস্তভমণিও তিনি ধারণ করে থাকেন। ধন, জ্ঞান এবং শীল— তিনেরই মহনীয় বিকাশ দেবী লক্ষ্মীর দিব্য চরিত্র মাহাত্ম্যে। তিনি কমলা, পদ্মের মতোই সুন্দরী। পদ্মবনেই তাঁর বসতি। পদ্ম আবার বিকাশ বা অভ্যুদয়ের প্রতীক। পুরাণ মতে, মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী দক্ষকন্যা খ্যাতির গর্ভে লক্ষ্মীর জন্ম হয়। ইনি নারায়ণের স্ত্রী। দুর্বাসার অভিশাপে ইন্দ্র ত্রিভুবনের জয় থেকে বঞ্চিত ও শ্রীহীন হলে সর্বসৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী সমুদ্রে প্রবেশ করেন। তারপর সমুদ্রমন্থনের ফলে লক্ষ্মীর উত্থান হয়। তাঁকে লাভ করার জন্য দেবতা ও দানবদের মধ্যে মতদ্বৈধ শুরু হয়। বিষ্ণু তখন মায়া সৃষ্টি করে লক্ষ্মীকে গ্রহণ করেন। লক্ষ্মী চঞ্চলা। তিনি শুদ্ধ ও সংযত মনে অবস্থান করেন।[৩৩০] পৌরাণিক লক্ষ্মীর নানা রূপের কথা জানা যায়। যেমন নদীরূপা লক্ষ্মী, ধনলক্ষ্মী, কৃষিলক্ষ্মী, খনিজলক্ষ্মী, সমুদ্রলক্ষ্মী, বাণিজ্যলক্ষ্মী ইত্যাদি।

মহালক্ষ্মী এবং গজলক্ষ্মী মূর্তির পূজা নিষ্ঠা সহকারে হয়ে থাকে। পেঁচা হল দেবী লক্ষ্মীর বাহন। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের দেবদেবীর সঙ্গে ভারতীয় পুরাণের এই দেবী লক্ষ্মীর কল্পনা মেলে না। এই দেবীর কল্পনা একান্তভাবে মৌলিক।[৩৩১]

দুই

'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'পরশপাথর' কবিতায় খ্যাপার পরশপাথর খুঁজে বেরানোর কথা লেখা আছে। এই সূত্রে দেবী লক্ষ্মীর সমুদ্রে নির্বাসন এবং শেষে সমুদ্র থেকে উঠে আসার বর্ণনা রয়েছে—

বহুকাল দুঃখ সেবি নিরখিল, লক্ষ্মীদেবী
উদিলা জগৎমাঝে অতুল সুন্দর।
সেই সমুদ্রের তীরে শীর্ণ দেহে, জীর্ণ চীরে
খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর।[৩৩২]

একই কাব্যগ্রন্থের 'আকাশের চাঁদ' কবিতায় মাটির পৃথিবীর নারীর মধ্যে লক্ষ্মীর আভাস খুঁজে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। স্নেহসুধা নিয়ে যে মেয়েটি জীবনের প্রতিদিনকে মধুর করে তুলতে পারে, সেই লক্ষ্মী। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'গৃহের লক্ষ্মী'। 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের 'জ্যোৎস্নারাতে' কবিতার সম্পূর্ণ বক্তব্যই দেবী লক্ষ্মীর উদ্দেশে লেখা। এখানে 'জীবনলক্ষ্মী'র কথা বলা হয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যায় এই লক্ষ্মী কবির প্রেমচেতনাকে অধিকার করে আছে। কোনো এক 'তরুণী লক্ষ্মী'র জন্য কবির প্রতীক্ষা।

মৌন শান্ত অসীমতা নিশ্চল সাগর
তারি মাঝখান হতে উঠে এসো ধীরে
তরুণী লক্ষ্মীর মতো হৃদয়ের তীরে আঁখির সম্মুখে।[৩৩৩]

এই তরুণী লক্ষ্মীর কাছে একটি চুম্বন প্রার্থনা করেছেন কবি। অপূর্ব এক বিরহবোধে কবি বসে আছেন দেবীর বাসরশয্যার বাইরে। কবি 'একাকিনী লক্ষ্মী'র একাকিত্ব অনুভব করেন।

...নন্দন বনের মাঝে
নির্জন মন্দিরখানি— সেথায় বিরাজে
একটি কুসুমশয্যা রত্নদীপালোকে
একাকিনী বসি আছে নিদ্রাহীন চোখে
বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী, জ্যোতির্ময়ী বালা
আমি কবি তারি তরে আনিয়াছি মালা।[৩৩৪]

আমরা বুঝতে পারি এই লক্ষ্মীর অবস্থান একজন রোম্যান্টিক কবির সৌন্দর্যবোধের কেন্দ্রে। 'চিত্রা'র 'স্বর্গ হতে বিদায়' কবিতায় ইন্দ্রসভায় সুন্দরীদের উপেক্ষা করে কবি তাঁর গৃহলক্ষ্মীর কল্পনা করেছিলেন।

...একদা সুক্ষণে
আসিবে আমার ঘরে সন্নত নয়নে
চন্দনচর্চিত ভালে রক্তপটাম্বরে
উৎসবের বাঁশির সঙ্গীতে। তার পরে

সুদিনে দুর্দিনে, কল্যাণ কঙ্কন করে
সীমান্তসীমায় মঙ্গলসিন্দুর বিন্দু
গৃহলক্ষ্মী দুঃখে সুখে, পূর্ণিমার ইন্দু
সংসারের সমুদ্র শিয়রে।[৩৩৫]

'চৈতালি'র 'প্রিয়া' কবিতায় 'জগৎলক্ষ্মী'র কথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ওপরে আরোপ করলেন মহিমা।

তোমার মহিমা জ্যোতি তব মূর্তি হতে
আমার অন্তরে পড়ি ছড়ায় জগতে।[৩৩৬]

মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থের সনেটগুলি। সেখানে ৬ সংখ্যক সনেটটিতে গৃহলক্ষ্মীকে বিশ্বলক্ষ্মী হয়ে ওঠার আহ্বান জানিয়েছিলেন শোকসন্তপ্ত মনে—

আজি বিশ্বদেবতার চরণ আশ্রয়ে
গৃহলক্ষ্মী দেখা দাও বিশ্বলক্ষ্মী হয়ে।
নিখিল নক্ষত্র হতে কিরণের রেখা
সীমন্তে আঁকিয়া দিক সিন্দুরের লেখা।
একান্তে বসিয়া আজি করিতেছি ধ্যান
সবার কল্যাণে হোক তোমার কল্যাণ।[৩৩৭]

১৬ সংখ্যক সনেটটিতেও স্বল্পজীবনের আনন্দিত দিনগুলি স্মরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। হারিয়ে যাওয়া স্ত্রীকে 'লক্ষ্মী' সম্বোধন করেছিলেন। ২২ সংখ্যক সনেটটিতে গৃহলক্ষ্মীর বিশ্বলক্ষ্মীতে উত্তরণের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন— 'যেভাবে বিরাজে লক্ষ্মী বিশ্বের ঈশ্বরী।'[৩৩৮] 'বলাকা'র ২৩ সংখ্যক কবিতা হল 'দুই নারী'। এই কবিতায় সমুদ্রমন্থনের ফলে দুই নারীর আবির্ভাবের কথা লেখা রয়েছে। একজন স্বর্গের অপ্সরী উর্বশী এবং অন্যজন হলেন 'বিশ্বের জননী' কল্যাণী লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর কল্যাণী মূর্তির বর্ণনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে—

...ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশির স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনার;
হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতার
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্বাদ পানে
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্যসুধায় মধুর।
ফিরাইয়া আনে ধীরে
জীবন মৃত্যুর পবিত্র সংগম তীর্থতীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে।[৩৩৯]

এই কবিতায় লক্ষ্মীর কল্যাণী মূর্তির পাশাপাশি তাঁর হেমাঙ্গী, স্বর্ণাভ রূপেরও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সমাজে প্রচলিত লক্ষ্মীমন্ত মেয়ের কাঠামোর প্রতি ব্যঙ্গ করেছিল 'পলাতকা' কাব্যগ্রন্থের 'মুক্তি' কবিতার মরণাপন্ন মেয়েটি—

এইটে ভালো, ওইটে মন্দ, যে যা বলে সবার কথা মেনে,
নামিয়ে চক্ষু, মাথায় ঘোমটা টেনে,
বাইশ বছর কাটিয়ে দিলেম এই তোমাদের ঘরে।
তাই তো ঘরে পরে
সবাই আমায় বললে লক্ষ্মী সতী,
ভালোমানুষ অতি।[৩৪০]

'শেষসপ্তক' কাব্যগ্রন্থের ৪৩ সংখ্যক কবিতায় কবির প্রেমচেতনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে লক্ষ্মী প্রসঙ্গ।

সেই শুনে কোনো কোনো দিন বা
বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর আসন টলেছিল
তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন
তাঁর কোনো কোনো দূতীকে
পলাশবনের রঙমাতাল ছায়াপথে
কাজ ভোলানো সকাল বিকালে।[৩৪১]

'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের 'তুমি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'সুরলক্ষ্মী'র কথা। 'শৈশবসঙ্গীত'-এ আছে 'বসন্তলক্ষ্মীর' প্রসঙ্গ। 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের 'সুসময়' কবিতায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকে 'বনলক্ষ্মী' আর 'শরৎলক্ষ্মী'র অনুষঙ্গ। 'পরিণয় মঙ্গল' কবিতায় উমাকে বলেছিলেন 'উৎসব লক্ষ্মী'। 'গৃহলক্ষ্মী' কবিতায় লক্ষ্মীর কল্যাণী মূর্তির ইঙ্গিত রয়েছে। 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থের 'উৎসর্গ' কবিতায় 'শরৎলক্ষ্মী' কনকমালায় মেঘের বেণী জড়িয়ে রাখে। 'প্রান্তিক' কাব্যগ্রন্থের ৬ সংখ্যক কবিতায় আসে জগৎলক্ষ্মীর কথা। একই কাব্যগ্রন্থের ১৫ সংখ্যক কবিতায় 'বনলক্ষ্মী'র প্রসঙ্গ রয়েছে। 'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের ১৭ সংখ্যক কবিতায় ধরিত্রীকে 'প্রাণলক্ষ্মী' বলা হয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থের ২৩ সংখ্যক কবিতায় নারীকে রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন জীবলক্ষ্মীর সম্মান। 'শেষলেখা' কাব্যগ্রন্থের ৩ সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'জাগরণের লক্ষ্মী'র কথা যিনি কবির শিখরে দাঁড়িয়ে থাকেন আঁচল পেতে। ২৯ সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'জীবনলক্ষ্মী'র কথা।

'গীতবিতানে'র 'পূজা' পর্যায়ের ১৫২ সংখ্যক গানে 'লক্ষ্মী'র উল্লেখ রয়েছে। কবি লিখেছিলেন, 'লক্ষ্মী যখন আসবে তখন কোথায় তারে দিবি রে ঠাঁই/দেখ্ রে চেয়ে আপন মনে পদ্মটি নাই, পদ্মটি নাই।'[৩৪২] এখানে 'লক্ষ্মী' অর্থে সমৃদ্ধি বোঝানো হয়েছে। দেবী লক্ষ্মী পবিত্রতাও মঙ্গলময়তার প্রতীক। তার জন্য উপযুক্ত আধারের প্রয়োজন। সেই আধার আর কিছু নয়, অবশ্যই পবিত্র মন।

তিন

রবীন্দ্র উপন্যাসে লক্ষ্মীর উল্লেখ সবচেয়ে সুন্দর ও স্পষ্টভাবে এসেছে 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে।

২ সংখ্যক অধ্যায়ে লাবণ্য এবং অমিতের প্রথম সাক্ষাৎ দৃশ্যে লাবণ্যের সৌন্দর্য এবং সমুদ্র থেকে উঠে আসা লক্ষ্মীর রূপকে মিলিয়ে দেওয়া হল।—

> একটি মেয়ে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। সদ্য মৃত্যু আশঙ্কায় কালো পটখানা তার পিছনে, তারই উপরে সে যেন ফুটে উঠল একটি বিদ্যুৎরেখায় আঁকা সুস্পষ্ট ছবি—চারিদিকের সমস্ত হতে স্বতন্ত্র। মন্দার পর্বতের নাড়া খাওয়া ফেনিয়ে ওঠা সমুদ্র থেকে এইমাত্র উঠে এলেন লক্ষ্মী, সমস্ত আন্দোলনের উপরে— মহাসাগরের বুক তখনো ফুলে ফেঁপে উঠছে।[৩৪৩]

'যোগাযোগ' উপন্যাসে মোতির মায়ের চোখে মধুসূদনের স্ত্রী কুমুদিনীকে ঘিরে তৈরি হয় দেবী লক্ষ্মীর আর্কেটাইপ। মোতির মা, এই লক্ষ্মীর অযত্ন সহ্য করতে পারছিল না। তাই, আপনমনে বলেছিল, 'ধন পেতে বড়ঠাকুরের কতকাল লাগল আর মন পেতে দুদিন সবুর সইবে না? সেই লক্ষ্মীর দ্বারে হাঁটাহাঁটি করে মরতে হয়েছে। এ লক্ষ্মীর দ্বারে একবার হাত পাততে হবে না?'[৩৪৪] 'যোগাযোগ' উপন্যাসে 'চাটুজ্যেদের বাস্তুলক্ষ্মী'র[৩৪৫] উল্লেখ বেশ অভিনব। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে সন্দীপ হল অর্থলোভী। সেই কারণে অর্থ সম্পর্কে তার মন্তব্য— '...এ হচ্ছে লক্ষ্মীর হাসি, ইন্দ্রাণীর লাবণ্য।'[৩৪৬] কথার টানে সে বলে,

> ...সেইজন্যেই তো লক্ষ্মী ত্যাগ করলেও তার ছিন্নপত্রের পাপড়িগুলোর চারিদিকে মন এমন করে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।[৩৪৭]

লক্ষ্মী এবং নারায়ণ আদর্শ দাম্পত্যের প্রতীক। 'চোখের বালি' উপন্যাসে আশালতাকে ঘিরে স্বামী সোহাগিনী লক্ষ্মীর অবয়ব তৈরি হয়েছে।—

> ...যখন সেই অযত্ন লালিতা অনাথার মস্তকে স্বামী স্বহস্তে লক্ষ্মীর মুকুট পরাইয়া দিলেন, তখন সে আপন গৌরবপদ গ্রহণ করতে লেশমাত্র বিলম্ব করিল না, নববধূর লজ্জাভয় দূর করিয়া দিয়া সৌভাগ্যবতী স্ত্রীর মহিমায় মুহূর্তের মধ্যেই স্বামীর পদপ্রান্তে অসংকোচে আপন সিংহাসন অধিকার করিল।[৩৪৮]

'গোরা' উপন্যাসে গোরা সুচরিতাকে কেন্দ্র করে সমস্ত নারীজাতির মধ্যে শ্রী লক্ষ্মীর প্রকাশ লক্ষ করেছিলেন।—

> ... সেই লক্ষ্মীরই একটি প্রকাশকে গোরা তাহার মাতার পার্শ্বে প্রত্যক্ষ আসীন দেখিয়া গভীর আনন্দে ভরিয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল এই লক্ষ্মীর দিকে আমরা তাকাই নাই, ইহাকেই আমরা সকলের পিছনে ঠেলিয়া রাখিয়াছিলাম— আমাদের এমন দুর্গতির লক্ষণ আর কিছুই নাই। গোরার তখন মনে হইল— দেশ বলিতেই ইনি, সমস্ত ভারতের মর্মস্থানে প্রাণের নিকেতনে শতদল পদ্মের উপর ইনি বসিয়া আছেন, আমরাই ইহার সেবক। দেশের দুর্গতিতে ইহারই অবমাননা, সেই অবমাননায় উদাসীন আছি বলিয়াই আমাদের পৌরুষ আজ লজ্জিত।[৩৪৯]

'বৌঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসে চঞ্চলা লক্ষ্মীর উল্লেখ রয়েছে। ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দেখে বসন্ত রায় ভেবেছিলেন— 'চপলা লক্ষ্মীর এ বড়ো অত্যাচার।'[৩৫০]

রবীন্দ্রনাথের গল্পেও এলোমেলোভাবে কিছু লক্ষ্মীপ্রসঙ্গ ছড়িয়ে আছে। 'দুর্বুদ্ধি' গল্পে লক্ষ্মীর হঠাৎ আগমন সম্ভাবনার কথা লেখা আছে।—

> লক্ষ্মী যখন ইচ্ছা করেন তখন এমনি করিয়াই কখনো সদর কখনো খিড়কি দরজা দিয়া অনাহূত আসিয়া উপস্থিত হন।[৩৫১]

'অধ্যাপক' গল্পের নায়িকার সঙ্গে বেশ রোমান্টিকভাবে মিলে গেল পৌরাণিক লক্ষ্মীর রূপকল্প। যেখানে কথকের জীবনলক্ষ্মী ফাগুন শেষের অপরাহ্নে—

> প্রবীণ তরুশ্রেণির আকম্পিত ঘনপল্লববিতানে দীর্ঘনিপতিত ছায়া এবং আলোক রেখাঙ্কিত পুষ্পবনপথে, জুতা পায়ে দিয়া, জামা গায়ে দিয়া, বই হাতে করিয়া, দুই জামগাছের আড়ালে অকস্মাৎ দেখা দিলেন— আমিও কোনো কথাটি কহিলাম না।[৩৫২]

এই লক্ষ্মী একান্তভাবেই রাবীন্দ্রিক। 'রাসমণির ছেলে' গল্পে লক্ষ্মীপেঁচার প্রসঙ্গ এসেছে অর্থহীনতার কথা প্রকাশ করতে গিয়ে।[৩৫৩]

'আপদ' গল্পে নীলকান্ত কিরণকে লক্ষ্মীর মতোই দেখতো। জলের ধ্বনি, পাতার শব্দ, পাখির ডাক এবং যে লক্ষ্মী এই লক্ষ্মীছাড়াকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁর সহাস্য স্নেহমুখচ্ছবি, তাঁর কল্যাণমণ্ডিত বলয়বেষ্টিত বাহু দুটি এবং দুর্লভ সুন্দর পুষ্পদলকোমল রক্তিম চরণযুগল কী এক মায়ামন্ত্রবলে রাগিণীর মধ্যে রূপান্তরিত হয়ে যেত। 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' গল্পে যজ্ঞেশ্বর সাধ করে মেয়ের নাম রেখেছিলেন কমলা। ভেবেছিলেন, যদি এই কৌশলে ফাঁকি দিয়ে চঞ্চলা লক্ষ্মীকে কন্যারূপে ঘরে ধরে রাখতে পারেন। কথক রবীন্দ্রনাথ রঙ্গ করে লিখেছিলেন,

> লক্ষ্মী সে ফন্দিতে ধরা দিলেন না, কিন্তু মেয়েটির মুখে নিজের শ্রী রাখিয়া গেলেন। বড়ো সুন্দরী মেয়ে।[৩৫৪]

'পণরক্ষা' গল্পেও 'চঞ্চলা লক্ষ্মী'র কথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

চার

'পঞ্চভূত' বইটির 'নরনারী' প্রবন্ধে গৃহলক্ষ্মীর কথা ইঙ্গিতে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পাঁচটি ভূতের কথপোকথনে এক প্রসন্নময়ী লোকবৎসলা দেবীর উল্লেখ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই দেবী হলেন লক্ষ্মী। প্রত্যেক ঘরে যাঁর অশ্রান্ত স্নেহ, কল্যাণ ও শান্তির ধারা বহমান। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি এই প্রসঙ্গে জানা প্রয়োজন—

> মেয়েদের ছোটো সংসারের সর্বত্রই, অথবা প্রায় সর্বত্রই যে মেয়েরা লক্ষ্মীর আদর্শ একথা যদি বলি তবে, লক্ষ্মীর প্রতি লাইবেল করা হইবে।[৩৫৫]

একই বইয়ের 'সৌন্দর্যের সম্বন্ধ' প্রবন্ধে তিনি 'অন্তর অন্তঃপুরের লক্ষ্মীরূপিণী গৃহিণী'র[৩৫৬] কথা বলেছিলেন। 'আলোচনা' বইটির 'সৌন্দর্য ও প্রেম' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্মীকে আহ্বান করেছিলেন 'হৃদয়কমলাসনে'। এই প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন, 'তুমি যাহার হৃদয়ে বিরাজ কর, তাহার আর দারিদ্র্যভয়

নাই, জগতের সর্বত্রই তাহার ঐশ্বর্য। যাহারা লক্ষ্মীছাড়া, তাহারা হৃদয়ের মধ্যে দুর্ভিক্ষ পোষণ করিয়া সর্বত্র টাকার থলি ও স্থূল উদর বহন করিয়া বেড়ায়।'[৩৫৭] একই ধরণের কথা লিখেছিলেন 'সাহিত্য' বইটির 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধে। সেখানকার বক্তব্য ছিল এই যে আমাদের পুরাণে লক্ষ্মী কেবল সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের দেবী নয়। তিনি মঙ্গলের দেবী। সৌন্দর্যমূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্তি এবং মঙ্গলমূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণস্বরূপ। 'লক্ষ্মী' রবীন্দ্রনাথের কাছে মনের শুদ্ধতার প্রতীক। তাঁকে বোঝা অত সহজ নয়। 'ছন্দ' বইটির 'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন:

> ... কেবল কথা এই যে, বোঝবার বেলায় মা-লক্ষ্মী যত সহজ বোঝাবার বেলায় তত নয়।[৩৫৮]

এই প্রসঙ্গে তিনি আপিসের বড়বাবু এবং গৃহলক্ষ্মীর তুলনা টানলেন। গৃহলক্ষ্মীকে উপলব্ধি করার জন্য রূপক ও অলঙ্কার চাই। কারণ, 'তথ্যের চেয়ে এ যে বেশি।'[৩৫৯] একই ধরনের মন্তব্য খুঁজে পাওয়া যায় 'সাহিত্য' বইয়ের 'সাহিত্যের পথে' প্রবন্ধে। সেখানে লক্ষ্মীকে বললেন, 'রসের লক্ষ্মী'। খুব রসবোধের সঙ্গে জানালেন, কিন্তু জগতে তো দেখছি সেই মনোহরণের আয়োজনের অন্ত নেই। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে, এ কেবল বোপদেবের মুগ্ধবোধের সূত্রজাল নয়, এ যে দেখি কাব্য। অর্থাৎ, ব্যাকরণটা রয়েছে দাসীর মতো পিছনে, আর রসের লক্ষ্মী রয়েছেন সামনেই।[৩৬০] একই বইয়ের 'সৃষ্টি' প্রবন্ধে 'আনন্দলক্ষ্মী'র কথা লিখেছিলেন। 'পৃথিবীতে সুন্দরের যে বাণী এসেছে, তুমি তাতে বেসুর লাগিয়ো না। জগতে আনন্দলক্ষ্মীর যে সিংহাসন সে যে শতদল পদ্ম, মত্ত করীর মতো তাকে দলতে যেয়ো না।'[৩৬১] 'জাপানযাত্রী'তে রবীন্দ্রনাথ 'বাণিজ্যলক্ষ্মী'র কথা লিখেছিলেন। কিন্তু সেখানেও লক্ষ্মী ঐশ্বর্যের নয়, মনের সৌন্দর্যের দেবী।

> তার কারণ তখনো বাণিজ্যের ভিতর দিয়ে মানুষের হৃদয় আপনাকে ঐশ্বর্যে বিচিত্র করে, সুন্দর করে ব্যক্ত করত। নইলে লক্ষ্মী তার পদ্মাসন পেতেন কোথা থেকে।[৩৬২]

'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'তে ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪-এর লেখাটিতে লক্ষ্মীকে বলা হল বিষ্ণুর প্রেমের শক্তি। 'বিষ্ণুর প্রকৃতিতে যে প্রেমের শক্তি বিশ্বকে পালন করছে সেই শক্তিই লক্ষ্মী, বিষ্ণুর প্রেয়সী। লক্ষ্মী সম্বন্ধে আমাদের মনে যে ভাবকল্পনা আমরা প্রত্যক্ষ দেখি নারীর আদর্শে।'[৩৬৩] লক্ষ্মীর সৌন্দর্য হল 'পরিপূর্ণতার লক্ষণ'— এমন কথাই প্রবন্ধটিতে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'পথের সঞ্চয়' বইটির 'জলস্থল' প্রবন্ধে একটু অন্যরকম কথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। লিখেছিলেন,

> পৃথিবীর এই দুটো ভাগ একটা আশ্রয় একটা অনাশ্রয় একটা স্থির একটা চঞ্চল, একটা শান্ত একটা ভীষণ। পৃথিবীর যে সন্তান সাহস করে এই উভয়কেই গ্রহণ করতে পেরেছে সেই তো পৃথিবীর পূর্ণ সম্পদ লাভ করেছে। বিঘ্নের কাছে সে মাথা হেঁট করেছে, ভয়ের কাছে সে পাশ কাটিয়ে চলেছে, লক্ষ্মীকে সে পেল না। এইজন্য আমাদের পুরাণকথায় আছে চঞ্চলা লক্ষ্মী চঞ্চল সমুদ্র থেকে উঠেছেন, তিনি আমাদের স্থির মাটিতে জন্মগ্রহণ করেননি।[৩৬৪]

একই বইয়ের 'খেলা ও কাজ' প্রবন্ধে রমণী ও লক্ষ্মীর মধ্যে একটা যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন

রবীন্দ্রনাথ— 'রমনীর মধ্যে যেখানে আমরা লক্ষ্মীর প্রকাশ দেখিতে পাই সেখানে আমরা একদিকে দেখি সাজসজ্জা লীলামাধুর্য আর একদিকে দেখি অক্লান্ত কর্মতৎপরতা ও সেবানৈপুণ্য। এই উভয়ের বিচ্ছেদই কুশ্রী।'[৩৬৫] 'পথে ও পথের প্রান্তে' বইটির ৪৭ সংখ্যক প্রবন্ধে দরিদ্র নারায়ণকে সম্পূর্ণতা দিলেন বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর পাশে বসিয়ে।

> দরিদ্র নারায়ণকে সিংহাসনেই বসাতে হবে। তাঁকে লক্ষ্মীছাড়া করে রাখব না।[৩৬৬]

'আধুনিক সাহিত্য' বইয়ের 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে বাংলাভাষার গরিমার প্রসঙ্গে 'অপূর্ব লক্ষ্মীশ্রী'র কথা লিখলেন রবীন্দ্রনাথ। 'সঞ্চয়' বইতে 'রূপ ও অরূপ' প্রবন্ধে লিখেছিলেন,

> ...জগতে লক্ষ্মী যতক্ষণ চঞ্চলা, ততক্ষণ তিনি কল্যাণদায়িনী। লক্ষ্মীকে এক জায়গায় চিরকাল বাঁধিতে গেলেই তিনি অলক্ষ্মী হইয়া উঠেন। কারণ চঞ্চলতার দ্বারাই লক্ষ্মী বৈষম্যের মধ্যে সাম্যকে আনেন।[৩৬৭]

হয়তো তাই, 'শিক্ষা' বই-এর 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে লক্ষ্মী এবং কুবেরের প্রকৃতিগত পার্থক্যটি স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি এই প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীলাভ করে। কুবেরের অন্তরের কথাটি হল সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে। 'কালান্তর'-এর 'চরকা' প্রবন্ধে সুতো কাটার পক্ষে আদিমকালের চরকা শেষকথা— রবীন্দ্রনাথ এমনকথা মানতে নারাজ। কারণ তিনি জানতেন সে কথা মানলে বিষ্ণুর প্রসন্নতা পাওয়া যাবে না। ফলে, 'লক্ষ্মী বিমুখ হবেন।'[৩৬৮] এখানে বিষ্ণুর প্রেয়সী লক্ষ্মীর অবয়বটিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'পল্লীপ্রকৃতি'র, 'পল্লীপ্রকৃতি' প্রবন্ধে লক্ষ্মীকে একই সঙ্গে সুন্দরী এবং কল্যাণী বলা হয়েছে।[৩৬৯]

পাঁচ

'হাস্যকৌতুক' বইতে 'চিন্তাশীল' নাটকের নরহরি চরিত্রটি 'লক্ষ্মী' শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয় দেয়। সে বলে যে এককালে লক্ষ্মী বলতে দেবী বিশেষকে বোঝাত। পরে লক্ষ্মীর গুণ অনুসারে সুশীলা স্ত্রীলোককে লক্ষ্মী বলা হত। কালক্রমে পুরুষের প্রতিও যে লক্ষ্মী শব্দের প্রয়োগ হচ্ছে— এইটিই চিন্তাশীলের চিন্তার বিষয়। 'শারদোৎসব' নাটকে লক্ষেশ্বরের অনেক ধনসম্পত্তি। অথচ সে খুবই কৃপণ। ফলে, ছেলেরা তাকে বলে 'লক্ষ্মীপেঁচা'। সন্ন্যাসীর সংলাপে কথার টানে আসে 'বনলক্ষ্মী'র কথা— 'তোমাদের উৎসবের গানে বনলক্ষ্মীদের জাগিয়ে দিতে হবে।'[৩৭০] 'ফাল্গুনী' নাটকে অবসাদগ্রস্ত রাজাকে উদ্যমী করার জন্য শ্রুতিভূষণকে ডাকা হয়। লক্ষ্মীর স্বভাব সম্পর্কে কিছু বলতে অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি অর্থ না বুঝে উল্টো কথা শোনালেন। 'বৈরাগ্যবিধি'র একটি চৌপদী উদ্ধৃত করলেন—

> যে পদ্মে লক্ষ্মীর বাস, দিন অবসানে

সেই পদ্ম মুদে দল সকলেই জানে।
গৃহ যার ফুটে আর মুদে পুনঃপুনঃ
যে লক্ষ্মীরে ত্যাগ করো, শুন মূঢ় শুন।[৩৭১]

কিন্তু দেবী লক্ষ্মী সম্পর্কে এই উপদেশ কারো মনে আশা জাগায় না। 'এক ফুৎকারেই আশা প্রদীপের জ্বলন্ত শিখা নির্বাপিত হয়ে যায়।'[৩৭২] 'শেষবর্ষণ' নৃত্যনাট্যে নটরাজের উক্তিতে 'বাদললক্ষ্মী'র ইশারা পাওয়া যায়। প্রকৃতির মধ্যে এক লক্ষ্মীশ্রী অনুভব করতে চেয়েছিলেন লেখক রবীন্দ্রনাথ—

> প্রিয়দর্শিকা, সময় হয়েছে, এইবার বাদললক্ষ্মীর অবগুণ্ঠন খুলে দেখো। চিনতে পারবে এই ছদ্মবেশিনীই শরৎপ্রতিমা। বর্ষার ধারায় যার কণ্ঠ গদগদ, শিউলিবনে তারই গান, মালতীবিতানে তাঁরই বাঁশির ধ্বনি।[৩৭৩]

এখানেই রাজা 'শরৎলক্ষ্মী'র কথা উল্লেখ করেছিলেন। 'মালঞ্চ' নাটকে নীরজার স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় যে আদিত্য নীরজাকে 'বনলক্ষ্মী' বলে ডাকতেন। আসলে লক্ষ্মী তো সমৃদ্ধি। আদিত্য ও নীরজার সাধের বাগানটির শ্রী ছিলেন নীরজা। এই অর্থেই তিনি লক্ষ্মী। 'মালিনী' নাটকে মালিনীর কল্যাণী রূপের সঙ্গে লক্ষ্মীর সৌন্দর্য মিলিয়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে আমরা 'লোকলক্ষ্মী' শব্দটি খুঁজে পাই, যা একান্তভাবে রাবীন্দ্রিক—

সমুদ্র মন্থনে যবে
লক্ষ্মী উঠিলেন, তাঁরে ঘেরি কলরবে
মাতিল উন্মাদনৃত্যে উর্মিগুলি সবে,
সেই মতো উচ্ছ্বসিত জনপারাবার
মাঝে তুমি লোকলক্ষ্মী মাতা।[৩৭৪]

'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'য় রানির নাম হল কল্যাণী। তিনি স্বভাবেও ছিলেন লক্ষ্মী। নকল রানির সম্বিৎ ফেরাতে সত্যিকারের লক্ষ্মীদেবী আবির্ভূতা হন। কিন্তু ক্ষীরি তাঁকে চিনতে পারে না। মজাদার ভঙ্গিতে তাঁর বেশবাস নিয়ে প্রশ্ন তোলে—

কী পরেছ ওটা মাথার ওপর,
দেখাচ্ছে যেন হীরের টোপর।
হাতে কি রয়েছে সোনার বাক্সে
দেখতে পারি কি? আচ্ছা থাক্ সে।
এত হীরে সোনা কারো তো হয়—না
ওগুলোতো নয় গিল্‌টি গয়না?
এগুলি তো সব সাচ্চা পাথর।
গায়ে কী মেখেছ, কীসের আতর?
ভুর্ ভুর্ করে পদ্মগন্ধ—
মনে কত কথা হতেছে সন্ধ।[৩৭৫]

এই সংশয় লক্ষ্মী উপভোগ করেন। রঙ্গ করে বলেন,

সত্যি লক্ষ্মী একের অধিক
নাই ত্রিভুবনে।[৩৭৬]

পরে, লক্ষ্মী এক ঠাকুরুনের ছদ্মবেশে এসে নকল রাণির সম্বিৎ ফেরায়।

রবীন্দ্রসাহিত্যে দেবী লক্ষ্মীর প্রসঙ্গ এসেছে নানাভাবে। রবীন্দ্রনাথের মানস দেবলোকে শ্রীলক্ষ্মী হলেন পবিত্রতা ও মঙ্গলময়তার দিব্য প্রতীক। সৌন্দর্যের দেবীকে রবীন্দ্রনাথ বার বার আবাহন করেছেন সাহিত্যসৃষ্টির মাধ্যমে। লোকলক্ষ্মী, গৃহলক্ষ্মী, বাদললক্ষ্মী, শরৎলক্ষ্মী, বাণিজ্যলক্ষ্মী ইত্যাদি বিচিত্র বিশেষণে সমৃদ্ধ করেছিলেন পৌরাণিক এই দেবীপ্রতিমাটিকে। হৃদয়পদ্মে স্থাপন করেছিলেন তাঁকে। গৃহলক্ষ্মীকে ঊর্ধ্বায়িত করেছিলেন বিশ্বলক্ষ্মীর ধারণায়। রবীন্দ্রসাহিত্যের দেবলোকে দেবী লক্ষ্মী যে মহিমান্বিত হয়েছিলেন, এই বিষয়ে সংশয় থাকে না।

দুর্গা

দেবী আদ্যাশক্তি মহামায়া হলেন দুর্গা। দুর্গতি বিনাশ করেন বলেই তিনি দুর্গা। পুরাণে তিনি শিবপত্নী। মহিষাসুর বধের জন্য সমস্ত দেবতাদের মিলিত তেজ থেকে দেবী দুর্গার সৃষ্টি হয়েছিল। সব দেবতারা নিজের নিজের অস্ত্র এই দেবীকে দান করেছিলেন। সত্যযুগে সুরথ রাজা দুর্গামূর্তি প্রস্তুত করে তিন বছর পূজার্চনা করেছিলেন। রাবণ চৈত্র মাসে বসন্তকালে এই পূজা করতেন। রামচন্দ্র শরৎকালে অকালবোধন করেছিলেন। শারদীয়া দুর্গাপূজার সঙ্গেই বাংলাদেশের আবেগ জড়িয়ে আছে। শক্তিরূপিণী এই দেবী হয়ে উঠেছিলেন বাঙালির ঘরের মেয়ে। পুরাণে দুর্গার সঙ্গেই মিলে গিয়েছিল সতী ও পার্বতীর ধারণা। দক্ষ-প্রজাপতির কন্যা সতীর সঙ্গে মহাদেবের বিবাহ হয়েছিল সৃষ্টিরক্ষার তাগিদে। কিন্তু দক্ষ কোনোদিন শিবকে মেনে নিতে পারেননি। সতী শিবনিন্দা সহ্য করতে না পেরে দেহত্যাগ করেন। তখন শিব সতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে তাণ্ডবনৃত্য শুরু করেছিলেন। সৃষ্টি রসাতলে যাবার আশঙ্কায় বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহ ক্রমশ খণ্ড খণ্ড করতে লাগলেন। এইভাবে একান্ন মহাপীঠের ধারণা তৈরি হল। সতী আবার হিমালয়ের ঘরে পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এরপর তারকাসুর বধের জন্য কার্তিকের জন্ম এবং তার জন্য শিবপার্বতীর মিলন আসন্ন হয়ে পড়ে। পার্বতী কঠোর তপস্যা শুরু করেছিলেন। প্রথমে ফলাহার, তারপরে জলপান, তারপর পতিত বৃক্ষের পাতা ও শেষে নিরাহারে তিনি তপস্যা করতে লাগলেন। এই সময় তাঁর নাম হল অপর্ণা। এরপর পার্বতী ও শিবের মিলন হল। জগদ্ধাত্রীও দেবী দুর্গার একটি রূপ। অগ্নি, বায়ু, বরুণ ও চন্দ্র— এই চারটি দেবতার অহংকার চূর্ণ করার জন্য দুর্গা কোটি সূর্যের তেজের মতো জ্যোতির্ময়ী রূপে আবির্ভূতা হন, দেবতারা এই দেবীকে জগদ্ধাত্রী নামে আরাধনা করেছিলেন। দুর্গার আরেকটি রূপ অন্নপূর্ণা। এই মূর্তির

দুটি হাত। বাম হাতে স্বর্ণময় অন্নপাত্র, ডান হাতে দর্বী অর্থাৎ হাতা, মহাদেবকে অন্ন পরিবেশন করছেন। কাশীতে অন্নপূর্ণা মূর্তির চারটি হাত। চার হাতে পদ্ম, অভয়, অঙ্কুশ ও দান। ভিক্ষুক শিবকে অন্নদান করার এই ভঙ্গিটি বাংলাদেশে পরিচিত দেববিগ্রহ।[৩৭৭]

দুই

'শেষসপ্তক'-এর আট সংখ্যক কবিতায় 'বর্তমানের অন্নপূর্ণা'র প্রসঙ্গ আছে। সন্ন্যাসী শিবের ভোগশক্তিহীন নিঃশব্দ জীবনের প্রতি কবি কোনো মোহ প্রকাশ করেননি। বরং লিখেছেন—

সদ্য বর্তমানের অন্নপূর্ণার—
পরিবেশন এড়িয়ে যেয়ো না, মোহান্ধ।[৩৭৮]

অন্নপূর্ণা এখানে গৃহলক্ষ্মীর সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছে। 'শেষসপ্তক'-এর আরেকটি কবিতায় পার্বতীর উল্লেখ আছে। এখানে সরাসরি তাঁকে 'বিশ্বলক্ষ্মী' বলা হয়েছে।—

বিশ্বলক্ষ্মী,
তুমি একদিন বৈশাখে
বসেছিলে দারুণ তপস্যায়
রুদ্রের চরণতলে,
তোমার তনু হল উপবাসে শীর্ণ
পিঙ্গল তোমার কেশপাশ।[৩৭৯]

রবীন্দ্রনাথের চোখে তপস্বিনী উমা হলেন 'বিশ্বলক্ষ্মী'।

'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'পয়লা আশ্বিন' কবিতায় ঊষার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু 'তপস্বিনী ঊষা' পাঠকের মনে 'তপস্বিনী উমা'র ছবি তৈরি করেছে।

হিমের শিহর লেগেছে আজ মৃদু হাওয়ায়
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।
ভোরবেলাকার চাঁদের আলো
মিলিয়ে শ্বেতকরবীর রঙে
শিউলি ফুলের নিঃশ্বাস বয়
ভিজে ঘাসের পরে—
তপস্বিনী ঊষার পরা পুজোর চেলির
গন্ধ যেন
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।[৩৮০]

'পত্রপুট' কাব্যগ্রন্থের 'পৃথিবী' কবিতায় 'সুন্দরী অন্নপূর্ণা'র সঙ্গে সঙ্গে 'ভীষণা অন্নরিক্তা'র ছবিও কথার তুলিতে এঁকেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।[৩৮১]

'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের 'সুসময়' কবিতায় দুর্গা হয়েছেন 'শরৎলক্ষ্মী'। 'লেখন' কাব্যগ্রন্থের একটি

লেখায় গৌরীর অঙ্গে ও মনে নটরাজের অক্ষয়নৃত্যের কথা আছে। অসাধারণ প্রেমের বর্ণনা এটি। কিন্তু এই লেখাটির ইংরেজি অনুবাদে গৌরীকে 'my child'[৩৮২] সম্বোধন করা হয়েছে। হতে পারে ঘরের মেয়ে গৌরীকে এই বিশেষণে আরো গভীর আত্মীয়তায় আবদ্ধ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের 'সাগরিকা' কবিতায় শিব-পার্বতীর চিরকালীন প্রেমের আশ্চর্য-সুন্দর দুটি রূপকল্প[৩৮৩] খুঁজে পাওয়া যায়। 'ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি'[৩৮৪]—এই দুটি রূপকল্পে শিব-পার্বতীর অর্ধনারীশ্বর বিগ্রহ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তিন

গল্প-উপন্যাসের নায়িকা চরিত্রগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় দুর্গা, অন্নপূর্ণা এবং জগদ্ধাত্রীর তুলনা করেছিলেন। 'ত্যাগ' গল্পের নায়িকা নায়কের প্রতি অনুরক্ত হবার পরে 'তপস্বিনী গৌরী'র মতো দিন দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছিল। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে পার্বতীর স্পষ্ট উল্লেখ আছে। মিনির বিয়ের ঠিক হয়েছিল পুজোর ছুটির মধ্যে। কৈলাসবাসিনীর সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের আনন্দময়ীও পিতৃভবন অন্ধকার করে পতিগৃহে যাত্রা করবে— এই কথাটি মিনির বাবার সংলাপেই রয়েছে। পিতৃস্নেহের মাপকাঠিতে যখন মিনির বাবা আর রহমত কাবুলিওয়ালার মধ্যে কোনো ভেদ থাকে না তখন 'তাহার সেই পর্বতগৃহবাসিনী ক্ষুদ্র পার্বতীর সেই হস্তচিহ্ন'[৩৮৫] মিনিকেই মনে করিয়ে দেয়। হিমালয় কন্যা পার্বতীকে এইভাবে 'ঘরের মেয়ে'র মতো করে গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'মহামায়া' গল্পে মহামায়া এবং ভবানীচরণ দুই ভাইবোন। তাদের নাম দুটি থেকে অনুমান করা যায় যে তারা শাক্ত পরিবারের অংশ। মহামায়ার চেহারার বর্ণনায় পৌরাণিক দুর্গার আদল খুঁজে পাওয়া যায়।—

> মহামায়া কুলীন ঘরের কুমারী। বয়স চব্বিশ বৎসর। যেমন পরিপূর্ণ বয়স, তেমনি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য। যেন শরৎকালের রৌদ্রের মতো কাঁচাসোনার প্রতিমা— সেই রৌদ্রের মতোই দীপ্ত এবং নীরব এবং তাঁহার দৃষ্টি দিবালোকের ন্যায় উন্মুক্ত এবং নির্ভীক।[৩৮৬]

'মধ্যবর্তিনী' গল্পে নিবারণের দুই স্ত্রী। প্রথম জন হল হরসুন্দরী এবং দ্বিতীয় জনের নাম হল শৈলবালা। 'হরসুন্দরী' এবং 'শৈলবালা' দুজনের নামের অর্থই হল দুর্গা। 'হরসুন্দরী' পরিণত বয়স ও মন নিয়ে সংসার আগলায়। শৈলবালার মধ্যে কিশোরীসুলভ চাপল্য রয়েছে। অনেকটা পিতৃগৃহে থাকা কন্যার মতো। দুজনের মধ্যে দুর্গার দুটি রূপ প্রকাশিত হয়ে উঠেছিল। 'হৈমন্তী' গল্পের নায়িকা পাহাড়ী এলাকার মেয়ে। শরৎ সকালের আকাশের মতো তার সরল উদার দৃষ্টি। মেয়েটিকে ঘিরে গিরিবালার রূপকল্প তৈরি করিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'দৃষ্টিদান' গল্পের মেয়েটি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে অভিমান করে বলেছিল—

> মা ত্রিনয়নী আমার দুইচক্ষু লইলেন।[৩৮৭]

'নামঞ্জুর গল্প'-এ কথার টানেই কথক সন্ন্যাসী শিবের ভিক্ষার অন্ন খেতে পারার তৃপ্তির আড়ালে অন্নপূর্ণার ভূমিকার কথা লিখেছিলেন—

> যখন 'ভিক্ষের অন্ন খাচ্ছি' বলে সন্ন্যাসী নিশ্চিন্ত তখন জানেন না যে, অন্নপূর্ণা এমন মশলায় বানিয়েছেন যে, দেবরাজ প্রসাদ পাবার জন্য নন্দীর কানে কানে ফিসফিস করতে থাকেন।[৩৮৮]

এই গল্পেই কথক জীবনী লেখার পরিপ্রেক্ষিতে সতীর দেহকে টুকরো করার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলেন।

> সতীর মৃতদেহ সুদর্শনচক্র টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছড়ানো হয়েছিল। আমার জীবনচরিত সম্পাদকি চক্রে তেমনি টুকরো টুকরো করে সংখ্যায় সংখ্যায় ছড়িয়ে দেবে, এটা আমার পছন্দসই নয়। জীবন যদি লিখি গোটা আকারে বের করে দেব।[৩৮৯]

'প্রতিহিংসা' গল্পে ইন্দ্রাণীর ব্যক্তিত্বের সূত্রে সতী এবং অন্নপূর্ণা দেবীর দুটি রূপেরই উল্লেখ করা হয়েছে। স্বামীর অবমাননায় ইন্দ্রাণীর ক্রোধকে 'সতীর রোষানল'-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ইন্দ্রাণী যখন অটল, স্নিগ্ধভাবে পালকিতে মিষ্টান্ন রেখে এল তখন কথকের মনে হয়েছিল—

> অন্নপূর্ণা যেমন স্নিগ্ধগম্ভীর মুখে সমুচ্চ স্নেহে ভক্তকে স্বহস্তে অন্ন তুলিয়া দিতে পারিতেন তেমনি অটল স্নিগ্ধভাবে ইন্দ্রাণী পালকিতে মিষ্টান্ন রাখিয়া আসিল।[৩৯০]

'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পের গিরিবালার কথা আবার আসে। রবীন্দ্রসাহিত্যে ঘরের মেয়ের সঙ্গে সব সময় পার্বতীর তুলনা করা হয়েছে। এই গল্পে বিন্ধ্যবাসিনী শারদীয়া পার্বতীর থেকে ভিন্ন নন। লৌকিক শিবকে নিয়ে দুর্গার লজ্জার সীমা ছিল না, তেমনি অনাথবন্ধুও বিন্ধ্যবাসিনীর লজ্জার কারণ। তাই, দুর্গাপূজার প্রেক্ষাপটে শ্বশুরবাড়ির অর্থচুরি করে অনাথবন্ধু মাটির পৃথিবীর গিরিবালাকে কষ্ট দেয়। 'লিপিকা'র 'পুনরাবৃত্তি' কথিকাটিতে অপর্ণার তপস্যার কথা লেখা আছে।—

> দ্বিতীয়বার লজ্জা পাবার জন্যেই যেন সে তপস্যা করতে লাগল। অপর্ণার তপস্যা যেমন অনশনের, রুচির তপস্যা তেমনি অনধ্যায়ের।[৩৯১]

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে 'বিমলার কথা'য় ভিক্ষুক শিব ও অন্নপূর্ণার প্রসঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায়—

> শংকর তো ভিক্ষুক হয়েই অন্নপূর্ণার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু এই ভিক্ষার রুদ্রতেজ কি অন্নপূর্ণা সইতে পারতেন যদি তিনি শিবের জন্য তপস্যা না করতেন?[৩৯২]

বিমলা কথায় কথায় অন্নপূর্ণাকে তেজস্বিনী প্রমাণ করেছিল। সন্দীপ বিমলাকে শক্তিরূপিনী দেবী হিসেবে দেখেছে— কখনো অন্নপূর্ণা, আবার কখনো কালী, আবার কখনো দশভুজা দুর্গা। কিন্তু বিমলার রণরঙ্গিনী হয়ে ওঠা এবং শেষ লড়াইটিও সন্দীপেরই সঙ্গে। সন্দীপ বিমলাকে একসময় বলে—

> তোমার তূণে অনেক বাণ আছে রণরঙ্গিনী।[৩৯৩]

বিমলা যখন সন্দীপের রূপে, গুণে মুগ্ধ তখন নিজেকে 'জগদ্ধাত্রী' মনে করতে চাইছিল।—

> আজ এই মহাদিনে দেশের পুরুষেরা দেশের নারীর মধ্যে দেখুক একবার জগদ্ধাত্রীকে। কিন্তু বাইরের রূপ না হলে তাদের চোখ যে দেবীকে দেখাতে পায় না। সন্দীপবাবু কি আমার মধ্যে দেশের সেই জাগ্রত শক্তিকে দেখতে পাবেন? না, মনে করবেন, এ একজন সামান্য মেয়েমানুষ, তার এই বন্ধুর ঘরের গৃহিনীমাত্র?[৩৯৪]

নিখিলেশের চোখে বিমলা 'পার্বতী', মেজোরানিদিদি 'অন্নপূর্ণা' নিখিলেশকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথ তৈরি করেন শিবের মতো আদর্শ স্বামীর আর্কেটাইপ। নিখিলেশের কাছে স্ত্রী পুরুষের মিলন—

হরপার্বতীর মিলন, কৈলাসে মানস সরোবরের পদ্মবনে।[৩৯৫]

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের পৌরাণিক কাঠামোটি লক্ষ করার মতো। বিমলা নিজের অজান্তেই জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, দশভুজা এবং কালীর দৈবী মহিমায় সেজে উঠেছে। নিখিলেশ শিবের মতোই অলক্ষ্যে থেকে তাকে শক্তি জুগিয়ে গেছে। সন্দীপের আসুরিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা বিমলা রণরঙ্গিনী দশভুজার মতো হয়ে ওঠে। 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কুমু পার্বতীর প্রতিমূর্তি,

> বাল্যকালে পতিকামনায় যখন সে শিবের পূজা করেছে তখন পতির ধ্যানের মধ্যে সেই মহাতপস্বী রজতগিরিনিভ শিবকেই দেখেছে।[৩৯৬]

মধুসূদনের সঙ্গে কুমুর অসম বয়সের বিবাহ প্রস্তাবে কুমুর মনে শিব ও সতীর বিয়ের কথাই মনে আসে—

> শিবের সঙ্গে সতীর বিয়ের কথা কি ওর মনে নেই? শিবনিন্দুকরা তাঁর বয়স নিয়ে খোঁটা দিয়েছিল, কিন্তু সেকথা সতী কানে নেয়নি।[৩৯৭]

পর্বতবাসিনী উমার মতোই কুমু যেন এক কল্প-তপোবনে বাস করে, মানস সরোবরের কূলে। ভাবী স্বামীর নিন্দায় তার অভিব্যক্তি দেখে সকলের দক্ষযজ্ঞের সতীর কথা মনে হয়েছিল।

এ যে দেখি দক্ষযজ্ঞের সতীকেও ছাড়িয়ে যায়।[৩৯৮]

কিন্তু এই উপন্যাসে কুমু ও তার স্বামীর মনের মিল হয় না। ইঙ্গিত রয়ে যায় কুমুর স্বামী মধুসূদনের নামের মধ্যেই। পার্বতীর মতো কুমুর স্বামীর নাম মধুসূদন। পৌরাণিক জুটির কল্পনা ভেঙে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে জটিলতা তৈরি করেছিলেন।

'শেষের কবিতা' উপন্যাসে অমিত উমার তপস্যার সঙ্গে নিজের প্রেমের একাগ্রতার তুলনা করেন। এই বিষয়টি বেশ অভিনব।

> উমার ছিল নিরাহারের তপস্যা, শেষকালে পাতা পর্যন্ত খাওয়া ছেড়েছিলেন। আমার হল নিরাসবাসের তপস্যা— খাট পালঙ টেবিল কেদারা ছাড়তে ছাড়তে প্রায় এসে ঠেকেছে শূন্য দেয়াল। সেটা ঘটেছিল হিমালয় পর্বতে, এটা ঘটল শিলঙ পাহাড়ে। সেটাতে কন্যা চেয়েছিলেন বর, এটাতে বর চাচ্ছেন কন্যা। সেখানে নারদ ছিলেন ঘটক, এখানে স্বয়ং আছেন মাসিমা...।[৩৯৯]

'দুইবোন' উপন্যাসে অন্নপূর্ণা ও ভিখারি শিবের রূপকল্প ব্যবহার করা হয়েছে। শর্মিলার হাতেই তার স্বামীর সমস্ত উপার্জন অখণ্ডভাবে এসে পড়ত। সে যেন 'ঘরের অন্নপূর্ণা'। বিশেষ প্রয়োজন ঘটলে তার কাছে 'ভিক্ষা না মেগে শশাঙ্কের উপায় নেই।'[৪০০] 'চোখের বালি' উপন্যাসে 'অন্নপূর্ণা' চরিত্রটি দৈবী মহিমায় ভাস্বর। কিন্তু জননী অন্নপূর্ণার সংহার মূর্তিও বিহারীর চোখ দিয়ে পাঠককে প্রত্যক্ষ

করিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'বেহারী'[৪০১] সম্বোধনে একদিন কঠিন বিচারের বজ্রধ্বনি শুনেছিল বিহারী। সেদিন জননী অন্নপূর্ণা যেন 'সংহার খড়্গ' তুলেছিল। মহেন্দ্র আবার বিনোদিনীর মধ্যে 'প্রেমের অন্নপূর্ণা'কে খুঁজে পেয়েছিল। বিহারী বিনোদিনীর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল তপস্বিনী পার্বতীকে।

> বিহারী ভাবিল, বিনোদিনী বাহিরে বিলাসিনী যুবতী বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে একটি পূজারতা নারী নিরশনে তপস্যা করিতেছে।[৪০২]

পার্বতীর সাধনার সঙ্গে প্রতিটি বাঙালি হিন্দুমেয়ের শিবের মতো বরলাভের বাসনা জড়িয়ে গিয়েছিল। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাসে রসিক দাদাও দুর্গার অপর্ণা মূর্তির উল্লেখ করেছিলেন।

> তা ভাই, দুর্গা নিজের বর খুঁজতে যাওয়া পাওয়া ছেড়ে তপস্যা করেছিলেন, কিন্তু নাতনীদের বর জুটছে না বলে, আমি বুড়ো মানুষ খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেব, বড়ো মার এ কী বিচার।[৪০৩]

'চার অধ্যায়' উপন্যাসে লোকে বিপ্লবের শক্তি হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন ইন্দ্রনাথ। তার হাতের রক্তচন্দন বিপ্লবীদের মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তোলে। নিজের ব্যবসার কাজে এলাকে ব্যবহার করেন ইন্দ্রনাথ। অলকানন্দা তেলের বিজ্ঞাপনের জন্য এলার মুখে কথা বসিয়ে দিতে চান—

> মহাদেবের জটা নিঙড়ে বের করা। একটা সার্টিফিকেট দিয়ো বৎসে, বোলো, অলকা তেল মাখার পর থেকে চুল-বাঁধা একটা আপদ হয়েছে, দীর্ঘায়মানা বেণী সামলে তোলা স্বয়ং দশভুজা দেবীর দুঃসাধ্য।[৪০৪]

আবার এলার 'দশভুজা' ভঙ্গির প্রতি ইঙ্গিত করে অতীন বলে—

> নকল দেবীর কৃত্রিম সাজ। মেয়েদের অন্য সাজেরই মতো, পুরুষ দর্জির দোকানে বানানো।[৪০৫]

অতীন এলাকে 'অন্নপূর্ণা' বলে।[৪০৬] আসলে এলাকে ঘরের, সংসারের দেবী রূপে দেখতে চায়। ইন্দ্রনাথ চায় এলার শক্তিকে ব্যবহার করতে। দুই পুরুষের দেখার চোখ এলার দেবীত্বের শিরোপার বদল ঘটায়।

চার

'সাহিত্য' বইটির 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধে সৌন্দর্য ও কল্যাণবোধের মেলবন্ধনের সূত্রে 'কুমারসম্ভব' কাব্যের তাপসী উমার বক্তব্যের উল্লেখ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ছদ্মবেশী মহাদেব ও তাপসী উমার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজের বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন—

> ভাবরসে সুন্দর অসুন্দরের কঠিন বিচ্ছেদ দূরে চলিয়া যায়।[৪০৭]

একই বইয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধে আর্য ও অনার্য অন্যান দেবদেবীদের সঙ্গে পার্বতীরও উল্লেখ আছে। পার্বতী এখানে আর্যসমাজের প্রতিনিধি স্থানীয়া। কথাসরিৎসাগরের অনুসরণে এই প্রবন্ধে পার্বতীকে এঁকেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই কারণেই তাঁর বিকৃতিহীন, সুন্দর, সমৃদ্ধ রূপ। 'লোকসাহিত্য'

বইটিতে 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে দুটি ধরনের গ্রাম্য সাহিত্যের কথা। এদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ হরগৌরী বিষয়ক ছড়াগুলোকে বাস্তবভাবের ছড়া বলেছিলেন। হরগৌরীর কথাকে তিনি 'আমাদের ঘরের কথা' মনে করেছিলেন। মিলনধর্মী হিন্দু পরিবারগুলিতে একমাত্র বিচ্ছেদ হল কন্যার বিচ্ছেদ।

> হরগৌরীর কথা বাংলার একান্ন পরিবারের সেই প্রধান বেদনার কথা। শরৎ সপ্তমীর দিনে সমস্ত বঙ্গভূমির ভিখারি বধূ কন্যা মাতৃগৃহে আগমন করে, এবং বিজয়ার দিনে সেই ভিখারি ঘরের অন্নপূর্ণা যখন স্বামীগৃহে ফিরিয়া যায় তখন সমস্ত বাংলাদেশের চোখে জল ভরিয়া আসে।[৪০৮]

'বাংলা শব্দতত্ত্ব'-এর পরিশিষ্টে 'মূর্ধন্য ণ', 'দন্ত্য ন'-এর অবস্থানের সূত্রে হরগৌরীর অর্ধনারীশ্বর প্রসঙ্গ আনলেন।—

> তাহাতে, এই যখন শব্দটা একাঙ্গীভূত হরগৌরীর মতো হইল;[৪০৯]

'জীবনস্মৃতি'-র 'বর্ষা ও শরৎ' প্রবন্ধে সরস ভঙ্গিতে হরপার্বতীর উল্লেখ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।—

> এক-এক বৎসরে বিশেষ এক-একটা গ্রহ রাজার পদ ও মন্ত্রীর পদ লাভ করে, পঞ্জিকার আরম্ভেই পশুপতি ও হৈমবতীর নিভৃত আলাপে তার সংবাদ পাই।[৪১০]

'ছেলেবেলা'তে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণার থেকে জানা যায় বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে গান শেখার কথা। একটি গানের উল্লেখ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ যেখানে দুর্গা হয়েছে 'গণেশের মা'।

> গণেশের মা, কলাবৌকে জ্বালা দিয়ো না,
> তার একটি মোচা ফললে পরে
> কত হবে ছানাপোনা।[৪১১]

দুর্গার এই মূর্তিটি বেশ অভিনব।

'পশ্চিমযাত্রীর ডায়রি'র ১৯২৪, ৩০ সেপ্টেম্বর লেখাটিতে দুর্গাকে 'গণেশের মা' হিসেবেই দেখতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। গণেশের ইঁদুরকেও ক্ষমার চোখে দেখতেন রবীন্দ্রনাথ। যুক্তি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> বাক্যের অপূর্ণতাকে সংগীত যেমন আপন রসে পূর্ণ করে তোলে, প্রেম তেমনি সুযোগ্যতার অপেক্ষা করে না, অযোগ্যতার ফাঁকের মধ্যে সে নিজেকে ঢেলে দেবার সুযোগ পায়।[৪১২]

'জাভাযাত্রীর পত্র'-এর ৯ সংখ্যক পত্রটিতে অন্নপূর্ণার উল্লেখ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

> এখানে মাটির উপর অন্নপূর্ণার পাদপীঠ শ্যামল আস্তরণে দিগন্ত থেকে দিগন্তে বিস্তীর্ণ;[৪১৩]

এখানে অন্নপূর্ণা সমৃদ্ধি ও পূর্ণতার প্রতীক। 'পরিচয়' বইটির 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে উমাকে আর্যদেবী হিসেবে পরিচিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

> এই দেবীতন্ত্রের মধ্যেও একদিকে হৈমবতী উমার সুশোভনা আর্যমূর্তি অন্যদিকে করালী কালিকার কপালমালিনী বিবসনা অনার্য মূর্তি।[৪১৪]

'পরিচয়' বইটির 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধে ভগিনী নিবেদিতাকেই সতীর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন

রবীন্দ্রনাথ।

> শিবের প্রতি সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্ধাশনে অনশনে অগ্নিতাপ সহ্য করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে কঠিন তপস্যায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সতী নিবেদিতাও দিনের পর দিন যে তপস্যা করিয়াছিলেন তাহার কঠোরতা অসহ্য ছিল।[৪১৫]

তিনি যে অর্ধাশনে, অনশনে, বীতনিদ্র রাতে, দীনহীনের মতো দিন কাটিয়েছিলেন, সেগুলিকেও রবীন্দ্রনাথ সতীর তপস্যার মতোই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে মানুষের অন্তরকৈলাসের শিবকেই নিবেদিতা বরণ করে নিয়েছিলেন। সেই কারণে তিনি দরিদ্রের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছিলেন। বাইরে থেকে যাঁর রূপের অভাব দেখে রুচিবিলাসীরা ঘৃণা করে দূরে চলে যায় তিনি তারই রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁরই কণ্ঠে নিজের অমর জীবনের শুভ্র বরমাল্য সমর্পণ করেছিলেন। 'শিক্ষা' বইটির 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে অন্নপূর্ণার উল্লেখ করেছিলেন। লিখেছিলেন—

> অন্নপূর্ণার সঙ্গে বৈরাগীর যে মিলন সেই হল প্রকৃত মিলন। এখানে অন্নপূর্ণা হলেন অন্তরের সমৃদ্ধি এবং শিব হলেন সংযমের প্রতীক।[৪১৬]

'পথে ও পথের প্রান্তে'র ৪৭ অধ্যায়ে একই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে আমাদের পুরাণে শিবের দরিদ্রবেশ এবং অন্নপূর্ণার ঐশ্বর্যের মেলবন্ধনের কথা আছে। 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'র ১৯ সংখ্যক পত্রটিতে খুব সুন্দর ভাবে শারদীয়া পার্বতীর উল্লেখ রয়েছে। রাণুর পার্বত্য অঞ্চলে বেড়ানোর অবসরে তার কাছে যে পত্রটি পৌঁছায় সেখানে বাংলাদেশে শারদীয়ার আগমনের কথা লেখা ছিল। স্বর্ণকিরণচ্ছটার ঘর উজ্জ্বল করে শারদা যেন এসে দাঁড়িয়েছিলেন। মেঘগুলোর নন্দিভৃঙ্গির মতো কালো চেহারা নয়, তারাও শ্বেতকিরণের মালা পরে শ্বেতচন্দনের ছাপ লাগিয়েছিল। ২০ সংখ্যক পত্রটিতে একটি সুন্দর কবিতা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে সতীর পুনর্জন্মের কথার ইঙ্গিত আছে—

পুরানো সেই শিবের প্রেমে নূতন হয়ে এল নেমে
দক্ষসুতা ধরি উমার অঙ্গ,
এম্‌নি করে সারাবেলা চল্‌ছে লুকোচুরি খেলা
নূতন পুরাতনের চিররঙ্গ।[৪১৭]

'পথের সঞ্চয়'-এর 'আমেরিকার চিঠিতে' তুষারপাতের পরে প্রকৃতিকে দেখে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল যেন তাপসিনী গৌরী তাঁর বসন্ত পুষ্পাভরণ ত্যাগ করে শুভ্রবেশে শিবের শুভ্রমূর্তি ধ্যান করছে। কামনার ক্ষয় হয়েছে। ফলে চতুর্দিকের শুভ্রতায় শিবপার্বতীর মিলনে আর কোনো বাধা নেই। রবীন্দ্রনাথ সেই মিলনকে বলেছিলেন— 'নূতন মিলনের মঙ্গলোৎসব'।[৪১৮] 'জাপানযাত্রী'র ৪ সংখ্যক প্রবন্ধে যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> অন্নপূর্ণা আজ হয়েছেন কালী; তাঁর অন্নপরিবেশনের হাতা আজ হয়েছে রক্তপান করার খর্পর। তাঁর স্মিতহাস্য আজ অট্টহাস্যে ভীষণ হল।[৪১৯]

পাঁচ

রবীন্দ্রনাটকেও বিক্ষিপ্তভাবে দুর্গাপ্রসঙ্গ রয়েছে। 'রাজা ও রাণী' নাটকের মন্ত্রীর সংলাপে সতীর প্রসঙ্গ আছে। রানির কুটুম্বরা রাজার প্রতাপ নিয়ে দেশ জুড়ে রয়েছে— এই বিষয়টি বোঝানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করলেন সতীদেহের উপমান।—

> মন্ত্রী। ... জানো তো সকলি।
> রাণীর কুটুম্ব যত বিদেশি কাশ্মীরি
> দেশ জুড়ে বসিয়াছে। রাজার প্রতাপ
> ভাগ করে লইয়াছে খণ্ড খণ্ড করি,
> বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন মৃত সতীদেহ সম।[৪২০]

'বিসর্জন' নাটকে অপর্ণা চরিত্রটি স্নেহময়ী দেবীর প্রতীক। অপর্ণা পার্বতীর আরেক নাম। দেবী ত্রিপুরেশ্বরীর বিধ্বংসী রূপের ঠিক বিপ্রতীপে অপর্ণাকে দাঁড় করিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

> অপর্ণা। কে তোমার বিশ্বমাতা। মোর শিশু চিনিবে না তারে। মা-হারা শাবক জানে না সে আপন মায়েরে। আমি যদি বেলা করে আসি, খায় না সে তৃণদল ডেকে ডেকে চায় পথপানে— কোলে করে নিয়ে তারে, ভিক্ষা অন্ন কয় জনে ভাগ করে খাই। আমি তার মাতা।[৪২১]

জয়সিংহ ত্রিপুরেশ্বরীর মধ্যে জগতের মা'কে প্রত্যক্ষ করে। সেই কারণে দেবী তাঁর কাছে 'গিরিনন্দিনী'। মৃত্যুর মতো কঠিন রঘুপতিও নাটকের শেষে অপর্ণাকে মাতৃসম্বোধন করেন। 'জননী অমৃতময়ী'[৪২২] বলেন। অপর্ণার স্নেহপ্রবণ মনে রবীন্দ্রনাথ যেন দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়ে ত্রিপুরেশ্বরীর পাষাণমূর্তির বিসর্জন দিয়েছেন। 'গোরায় গলদ' নাটকের চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দুর্গাকে 'অন্নপূর্ণা' বলেছিল বিনোদবিহারী।

> শিবটা হল ভিক্ষুক আর দুর্গা হলেন অন্নপূর্ণা। মেয়ে মানুষ একেবারে ভরা ভাণ্ডারের মাঝখানে এসে দাঁড়াবে চারিদিক ঝলসে দেবে কোথাও যে কিছু অভাব আছে তা কারো চোখে পড়বে না, মনে থাকবে না।[৪২৩]

'গান্ধারীর আবেদন' কাব্যনাট্যে ভানুমতীর গহনাবিলাস গান্ধারীর মনে প্রলয়ের আশঙ্কা জাগিয়ে তুলেছে। তাঁর 'উন্মাদিনী শঙ্করীর তাণ্ডবঝঙ্কার'-এর কথা মনে হয়েছে। 'শঙ্করী' বলতে এখানে পার্বতীর রুদ্র রূপকেই বোঝানো হয়েছে। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটকে তিনকড়ের পোড়াকপালের আঁচ পেলে নাকি অন্নপূর্ণার হাঁড়ির তলা দু ফাঁক হয়ে যায়— অন্নপূর্ণাকে নিয়ে এমন রসিকতাও করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

দেবী দুর্গা কখনো পার্বতী, কখনো অন্নপূর্ণা, কখনো জগদ্ধাত্রী রূপে রবীন্দ্রসাহিত্যে উল্লিখিত হয়েছিলেন। নারীচরিত্রগুলির মহিমাকে উজ্জ্বল করার জন্য এই পৌরাণিক আর্কেটাইপগুলি ব্যবহার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্যের দেবলোকে দুর্গা কখনো শক্তিরূপিনী, কখনো উদার অন্নপূর্ণা, কখনো মহিমময়ী জগদ্ধাত্রী আবার কখনো ঘরের মেয়ে উমা।

কালী

দশমহাবিদ্যার মধ্যে প্রথম মহাবিদ্যা হল কালী। শক্তি উপাসকদের কাছে কালী হলেন আদ্যাশক্তি। এই দেবীর চার হাতে খট্বাঙ্গ ও চন্দ্রহাস্য, দুই বাঁ হাতে চর্ম এবং পাশ। গলায় নরমুণ্ড, তাদের দেহ বাঘের চামড়ায় আবৃত। দীর্ঘ দাঁত, রক্তচক্ষু, বিস্তৃত মুখ এবং স্থূল কর্ণ দেবীকে ভয়ঙ্কর রূপ দিয়েছে। এই দেবীর বাহন মুণ্ডহীন শব। পুরাণের গল্প থেকে জানা যায় দেবাসুরের সংগ্রামের সময় আদ্যাশক্তি মহামায়ার শরীর থেকে কৌষিকী নামের আরেকজন দেবীর আবির্ভাব ঘটে। এই দেবীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মহামায়া স্বয়ং কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেন। তিনিই কালী। পুরাণে এবং তন্ত্রে দেবীর উগ্র ও শিবরূপের, ভীষণা ও শান্তরূপের বর্ণনাও আমরা পাই। বাংলাদেশ হল কালীসাধনার পীঠভূমি। বিভিন্ন সাধকের ধ্যানে এবং কল্পনায় এই দেবী নানা রূপ পেয়েছিলেন। ঘোর অমাবস্যার রাতে কালীপূজা হয়। রাত্রিদেবী কালী নিজের রূপেই অন্ধকার দূর করেন। তিনি দিক্‌বসনা, মুক্ত স্বভাবের, মুক্তকেশী ও গলায় মুণ্ডমালা। ত্রিনয়নী এই দেবীর চারটি হাত। ডানদিকের দুটি হাতে অভয় ও বরাভয়। বাঁদিকের উপরের হাতে খড়্গ আর নীচের হাতে নরমুণ্ড। দেবী কালী হলেন অশুভ বিনাশিনী। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এই শক্তিময়ী দেবীর প্রেরণা বিপ্লবীদের সাহস জুগিয়েছিল।[৪২৪]

দুই

'পত্রপুট' কাব্যগ্রন্থের 'পনেরো' সংখ্যক কবিতায় কালীর উল্লেখ রয়েছে। এখানে তিনি হলেন 'রুদ্রাণী'।

> দেখেছি সুন্দর যখন অবমানিত
> কদর্য-কঠোরের অশুচি-স্পর্শে
> তখন সেই রুদ্রাণীর তৃতীয় নেত্র থেকে
> বিচ্ছুরিত হয়েছে প্রলয়-অগ্নি,
> ধ্বংস করেছে মহামারীর গোপন আশ্রয়।[৪২৫]

'পরিশেষ'-এর 'মোহানা' কবিতার কালী ও মহাকালের এক আশ্চর্যসুন্দর রূপকল্প খুঁজে পাওয়া যায়—

> কালীরে বক্ষে ধরি শুভ্র মহাকাল,
> বাঁধে না তারে কালো কলুষ জাল।[৪২৬]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই কবিতাটি কালীপূজার দিন লেখা হয়েছিল। 'বক্‌সাদুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি" কবিতায় 'রুদ্রাণীর বরের' কথা লেখা আছে—

> মহাক্ষণে রুদ্রাণীর
> কী বর লাভিল বীর,
> মৃত্যু দিয়ে বিরচিল অর্মত্য নরের রাজধানী।[৪২৭]

জীবনের শুরুতে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের লেখা— 'হরহৃদে কালিকা'।

এই কবিতায় পৌরাণিক কালীভাবনার এক সার্থক প্রকাশ লক্ষ করা যায়। একদিন প্রলয়শিঙা যখন বেজে উঠবে তখন কালী রক্ত আঁখি মেলে প্রলয় জগৎ নিয়ে যে খেলা খেলবেন তারই বর্ণনা আছে এই কবিতায়।[৪২৮] এখানে পুরাণকে মান্যতা দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। গীতবিতানের পূজা পর্যায়ের ১৬০ সংখ্যক গানটিতে কালীর প্রসঙ্গ ইঙ্গিতে রয়েছে।

> সন্ধ্যা হল গো ও মা, সন্ধ্যা হল, বুকে ধরো।
> অতল কালো স্নেহের মাঝে ডুবিয়ে আমায়, স্নিগ্ধ করো।[৪২৯]

মৃত্যুরূপা কালীর কোলে শেষবারের মতো আত্মসমর্পণ করতে চান কবি। কালীর ভয়ঙ্করী নগ্নিকা মূর্তি রবীন্দ্রনাথের কাছে আকর্ষক ছিল না। সেই কারণে 'স্বদেশ' পর্যায়ের ২১ সংখ্যক গানটিতে এই দেবীরই এক নবসৃজন করলেন। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বঙ্কিম ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন 'মা যা হইয়াছেন'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই গানে লিখেছিলেন—

> ওগো মা তোমায় দেখে দেখে
> আঁখি না ফিরে।[৪৩০]

এই রাবীন্দ্রিক কালীমূর্তির ডানহাতে খড়্গ। বাঁহাত শঙ্কাহরণ করছে, দুই নয়নে প্রেমের হাসি এবং 'ললাটনেত্র আগুনবরণ'। রবীন্দ্রনাথ পৌরাণিক নগ্নিকাদেবীকে 'রৌদ্রবসনী' বলেছিলেন। তাঁর সূক্ষ্ম সৌন্দর্য ও রুচিবোধে কালী ভারত-জননীর অবয়ব লাভ করেছিলেন।[৪৩১]

তিন

'রাজর্ষি' উপন্যাসে ত্রিপুরেশ্বরী দেবীর প্রসঙ্গ ছিল। এই দেবীর ওপর লেখক রবীন্দ্রনাথ হিংস্রতা আরোপ করেছিলেন। ত্রিপুরেশ্বরী নাম হলেও মহাকালীর প্রভাব এই দেবীর মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নঞর্থক মনোভাব স্পষ্ট মান্যতা পেয়েছিল জয়সিংহের মন্তব্যে।—

> এইজন্যই কি তোকে সকলে মা বলে মা! তুই এমন পাষাণী! রাক্ষসী, সমস্ত জগৎ হইতে রক্ত নিষ্পেষণ করিয়া লইয়া উদরে পুরিবার জন্য তুই ওই লোলজিহ্বা বাহির করিয়াছিস। স্নেহ প্রেম মমতা সৌন্দর্য ধর্ম সমস্তই মিথ্যা, সত্য কেবল তোর ওই অনন্ত রক্ততৃষা।[৪৩২]

এই উপন্যাসেই কথক রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> ত্রয়োদশ দেবতার মাঝখানে কালী দাঁড়াইয়া নররক্তের জন্য জিহ্বা মেলিয়াছেন।[৪৩৩]

'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাসে অক্ষয় তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মজা করে মহাকালীর চৌষট্টি হাজার যোগিনীর একজন বলে বসেছিল—

> অন্তত মহাকালীর চৌষট্টি হাজার যোগিনীর সন্ধান পেলেও একবার পেট ভরে প্রেমালাপটা করে নিই।[৪৩৪]

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে সন্দীপ বিমলাকে কালী রূপে কল্পনা করেছিল—

> মেয়েরা যদি পুরুষের কৃত্রিম বন্ধন থেকে মুক্তি পেত তাহলে পৃথিবীতে কালীকে প্রত্যক্ষ দেখতে পেতুম— সেই দেবী নির্লজ্জ, যে নির্দয়। আমি সেই কালীর উপাসক; বিমলাকে সেই প্রলয়ের মাঝখানে টেনে নিয়ে আমি একদিন, কালীর উপাসনা করব।[৪৩৫]

এছাড়াও এই উপন্যাসের আরেকটি জায়গায় মহাকালীর সুন্দর ইঙ্গিত রয়েছে—

> এই বাড়ির রাণীর মনের মধ্যে ডাকাতের দল খাঁড়া হাতে নৃত্য করতে করতে দেবীর কাছে বর মাগতে লাগল।[৪৩৬]

'চোখের বালি' উপন্যাসে রাগের সময় অন্নপূর্ণার 'স্নেহসুধাসিক্ত' কণ্ঠের মধ্যে 'কঠিন বিচারের বজ্রধ্বনি' প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে। জননী অন্নপূর্ণা যেন সংহার খড়্গ তোলে।[৪৩৭]

'অনধিকার প্রবেশ' গল্পের 'জয়কালী নামের চরিত্রটির কথা মনে পড়ে যায়। এই নামটিতেই শক্তির দেবীর অনুষঙ্গ রয়েছে। কথকের মতে—

> এই স্ত্রীলোকটির প্রকৃতির মধ্যে বহুল পরিমাণে পৌরুষের অংশ থাকাতে তাঁর যথার্থ সঙ্গী কেহ ছিল না।[৪৩৮]

চার

'আধুনিক সাহিত্য' বইটির 'সাকার ও নিরাকার' প্রবন্ধে কালী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজের বিরূপ মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছিলেন—

> আমাদের লোভ আমাদের হিংসা আমাদের ক্ষুদ্রতাকে দেবতারূপে অমর করিয়া রাখি, এই কারণেই কালীকে দস্যু আপন দস্যুবৃত্তির সহায় বলিয়া জ্ঞান করে, মিথ্যা-শপথকারী আদালতে জয়লাভের জন্য পশু মানত করে, এমন কি, যেসকল অন্যায় অবিচার দুষ্কর্ম মনুষ্যলোকে গর্হিত বলিয়া খ্যাত, দেবচরিত্রে তাহাও অনিন্দনীয় বলিয়া স্থান পায়।[৪৩৯]

'শান্তিনিকেতন'-এর 'প্রকৃতি' প্রবন্ধটিতে কালীর বিধ্বংসী রূপের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। শক্তির ক্ষেত্রে ঈশ্বরের দুই মূর্তির কথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এক হল অন্নপূর্ণা মূর্তি যা ঐশ্বর্যের দ্বারা আমাদের পরিপুষ্ট করে তোলে। আর এক হচ্ছে করালী কালী মূর্তি— এই মূর্তি আমাদের সীমাবদ্ধ শক্তিকে সংহরণ করে নেয়। আমাদের কোনোদিক দিয়ে সৃষ্টির চরমতায় যেতে দেয় না— না টাকায়, না খ্যাতিতে, না অন্য কোনো বাসনা বিষয়ে।[৪৪০] 'জাপানযাত্রী'র ৪ সংখ্যক অধ্যায়ে 'কলবাহন বাণিজ্য'-এর সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন—

> অন্নপূর্ণা আজ হয়েছেন কালী; তাঁর অন্ন পরিবেশনের হাতা আজ হয়েছে রক্তপান করবার খর্পর। তাঁর স্মিতহাস্য আজ অট্টহাস্যে ভীষণ হল।[৪৪১]

'কালান্তর' বইটির 'বাতায়নিকের পত্র' প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে ঐশ্বর্যের গর্বে এবং দারিদ্র্যের দুঃখে মানুষের সমস্ত লোলুপ প্রবৃত্তি বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এই দুই অবস্থাতেই মানুষ সকল দেবতার ওপরে শক্তিকে আসন দিতে লজ্জিত হয় না।—

> সেই ক্রূর শক্তির দক্ষিণ হস্তে অন্যায়ের এবং বামহস্তে ছলনার অস্ত্র।[৪৪২]

এখন, এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'প্রতাপসুরামত্ত য়ুরোপের পলিটিক্স'কে শক্তিপূজা বলেছিলেন। সেখানে শক্তিমূর্তি সম্পূর্ণ উলঙ্গ নয়। 'কিন্তু তার লেলিহান রসনার উলঙ্গতা কোথাও ঢাকা নেই।'[৪৪৩] পীস কনফারেন্সের সভাক্ষেত্রে তা লক্ লক্— করছে। একই বইয়ের 'শক্তিপূজা' প্রবন্ধে আবার দেবী কালীর বিরোধিতা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এখানে কালীকে তিনি 'দস্যুর উপাস্য', 'ঠগীর উপাস্য', 'কাপালিকের উপাস্য' দেবতা শক্তি বলেছিলেন। আবার, মিথ্যা মামলায় জয় থেকে জ্ঞাতিশত্রুর বিনাশ কামনা পর্যন্ত সকলপ্রকার কামনাই শক্তিপূজায় স্থান পেয়েছিল।[৪৪৪] একদিকে দেবচরিত্রের হিংস্রতা এবং অন্যদিকে মানুষের ধর্মবিচারহীন ফলকামনা কালীপূজাকে রবীন্দ্রনাথের মনে শ্রদ্ধার আসন তৈরি করে দিতে পারেনি। সেই কারণেই তিনি বলেছিলেন— শক্তিপূজার সঙ্গে একটি উলঙ্গ নিদারুণতার ভাব, নিজের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বলপূর্বক দুর্বলকে বলি দেবার ভাব সংগত হয়ে আছে। আবার 'আলোচনা' বইতে 'ধর্ম' প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে শিব ও শক্তির নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সম্মিলনই সমাজের একমাত্র মঙ্গল এবং শিব ও শক্তির বিরোধই সমাজের সমস্ত অমঙ্গলের কারণ।

এই প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে, আমাদের চোখে কালী মৃত্যু আকারে প্রতিভাত হলেও ভক্তেরা জানেন কালীও যা গৌরীও তাই। আবার কালীর বিবসনা মূর্তি যে মূলত অনার্যমূর্তি এমন অনুমানও তিনি করেছিলেন।[৪৪৫] 'জাভাযাত্রীর পত্র'-এর ১৬ সংখ্যক পত্রটিতে লিখেছিলেন যে এইখানে মহাদেবের তাণ্ডবলীলা কালীর মধ্যে রূপ নিয়েছে।[৪৪৬] কিন্তু জাভায় কালীর কোনো পরিচয় নেই, এমন কথাও তিনি ৭ সংখ্যক পত্রটিতে লিখেছিলেন।—

> এখানে হিন্দুধর্ম প্রধানতই শৈব। দুর্গা আছেন কিন্তু কপালমালিনী লোলরসনা উলঙ্গিনী কালী নেই। কোনো দেবতার কাছে পশুবলি এরা জানে না। কিছুকাল আগে অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ উপলক্ষে পশুবধ হত, কিন্তু দেবীর কাছে জীবরক্ত নৈবেদ্য দেওয়া হত না।[৪৪৭]

'সহজপাঠ' বইটির দ্বিতীয় পাঠে কনের নাম শ্যামা এবং বরের নাম বৈদ্যনাথ। নামকরণে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছিলেন শ্যামাকালীর প্রসঙ্গ।

পাঁচ

'বাল্মীকি প্রতিভা' নাটকে দস্যুদের উপাস্য দেবী হলেন কালী। দস্যুদের গানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে কালীর রূপ।—

> কালী কালী বলো রে আজ—
> ...বল্ রে শ্যামা মায়ের জয়।[৪৪৮]

এই শ্যামা মা নরবলি চান। তাঁকে নাকি ঘিরে থাকে লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ। দস্যু বাল্মীকি এই কালীকে

উপাসনা করতেন ঘোর শাক্ত মতে।—

> উরো কালী কপালিনী, মহাকাল সীমন্তনী,
> লহো জবাপুষ্পাঞ্জলি মহাদেবী পরাৎপরা![৪৪৯]

কিন্তু সরস্বতীর আশীর্বাদধন্য বাল্মীকি কালীকে ত্যাগ করে সরস্বতীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। দুই দেবীর মধ্যে কালীর প্রতিই বিরূপ ভাব প্রকাশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। একই রকম মানসিকতা লক্ষ করা যায় 'বিসর্জন' নাটকে। রঘুপতি শক্তির উপাসক। তিনি বলিকে সমর্থন করতেন। রানি গুণবতীর সন্তানহীনতার সুযোগে বলির আয়োজন করেছিলেন। অথচ, রাজা গোবিন্দমাণিক্য এবং জয়সিংহ এই নিষ্ঠুর প্রথা সমর্থন করতে পারেননি। কারণ জয়সিংহের বিশ্বাসে—

> দেবী নেমে আসে মানবী হইয়া, যারে ভালোবাসি তার মুখে। দরিদ্র ও দাতা, দেবতা ও মানব সমান হইয়া যায়।[৪৫০]

জয়সিংহ দেবীর ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।—

> বল চণ্ডী, সত্যিই কি রাজরক্ত চাই?
> এই বেলা বল্, বল্ নিজ মুখে বল্
> মানবভাষায়, বল্ শীঘ্র— সত্যই কি
> রাজরক্ত চাই?[৪৫১]

যখনই জয়সিংহ দেবীর ওপরে ভরসা রাখতে পারেনি, তখনই সে দেবীকে 'চণ্ডী' সম্বোধন করেছে। নাটকে রবীন্দ্রনাথ যে জনতা চরিত্রগুলি সৃষ্টি করেছিলেন, তারাও দেবীকে রক্তপিয়াসী ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না।—

> মা পাঁঠা পায়নি, এবার জেগে উঠে তোদের এক একটাকে ধরে ধরে মুখে পুরবে।[৪৫২]

জয়সিংহ দেবীর মধ্যে মাতৃমূর্তি খুঁজেও পায়নি। প্রশ্ন তুলেছে—

> ...জননী, তোমার
> হস্তে খড়্গ নাই? রোষে তব বজ্রানল
> নাহি চণ্ডী? তব ইচ্ছা উপায় খুঁজিছে,
> খুঁড়িছে সুড়ঙ্গপথ চোরের মতন
> রসাতলগামী? এ কী পাপ?[৪৫৩]

এই সূত্রে 'বিদ্যাসুন্দর' তথা 'কালিকামঙ্গল' মনে পড়ে যায়। শেষে রঘুপতি পর্যন্ত দেবীকে 'নির্দয়', 'রাক্ষসী', 'পিশাচিনী' সম্বোধন করে। নাটকে কালীমূর্তি বিসর্জন দেওয়ার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের তীব্র কালীবিদ্বেষই প্রকাশিত হয়েছিল।

আমাদের মনে হয়, যে কালী উপাসনার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল বলিপ্রথা সেই উপাসনা পদ্ধতিকে রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা করেছিলেন। কালীর বিবসনা, উগ্র মূর্তিকেও নিজস্ব কল্পনায় অনেক কোমল করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। কখনো পদ্মা নদীর জল আর কালীমূর্তি একাকার হয়ে গিয়েছিল তাঁর চোখে—

> ...তাকে মনে করলে আমার কালীর মূর্তি মনে হয়— নৃত্য করছে, ভাঙছে এবং চুল এলিয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে।[৪৫৪]

নিজের কল্পনার দেবলোকে কঠিনে-কোমলে রবীন্দ্রনাথ গড়েছিলেন দেবী কালীকে।

লৌকিক দেবদেবী

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য কাব্য হল মঙ্গলকাব্য। সেখানে বাঙালির মনের অনিশ্চয়তা এবং ভীতির থেকে জন্ম হয়েছিল সম্পূর্ণ নতুন এক দেবসমাজের। বৈদিক বা পৌরাণিক দেবদেবীর রাজকীয়, দাম্ভিক আভিজাত্য তাদের ছিল না। সাধারণ মানুষের গল্পকথা, তাদের নিত্য জীবনসংগ্রাম এই দেবসমাজের কাহিনির মূল প্রেরণা। সেই কারণেই চণ্ডী, মনসা, শীতলার মতো দেবদেবীরা ছিলেন রুক্ষ ও কঠিন। তুর্কি আক্রমণের পটভূমিতে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার মানসিকতা থেকেই মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদকাব্যগুলির জন্ম হয়েছিল। তখন অবোধ, ইন্দ্রিয়সর্বস্ব, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসহীন মানুষ শুধু প্রাণে বেঁচে থাকতে চাইত। স্ত্রীলোকেরা ব্রত, পার্বণে এই দেবী দেবতাদেরই আঁকড়ে ধরেছিল। ফলে, চণ্ডী, মনসা, ধর্মঠাকুর, শীতলা, ওলাবিবির মতো আরো অনেক অচেনা দেবদেবী বাঙালি সমাজে গুরুত্ব পেতে লাগলেন। সামাজিক মঙ্গলের জন্য লিখিত মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা স্বর্গ থেকেই নির্বাচন করে নিতেন কোনো দেবকুমার অথবা নর্তকীকে। তারপর শাপভ্রষ্ট হয়ে মর্তে যেতে বাধ্য হত। দেবলীলা ও নরলীলার নির্দিষ্ট সোপান পার হয়ে এগিয়ে চলত মঙ্গলকাব্যের কাহিনি। ভক্তকে প্রলোভন অথবা ভয় দেখাতে দ্বিধাগ্রস্ত হতেন না মঙ্গলকাব্যের দেবী দেবতারা। কালকেতুর মতো নির্বিবাদী চরিত্রদের নিয়ে সমস্যা ছিল না কোনো। কিন্তু চাঁদসদাগরের মতো প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধলেই সপ্তডিঙা ডুবে যেত, প্রাণ হারাতো নিরপরাধ মানুষ। দেবীর ক্রোধ ঝলসে উঠত বিকৃত সময়ের প্রতিনিধি হয়ে। এই দেবচরিত্রগুলি দৈবীমহিমায় ভাস্বর ছিল না। তাঁরা ছিলেন দোষেগুণে ভরা।

দুই

রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলিতে লৌকিক দেবদেবীর প্রসঙ্গও এসেছে। কিন্তু এই অনার্য দেবদেবীর প্রতি খুব সদর্থক মনোভাব ছিল না রবীন্দ্রনাথের। 'কালান্তর' বইটির 'কালান্তর' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই দেবদেবীদের কথা মনে করেই লিখেছিলেন—

> 'মুসলমান আমলের' বাংলা সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি করলে দেখা যায় যে অবাধে অন্যায় করবার অধিকারই যে ঐশ্বর্যের লক্ষণ এই বিশ্বাসটা কলুষিত করেছে তখনকার দেবচরিত্র-কল্পনাকে। তখনকার দিনে যেমন অত্যাচারের দ্বারা প্রবল ব্যক্তি আপন আসন পাকা করে তুলত, তেমনি করে অন্যায়ের বিভীষিকায় দেবদেবীর প্রতিপত্তি আমরা কল্পনা করেছি।[৪৫৫]

‘বাতায়নিকের পত্র’ প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে ঐশ্বর্য-গর্বে মানুষের মন বাইরের দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। আবার দারিদ্র্যের দুঃখে ও অপমানেও মানুষের সমস্ত লোলুপ প্রবৃত্তি বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এই দুই অবস্থাতেই মানুষ সকল দেবতার ওপরে সেই শক্তিকে আসন দিতে লজ্জিত হয় না—

> যে ক্রূর শক্তির দক্ষিণ হস্তে অন্যায়ের এবং বাম হস্তে ছলনার অস্ত্র। প্রতাপসুরামত্ত য়ূরোপের পলিটিক্স এই শক্তিপূজা। এইজন্য সেখানকার ডিপ্লোমেসি কেবলই প্রকাশ্যতাকে এড়িয়ে চলতে চায়। অর্থাৎ সেখানে শক্তি যে মূর্তি ধারণ করেছে সে সম্পূর্ণ উলঙ্গমূর্তি নয়। কিন্তু তার লেলিহান রসনার উলঙ্গতা কোথাও ঢাকা নেই। ঐ দেখো পীস কনফারেন্সের সভাক্ষেত্রে তা লক্‌লক্ করছে।[৪৫৬]

ডান হাতে অন্যায় এবং বাঁ হাতে ছলনা— এই ভাবনাটি হল রাবীন্দ্রিক ভাবনা। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে কবিকঙ্কণ চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসান ছিল প্রকৃতপক্ষে অধর্মেরই জয়গান। মঙ্গলগান ছিল তাঁর মতে— ‘পরাভব গান।’ অনার্য দেবীদের উত্থান রবীন্দ্রনাথ ভালো চোখে দেখেননি। তাই এই প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন—

> এককালে পুরুষদেবতা ছিলেন, তাঁর বিশেষ কোনো উপদ্রব ছিল না। খামকা মেয়েদেবতা জোর করে এসে বায়না ধরলেন, আমার পুজো চাই।[৪৫৭]

কবিদের স্বপ্নদর্শনকেও ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন—

> ছলনা, অন্যায় এবং নিষ্ঠুরতা কেবল মন্দির দখল করল তা নয়, কবিদের দিয়ে মন্দিরা বাজিয়ে চামর দুলিয়ে আপন জয়গান গাইয়ে নিলে। লজ্জিত কবিরা কৈফিয়ত দেওয়ার ছলে মাথা চুলকিয়ে বললেন, কী করব আমার উপর স্বপ্নে আদেশ হয়েছে। এই স্বপ্ন একদিন আমাদের সমস্ত দেশের উপর ভর করেছিল।[৪৫৮]

রবীন্দ্রনাথ চণ্ডী, মনসা সকলকেই সমালোচনা করেছিলেন। যে শক্তি মানুষকে দীর্ঘদিন ধরে কষ্ট দিয়েছিল, সেই শক্তির পায়েই মানুষকে মাথা নত করতে হয়েছিল— এই ভাবনা রবীন্দ্রনাথের মনে লৌকিক দেবদেবীদের ভয়ের দেবতা, মৃত্যুর দেবতাতে পরিণত করেছিল। এই বইটির ‘শক্তিপূজা’ প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে শাস্ত্রে দেবতার যে স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে সেইটেই যে আদিম এবং লৌকিকটাই যে আধুনিক একথা বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত মানা যায় না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে অনার্য দেবতাকে আর্যভাবে গ্রহণ করতে একদিন ভারতবাসী বাধ্য হয়েছিল। সেই সময় যেসব দেবতা ভারতবর্ষের সাধু সমাজে প্রবেশ করেছিল তাদের চরিত্রে অসংগতি একেবারে দূর হতে পারেনি। তাদের মধ্যে আর্য-অনার্য দুই ধারার মিশ্রণ দেখা যায়। লৌকিক ব্যবহারে সেই অনার্যধারাই প্রবল হয়ে ওঠে। ‘কর্তার ইচ্ছায় কর্ম’ বইটিতে প্রেস্টিজকে কর্তা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই সূত্রেই লিখেছিলেন—

> ঐ তো কর্তা, ঐ তো আমাদের কবিকঙ্কনের চণ্ডী, ঐ তো বেহুলা কাব্যের মনসা, ন্যায় ধর্ম সকলের উপরে ওকেই তো পূজা দিতে হইবে, নাহিলে হাড় গুঁড়া হইয়া যাইবে।[৪৫৯]

‘বাংলা ভাষা পরিচয়’ বইটিতে আবার মঙ্গলকাব্যের প্রসঙ্গে বলেছিলেন অন্যায়কারিণী শক্তির কাছে ভয়ে মাথা নত করার মধ্যে ভক্তের পরাভব রয়েছে। মনসামঙ্গলের দেবতাকেও রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন

নির্মম। 'সমালোচনা' বইটির 'নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি' প্রবন্ধে কবিকঙ্কনের 'কমলেকামিনী'র উল্লেখ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যদিও তার সূত্রে লিখেছিলেন—

> শিক্ষিত, সংযত ও মার্জিত কল্পনায় একটি রূপসী যুবতীর সহিত গজাহার ও উদ্‌গীরণ কোনোমতেই একত্রে উদয় হইতে পারে না।[৪৬০]

তিন

'ব্যঙ্গকৌতুক' বইটির অন্তর্গত একটি ছোটোগল্প 'প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ'। সেখানে বিজ্ঞান এবং সামাজিক নানা নিয়ম নীতির কারণে স্বর্গের সব অভিজাত দেবী দেবতারা রিজাইন দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কোনো অনার্য দেবদেবীর নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই তাঁদের মধ্যে দলবিভাজন করেছিলেন। 'ব্যঙ্গকৌতুক' নামের নাটকের বইটিতে 'স্বর্গীয় প্রহসন' নাটকে ইন্দ্রসভায় আর্য ও অনার্য দেবতাদের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছিল। স্বর্গের পথ দুর্গম হওয়া সত্ত্বেও দেবলোকে মনসা, শীতলা, ঘেঁটু নামের 'অজ্ঞাতকুলশীল' দেবী দেবতারা অভিষেকে তথাকথিত আর্য দেবতারা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। বলাবাহুল্য লৌকিক দেবদেবী রবীন্দ্রনাথের উন্নাসিক চিরাচরিত ধারণার বদল হয়নি এক্ষেত্রেও। চন্দ্র শীতলার প্রসন্ন দৃষ্টি থেকে নিষ্কৃতি চাইছিলেন এই নাটকে। এখানে মনসা, শীতলা, মঙ্গলচণ্ডী, ঘেঁটু, ওলাবিবি ইত্যাদি দেবদেবীরা আর্যদেবতাদের প্রায় সমাজচ্যুত করতে উদ্যত হয়েছিলেন। এই দেবীদেবতার অশোভন ব্যবহারই তাঁদের অনার্য পরিচয় চিহ্নিত করেছে। যেমন, ইন্দ্র-চন্দ্রদের মার্জিত ভাষার পাশাপাশি ঘেঁটু, মনসা, শীতলার অমার্জিত ভাষা ব্যবহার।—

> ইন্দ্র। হে ঘেঁটো! আপনকার—
> ঘেঁটু। ঘেঁটো কী! আমি কি তোমার বাগানের মালী? বাপের জন্মে এমন অভদ্দর মানুষ তো দেখি নি গা। ঘেঁটো! আমি যদি তোমাকে ইন্দির না বলে ইন্দিরে বলি?[৪৬১]

আর্য দেবতারা যেখানে সাধু ভাষায় কথা বলেছিলেন, অনার্য দেবতাদের মুখে রবীন্দ্রনাথ আরোপ করেছিলেন চলিত ভাষা। তাঁদের চরিত্র, রুচি, ভাবভঙ্গি সম্মানজনক নয়। রবীন্দ্রনাথ লেখার ধরনেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর আন্তরিক পক্ষপাত ছিল আর্যদেবতাদের প্রতি। 'স্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠক' নাটকে শীতলার উল্লেখ আছে এবং টঙ্কেশ্বরী নামের এক নতুন দেবীর কথা লেখা আছে। 'সেঁজুতি' কাব্যগ্রন্থের 'নতুনকাল' কবিতায় দেবী মনসার অন্যায়ের উল্লেখ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—

> ...বিনাদোষে দেবীর কোপে সাধুর অসম্মান।[৪৬২]

চার

রবীন্দ্রনাথ লৌকিক দেবদেবীদের আর্যদেবী দেবতাদের সঙ্গে একাসনে কোনোদিনই বসাতে পারেননি। প্রথমত, তাঁর রুচিবোধের কারণে। দ্বিতীয়ত, তিনি মনে করতেন যে দুই ধরনের দেবতার মধ্যে ধর্মনীতিগত আদর্শের তারতম্য আছে। মানুষের ধর্মবুদ্ধিকে যদি নতুন দেবতা পুরানো দেবতার চেয়ে তৃপ্তি দিতে পারতেন তাহলে তাঁকে বরণ করার সঙ্গত কারণ ছিল। কিন্তু বলাই বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ তৃপ্ত হতে পারেননি। তাই মনসা, চণ্ডী, শীতলা, ঘেঁটু, ওলাবিবিরা রবীন্দ্রনাথের দেবলোকে ব্রাত্য, অবাঞ্ছিত হয়েই রয়ে গেলেন। আমরা দেখলাম, বেদ ও পুরাণের হিন্দু দেবদেবীরা রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশিষ্ট রূপ লাভ করেছেন। চিরপরিচিত সিদ্ধ দেবমূর্তিগুলি রবীন্দ্রনাথের কলমের স্পর্শে কখনো পরিবর্তিত হয়েছে। আসলে, তথাকথিত ভক্তের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ দেবপ্রসঙ্গগুলির উল্লেখ করেননি। ফলে, এই বিশেষ দেবসম্প্রদায় একান্তভাবেই রাবীন্দ্রিক। রবীন্দ্রনাথ অপৌত্তলিক হলেও পৌত্তলিকতাকে অশ্রদ্ধা করেননি। 'ছিন্নপত্রাবলী'র ১৫৯ সংখ্যক চিঠিটিতে খুব সুন্দরভাবে লিখেছিলেন—

> অতএব এরকম করে দেখতে গেলে সব জিনিসই পুতুল; কিন্তু হৃদয়ের ভিতর দিয়ে কল্পনার ভিতর দিয়ে দেখতে গেলে তাদের দেবতা বলে চেনা যায়— তাদের সীমা পাওয়া যায় না— এই কারণে সমস্ত বাংলাদেশের লোক যাকে উপলক্ষ করে আনন্দে, ভক্তিতে প্লাবিত হয়ে উঠেছে, তাকে আমি মাটির পুতুল বলে যদি দেখি তবে তাতে কেবল আমারই ভাবের অভাব প্রকাশ পায়।[৪৬৩]

সেই কারণেই, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেবভাবনার সমন্বয়ে, আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তিনি নির্মাণ করেছিলেন এক স্বতন্ত্র দেবলোক। সেখানে সকলেই রবীন্দ্রনাথের 'নিভৃত প্রাণের দেবতা'। তাঁরা একান্তভাবেই রাবীন্দ্রিক।

তথ্যসূত্র

১. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *হিন্দুদের দেবদেবী— উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ*, প্রথম পর্ব, ফার্মা কে এল এম (প্রাইভেট) লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: ১৯৭৭, পৃ. ৮২

২. তদেব।

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়', 'প্রভাত সংগীত', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই, ১৯৮০, পৃ. ৮৭

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রাহুর প্রেম', 'ছবি ও গান', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: জুলাই ১৯৮০, পৃ. ১৪৬

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সুরদাসের প্রার্থনা', 'মানসী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ

সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৩৭৩

৬. তদেব, পৃ. ৩৭৭

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আহ্বান', 'পূরবী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ১৯৮২, পৃ. ৬২৪

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'দীপশিল্পী', 'পরিশেষ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৮২, পৃ. ৯২৩

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নারী', 'সানাই', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৭৬৩

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৩৩ সংখ্যক কবিতা', 'রোগশয্যায়', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর, ১৯৮৩, পৃ. ৮০৯

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অন্তর্যামী', 'চিত্রা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই, ১৯৮০, পৃ. ৫৮৮

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাবিত্রী', 'পূরবী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৮২, পৃ. ৬১৯

১৩. তদেব, পৃ. ৬২০

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৬১০ সংখ্যক গান', 'পূজা' পর্যায়, *গীতবিতান*, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ : মাঘ ১৪০৬, পৃ. ২৩৯

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৮৭ সংখ্যক গান', 'প্রেম' পর্যায়, *গীতবিতান*, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : ভাদ্র, ১৩৮০, পৃ. ৩০৭

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'দীপশিল্পী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম সংস্করণ : জুলাই, ১৯৮৬, পৃ. ১৫০

১৭. সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত), *পৌরাণিক অভিধান*, এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৩৫, পৃ. ৫০

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৮৬ সংখ্যক কবিতা', 'নৈবেদ্য', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮০, পৃ. ১০০০

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'লেখন', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, মে ১৯৮২, পৃ. ৭৪২

২০. ভালো লাগে রৌদ্র যখন পড়ে মেঘের ফন্দিতে,
রবির সাথে ইন্দ্র মেলেন নীল সোনালির সন্ধিতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিলঙের চিঠি', 'পূরবী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৮২, পৃ. ৫৯৭

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অপ্রমাদবর্গ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১১৯১

২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জন্মদিন', 'সেঁজুতি', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৫৫৫

২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বৃক্ষরোপণ উৎসব', 'বনবাণী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৮২, পৃ. ৮৭৬

২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'তপোভঙ্গ', 'পূরবী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৮২, পৃ. ৬০২

২৫. ও কি সুরপুরীর পর্দাখানি
নীরবে খুলে
ইন্দ্রাণী আজ দাঁড়িয়ে আছেন
জানালা মূলে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বর্ষাপ্রভাত', 'খেয়া', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৮২, পৃ. ১৮৪

২৬. ইন্দ্রলোকের পাগ্‌লাগারদ
খুলল তারই দ্বার,
পাগল ভুবন দুর্দাড়িয়া
ছুটল চারিধার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '১০৫ সংখ্যক কবিতা', 'খাপছাড়া', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৪৮০

২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '১৫ সংখ্যক কবিতা', 'শেষ সপ্তক', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১৬৫-১৬৬

২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভীরু', 'পুনশ্চ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৯৫

২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '১ সংখ্যক কবিতা', 'রোগশয্যায়', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৭৮৯

৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৫১৭ সংখ্যক গান', 'পূজা', *গীতবিতান*, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৮১, পুনর্মুদ্রণ, মাঘ ১৪০৬, পৃ. ২০৪

৩১. তদেব, '৫২৮ সংখ্যক গান', পৃ. ২০৮

৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গোরা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৮৫, পৃ. ৮৫০

৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চতুরঙ্গ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৬, পৃ. ১৩৪

৩৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ঘরে-বাইরে', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৬, পৃ. ১৬

৩৫. তদেব, পৃ. ১০৯

৩৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সৃষ্টি', 'সাহিত্যের পথে', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ৪৫৭

৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আত্মপরিচয়', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ১৯৮৯, পৃ. ১৫৮

৩৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য', 'সাহিত্য', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ৩৩৬

৩৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সভাপতির অভিভাষণ', 'সমূহ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২৮০

৪০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '১০ সংখ্যক পত্র', 'ভানুসিংহের পত্রাবলী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ৩৩৩

৪১. পম্পা মজুমদার, 'শিক্ষার বাহন', 'শিক্ষা', *রবীসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৭২, পৃ. ২১৬

৪২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ৫৩০

৪৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্বর্গীয় প্রহসন', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ৫৩২

৪৪. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *হিন্দুদের দেবদেবী—উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ*, প্রথম পর্ব, ফার্মা কে এল

এম (প্রাইভেট) লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ১৯৭৭, পৃ. ৩৭৫-৩৮৯

৪৫. তদেব।

৪৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৭ সংখ্যক রূপান্তর', বেদ সংহিতার রূপান্তর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১১৮৪

৪৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৮ সংখ্যক রূপান্তর', 'বেদ সংহিতার রূপান্তর', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১১৮৫

৪৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ', 'ব্যঙ্গকৌতুক', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ১৯৯৪, পৃ. ১৯৯

৪৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শেষের কবিতা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৬, পৃ. ৩২৫

৫০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ৭০

৫১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জাপানযাত্রী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ১৫৩

৫২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পঞ্চভূত', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ১৯৯৪, পৃ. ৭২

৫৩. তদেব।

৫৪. তদেব।

৫৫. সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত), *পৌরাণিক অভিধান*, এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৩৫, পৃ. ৫৬৭

৫৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রভাত-উৎসব', 'প্রভাত সংগীত', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৭২

৫৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পুরুষের উক্তি', 'মানসী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৩৪২

৫৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'লেখন', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৮২, পৃ. ৭২৮

৫৯. তদেব।

৬০. তদেব, পৃ. ৭৪০

৬১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাবিত্রী', 'পূরবী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৮২, পৃ. ৬১৯

৬২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '২৩ সংখ্যক কবিতা', 'জন্মদিনে', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৮৬২

৬৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কুর্‌চি', 'বনবাণী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৮২, পৃ. ৮৬০

৬৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ২১

৬৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আধুনিক কাব্য', 'সাহিত্যের পথে', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ৫০০

৬৬. সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত), *পৌরাণিক অভিধান*, এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৩৫, পৃ. ১৬৪

৬৭. ফরহাদ খান, 'প্রতীচ্য পুরাণ', *প্রতীক*, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, পৃ. ১২৭, ১৪০

৬৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '১৩ সংখ্যক কবিতা', 'খাপছাড়া', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৪৫০

৬৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পৃথিবী', 'পত্রপুট', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৩৫২

৭০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৯৪ সংখ্যক গান', 'প্রেম পর্যায়', *গীতবিতান*, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৮০, পৃ. ৩০৮

৭১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মায়ার খেলা', *গীতবিতান*, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ : পৌষ ১৩৮৬, পুনর্মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৩৮৪, পৃ. ৬৮০

৭২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ''য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ৭২

৭৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্বর্গীয় প্রহসন', 'ব্যঙ্গকৌতুক', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ৫৩৩

৭৪. তদেব।

৭৫. তদেব, পৃ. ৫৩৫

৭৬. তদেব, পৃ. ৫৩৬

৭৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ', 'ব্যঙ্গকৌতুক', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ১৯৯৪, পৃ. ২০০

৭৮. সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত), *পৌরাণিক অভিধান*, এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৩৫, পৃ. ৩৭৮

৭৯. স্বামী নির্ম্মলানন্দ, *দেবদেবী ও তাঁদের বাহন*, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, ষষ্ঠ সংস্করণ : ২৮ আষাঢ় ১৪১০, পৃ. ৭৫-৭৬

৮০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়', 'প্রভাত সংগীত', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : প্রকাশ : জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৮৫

৮১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রূপান্তর কবিতা', 'ভট্টনারায়ণ-বররুচি-প্রমুখ কবিগণ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১২০৫

৮২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৪১ সংখ্যক কবিতা', '*শেষ সপ্তক*', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ২০৫

৮৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'খাপছাড়ার উৎসর্গ কবিতা', খাপছাড়া, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৪৪১

৮৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '২ সংখ্যক কবিতা', 'ছড়া', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৮৭৭

৮৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিত্রকর', 'গল্পগুচ্ছ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ৫৭৫

৮৬. তদেব।

৮৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ঘোড়া', 'লিপিকা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ৬৩৫-৬৩৬

৮৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সে-র উৎসর্গপত্র', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ৬৭৩

৮৯. তদেব, পৃ. ৬৮৭

৯০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রজাপতি নির্বন্ধ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার,

কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৮৫, পৃ. ৫৩৮

৯১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', 'সাহিত্য', 'শিক্ষা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৮৮৯, পৃ. ৩৬৩-৩৬৪

৯২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছেলেভুলানো ছড়া', 'লোকসাহিত্য', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৮৮৯, পৃ. ১৮০

৯৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জাপানযাত্রী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ১৫০

৯৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিক্ষা সমস্যা', 'শিক্ষা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্দশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ৩২৫

৯৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চরকা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৬৯০-৬৯৮

৯৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অচলায়তন', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই, ১৯৮৪, পৃ. ৭৫৯

৯৭. সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত), *পৌরাণিক অভিধান*, এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৩৫, পৃ. ৩৫৮

৯৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়', 'প্রভাত সংগীত', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৮৭

৯৯. তদেব।

১০০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কবির প্রতি নিবেদন', 'মানসী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৩৮৩

১০১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৬ সংখ্যক কবিতা', 'জন্মদিনে', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৮৪৬

১০২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '১১ সংখ্যক কবিতা', 'শেষলেখা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৯০৭-৯০৮

১০৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিত্রকর', 'গল্পগুচ্ছ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ৫৭৫

১০৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সৌন্দর্যের ধৈর্য', 'কথাবার্তা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ

সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ১৯৯৪, পৃ. ৬৪

১০৫. মঙ্গলের সঙ্গেই সৌন্দর্যের বিষ্ণুর সঙ্গেই লক্ষ্মীর মিলন পূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সৌন্দর্যবোধ', 'সাহিত্য', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ৩২১

১০৬. তদেব, পৃ. ৩১৭

১০৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জাপানযাত্রী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ১৫৪

১০৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জাভাযাত্রীর পত্র', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ২৭৮

১০৯. তদেব, পৃ. ২৮০

১১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সমস্যা', 'রাজাপ্রজা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৯০, পৃ.

১১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছন্দের অর্থ', 'ছন্দ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ, ১৯৮৯, পৃ. ৮৫৫

১১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চরকা', 'কালন্তর', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৬১৩

১১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা', 'রাজাপ্রজা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫০৫

১১৪. সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত), *পৌরাণিক অভিধান*, এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৩৫, পৃ. ৫০৭

১১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মহাস্বপ্ন', 'প্রভাত সংগীত', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৮৫

১১৬. তদেব।

১১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রতিনিধি', 'কথা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৭২৯

১১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিচারক', 'কথা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৭৮২

১১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মদনভস্মের পর', 'কল্পনা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৮০৩

১২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৬৫ সংখ্যক কবিতা', 'নৈবেদ্য', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৯৯১

১২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '২৮ সংখ্যক কবিতা', 'উৎসর্গ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৮২, পৃ. ৮৬

১২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৪৭ সংখ্যক কবিতা', 'উৎসর্গ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৮২, পৃ. ১০৯

১২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভোলা', 'পলাতকা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৮২, পৃ. ৫২২

১২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আসল', 'পলাতক', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৮২, পৃ. ৫৩১

১২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিশু ভোলানাথ', 'শিশু ভোলানাথ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৮২, পৃ. ৫৪১

১২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৩২ সংখ্যক কবিতা', 'শেষসপ্তক', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১৯৩

১২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রণাম', 'পরিশেষ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৮৩, পৃ. ৮৮৯

১২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রণাম', 'পরিশেষ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৮২, পৃ. ৮৮৯

১২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জন্মদিন', 'পরিশেষ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৮২, পৃ. ৮৯২

১৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পান্থ', 'পরিশেষ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৮২, পৃ. ৮৯৪

১৩১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'হাসির পাথেয়', 'বনবাণী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৮২, পৃ. ৮৭৪

১৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অমর্ত্য', 'সেঁজুতি', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার,

কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৫৫৯

১৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রাজপুতানা', 'নবজাতক', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৬৯৫

১৩৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পক্ষীমানব', 'নবজাতক', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৬৯৯

১৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ক্যাণ্ডীয় নাচ', 'নবজাতক', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৭১৬

১৩৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৯ সংখ্যক কবিতা', 'আরোগ্য', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৮২৭

১৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৯ সংখ্যক কবিতা', 'জন্মদিনে', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৮২৭

১৩৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৭১ সংখ্যক গান', 'পূজা পর্যায়', *গীতবিতান*, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৮১, পুনর্মুদ্রণ : মাঘ ১৪০৬, পৃ. ৩৫

১৩৯. তদেব, '৯০ সংখ্যক গান', পৃ. ৪১-৪২

১৪০. তদেব, '৯৬ সংখ্যক গান', পৃ. ৪৪

১৪১. তদেব, '২০৬ সংখ্যক গান', পৃ. ৯২

১৪২. তদেব, '২২১ সংখ্যক গান', পৃ. ৯৭

১৪৩. তদেব, '২৩৪ সংখ্যক গান', পৃ. ১০২-১০৩

১৪৪. তদেব, '২৩৫ সংখ্যক গান', পৃ. ১০৩

১৪৫. তদেব, '২৮২ সংখ্যক গান', পৃ. ১২০

১৪৬. তদেব, '৫৭৫ সংখ্যক গান', পৃ. ২২৬

১৪৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গিন্নি', 'গল্পগুচ্ছ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ, ১৯৮৮, পৃ. ২৯

১৪৮. তদেব।

১৪৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রাজটীকা', 'গল্পগুচ্ছ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ২৯৬

১৫০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবিবার', 'তিনসঙ্গী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার,

কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ৭৩৯

১৫১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাঁশি', 'লিপিকা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ৬১৭

১৫২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গোরা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৮৫, পৃ. ৮৪৬

১৫৩. ...আপাতত সেই বিষ্ণুদূতটাকে মনে মনে ক্ষমা করলুম, কিন্তু ভগবান ভূতনাথ ভবানীপতির অনুচরগুলোর উপর ভারি সন্দেহ হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রজাপতি নির্বন্ধ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৮৫, পৃ. ৫৪৭

১৫৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শেষের কবিতা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৮৫, পৃ. ৩৫০

১৫৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ঘরে-বাইরে', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৮৫, পৃ. ১০৪

১৫৬. তদেব, 'মালঞ্চ', পৃ. ৪৩

যখন কুমারসম্ভব পড়লে তখন থেকে শিব পূজায় সে শিবকে দেখতে পেলে, সেই মহাতপস্বী যিনি তপস্বিনী উমার পরম তপস্যার ধন।

১৫৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'যোগাযোগ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৮৫, পৃ. ১৯৩

১৫৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'যোগাযোগ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৮৫, পৃ. ২৯৮

১৫৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চার অধ্যায়', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৮৫, পৃ. ৪৮০

১৬০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', 'সাহিত্য', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ৩৬৩

১৬১. তদেব।

১৬২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্য পরিষৎ', 'সাহিত্য', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ৪৩০

১৬৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রসঙ্গকথা-১', 'সমূহ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার,

কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৩০৬

১৬৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৪৭ সংখ্যক অধ্যায়', 'পথে ও পথের প্রান্তে', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ৫২৫

১৬৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অপূর্ব রামায়ণ', 'পঞ্চভূত', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ১৯৯৪, পৃ. ১২৮

১৬৬. পম্পা মজুমদার, *রবীন্দ্র সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৭২, প্রথম দে'জ সংস্করণ : জুলাই ১৯৭২, পৃ. ২০৩

১৬৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পাগল', 'বিচিত্রপ্রবন্ধ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ১৯৯৪, পৃ. ১৭০

১৬৮. তদেব, পৃ. ১৭১

১৬৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই, ১৯৮৪, পৃ. ২৬

১৭০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মুক্তধারা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই, ১৯৮৪, পৃ. ৮৪২

১৭১. সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত), *পৌরাণিক অভিধান*, এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৩৫, পৃ. ৩৫২

১৭২. স্বামী নির্ম্মলানন্দ, *দেবদেবী ও তাঁদের বাহন*, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ: ২৮ আষাঢ় ১৪১০, পৃ. ৭৭-৮৮

১৭৩. মানুষের অহংকারপটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।
....
একে বোলো না তত্ত্ব
আমার মন হয়েছে পুলকিত
বিশ্ব আমির রচনার আসরে
হাতে নিয়ে তুলি, পাত্রে নিয়ে রঙ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আমি', 'শ্যামলী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৩৯২

১৭৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছিন্নপত্র', 'পলাতকা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৮২, পৃ. ৫২৫

১৭৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শুভদৃষ্টি', 'গল্পগুচ্ছ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ৩২৭

১৭৬. আমাদের মনের মধ্যে যে বিশ্বকর্মা আছেন, যিনি আমাদের অন্তরের নিভৃত সৃজনকক্ষে বসিয়া নানা গঠন, নানা বিন্যাস নানা প্রয়াস নানা প্রকাশচেষ্টায় সর্বদা নিযুক্ত আছেন, পদ্যে তাঁহারই নিপুণ হস্তের কারুকাজ অধিক আছে। সেই তাঁহার প্রধান গৌরব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গদ্য ও পদ্য', 'পঞ্চভূত', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ১৯৯৪, পৃ. ১০৪

১৭৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা', 'সাহিত্যের স্বরূপ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ৫৮৯

১৭৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শান্তিনিকেতন', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্দশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮২, পৃ. ৭৪৯

১৭৯. তদেব, পৃ. ৭৫০

১৮০. তদেব।

১৮১. তদেব।

১৮২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভানুসিংহের পত্রাবলী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ৩৪৩

১৮৩. তদেব, পৃ. ৩৪৪

১৮৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিদ্যাসাগরচরিত', 'চরিত্রপূজা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, আগস্ট ১৯৮৯, পৃ. ১৭৪

১৮৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জাভাযাত্রীর পত্র', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ২৭৪

১৮৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মাভৈঃ', 'বিচিত্রপ্রবন্ধ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, আগস্ট ১৯৯৪, পৃ. ১৫৯

১৮৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জাভাযাত্রীর পত্র', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ২৮৩

১৮৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আত্মপরিচয়', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ১৯৮৯, পৃ. ১৫৬

১৮৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'তথ্য ও সত্য', 'সাহিত্যের পথে', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ

সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ৪৪৮

১৯০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভূমিকা', 'মানুষের ধর্ম', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্দশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ৭৪৯

১৯১. তদেব।

১৯২. তদেব।

১৯৩. তদেব।

১৯৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'খৃস্টোৎসব', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ১৯৮৯, পৃ. ২৬৪

১৯৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রাশিয়ার চিঠি', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ৩৯৭

১৯৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জাভাযাত্রীর পত্র', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ৩৬৯

১৯৭. সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত), *পৌরাণিক অভিধান*, এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আষাঢ়, ১৩৩৫, পৃ. ১৪০

১৯৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিজ্ঞ', 'শিশু', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৮২, পৃ. ২২

১৯৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '১৩ সংখ্যক ছড়া', 'খাপছাড়া', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৪৪৮

২০০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ', 'পঞ্চভূত', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ১৯৯৪, পৃ. ১২২

২০১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ', 'জীবনস্মৃতি', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ১৯৮৯, পৃ. ৭০

২০২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অনুবাদ চর্চা', 'বাংলা শব্দতত্ত্ব', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ৭৩৩

২০৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ২১৫

২০৪. তদেব, পৃ. ২২৪

২০৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জাভাযাত্রীর পত্র', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ২৭৯

২০৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শেষের কবিতা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৬, পৃ. ৩৩৫

২০৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আশ্রমপীড়া', 'হাস্যকৌতুক', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ৫০৪

২০৮. সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত), *পৌরাণিক অভিধান*, এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৩৫, পৃ. ৯৮

২০৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গদ্যছন্দ', 'পত্রধারা : তৃতীয় পর্যায়-১', 'ছন্দ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ৯১৭

২১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরি', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ২২৪

২১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গিন্নি', 'গল্পগুচ্ছ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ, ১৯৮৮, পৃ. ২৯

২১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিচারক', 'গল্পগুচ্ছ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ১৯৯

২১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ''শেষকথা'', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ৭৫০

২১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি', ব্যঙ্গকৌতুক, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ৫৩০

২১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রাচীনদেবতার নূতন বিপদ', 'ব্যঙ্গকৌতুক', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ১৯৯৪, পৃ. ১৯৯

২১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গুরুবাক্য', 'হাস্যকৌতুক', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ৫১৪

২১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গোড়ায় গলদ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ২৮৮

২১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শোধবোধ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম

সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ১২৫

২১৯. তদেব, পৃ. ১২৯

২২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিরকুমার সভা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ৬

২২১. তদেব।

২২২. তদেব, পৃ. ৩৩

২২৩. তদেব।

২২৪. কিন্তু কার্তিক কি কেবল সুপুরুষ ছিলেন। তিনিই ছিলেন স্বর্গের সেনাপতি।

তদেব।

২২৫. তদেব।

২২৬. আমিও পালোয়ানিকে বীরত্বের আদর্শ বলে মানি নে।

তদেব।

২২৭. সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত), *পৌরাণিক অভিধান*, এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আষাঢ়, ১৩৩৫, পৃ. ৪০৪

২২৮. ফরহাদ খান, 'প্রতীচ্য পুরাণ', *প্রতীক*, প্রথম প্রতীক সংস্করণ : বইমেলা ১৯৯৬, পৃ. ৩৯ এবং ৪৫

২২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বর্ষাযাপন', 'সোনার তরী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৪৫২

২৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিজয়িনী','চিত্রা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৬২৩

২৩১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'তপোভঙ্গ', 'পূরবী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৮২, পৃ. ৬০২

২৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নির্ভয়', 'মহুয়া', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৮২, পৃ. ৭৯১

২৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মৃত্যুঞ্জয়', 'পরিশেষ'', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৮৬, পৃ. ৯৫৬

২৩৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '২৩৮ সংখ্যক গান', 'পূজা পর্যায়', *গীতবিতান*, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৮৬, পুনর্মুদ্রণ : মাঘ ১৪০৬, পৃ. ১০৪

২৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '২৩৮ সংখ্যক গান', প্রকৃতি পর্যায়, *গীতবিতান*, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৮০, পৃ. ৫২১

২৩৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মেঘ ও রৌদ্র', 'গল্পগুচ্ছ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ১৮১

২৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চোখের বালি', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৮৫, পৃ. ২৬৩

২৩৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা', 'প্রাচীন সাহিত্য', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ১২০

২৩৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মন', 'পঞ্চভূত', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ১৯৯৪, পৃ. ৯৭

২৪০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রক্তকরবী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ২১৬

২৪১. তদেব, পৃ. ২৩৩

২৪২. ফরহাদ খান, 'প্রতীচ্য পুরাণ', *প্রতীক*, প্রথম প্রতীক সংস্করণ : বইমেলা, ১৯৯৬, পৃ. ১২৯-১৩৩

২৪৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রাজা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ৬৬৬

২৪৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিত্রাঙ্গদা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই, ১৯৮৪, পৃ. ২৪৩

২৪৫. তদেব, পৃ. ২৬২

২৪৬. সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত), *পৌরাণিক অভিধান*, এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৩৫, পৃ. ১২১

২৪৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সুখের স্মৃতি', 'ছবি ও গান', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮০, পৃ. ১৩১

২৪৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মধ্যাহ্নে', 'ছবি ও গান', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮০, পৃ. ১৪৮

২৪৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মথুরায়', 'কড়ি ও কোমল', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮০, পৃ. ২০২

২৫০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'খেলা', 'কড়ি ও কোমল', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই, ১৯৮০, পৃ. ২৩৯

২৫১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিরহ', 'কড়ি ও কোমল', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮০, পৃ. ২৪৪

২৫২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পসারিণী', 'কল্পনা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৮০৮

২৫৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৩১ সংখ্যক কবিতা', 'নৈবেদ্য', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৯৭৬

২৫৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'খেলা', 'শিশু', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৮২, পৃ. ৬

২৫৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৪ সংখ্যক কবিতা", 'বলাকা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৮২, পৃ. ৪৪২

২৫৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নীলমণিলতা', 'বনবাণী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৮২, পৃ. ৮৫৮

২৫৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাঁশিওয়ালা', 'শ্যামলী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৪১৪

২৫৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৮২ সংখ্যক গান', 'পূজা পর্যায়', *গীতবিতান*, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৮১, পুনর্মুদ্রণ : মাঘ ১৪০৬, পৃ. ৩৯

২৫৯. তদেব, '২২২ সংখ্যক গান', পৃ. ৯৮

২৬০. তদেব, '৫২০ সংখ্যক গান', পৃ. ২০৫

২৬১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৫৬ সংখ্যক গান', 'প্রেম পর্যায়', *গীতবিতান*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৮০, পৃ. ২৯৪

২৬২. তদেব, '২২০ সংখ্যক গান', পৃ. ৩৫৮

২৬৩. তদেব, '৩০৫ সংখ্যক গান', পৃ. ৩৯২-৩৯৩

২৬৪. তদেব, '৩৭২ সংখ্যক গান', পৃ. ৪১৬

২৬৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অতিথি', 'গল্পগুচ্ছ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ২৫৫

২৬৬. তদেব, 'স্ত্রীর পত্র', পৃ. ৫০৬

২৬৭. তদেব, 'মানভঞ্জন', পৃ. ২২৫

২৬৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'যোগাযোগ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৬, পৃ. ১৯১

২৬৯. তদেব, পৃ. ২৩৯

২৭০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮১, পৃ. ৩৪

২৭১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কৌতুকহাস্য', 'পঞ্চভূত', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ১৯৯৪, পৃ. ১১৫

২৭২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাঁশির স্বর', 'বৈষ্ণব কবির গান', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ১৯৯৪, পৃ. ৬৪

২৭৩. তদেব, পৃ. ৬৫

২৭৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কবিসংগীত', 'লোকসাহিত্য', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ১৯২

২৭৫. তদেব, 'গ্রাম্য সাহিত্য', পৃ. ১৯৬

২৭৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যে চিত্রবিভাগ', 'সাহিত্যের স্বরূপ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ৫৮৭

২৭৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', 'সাহিত্য', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ৩৭৩-৩৭৪

২৭৮. তদেব, বিশ্বসাহিত্য, পৃ. ৩২৪

২৭৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জাভাযাত্রীর পত্র', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ২৮৭

২৮০. তদেব, 'জাপানযাত্রী', পৃ. ১৬২

২৮১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছেলেবেলা' *রবীন্দ্র রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ১৯৮৯, পৃ. ৯৭

২৮২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শারোদোৎসব, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ৫৫৯

২৮৩. সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত), *পৌরাণিক অভিধান*, এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৩৫, পৃ. ৬৯

২৮৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিকাহিনী, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৯১৯

২৮৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রূপান্তর : বেদ : সংহিতা ও উপনিষৎ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১১৮৫

২৮৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'লেখন', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৮২, পৃ. ৭২৮

২৮৭. তদেব, পৃ. ৭৪০

২৮৮. তদেব, পৃ. ৭৪১

২৮৯. তদেব, পৃ. ৭৪৩

২৯০. মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু,
উষার কোলে যেন শুকতারা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিশুতীর্থ', 'পুনশ্চ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৭৩

২৯১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পয়লা আশ্বিন', 'পুনশ্চ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৭৯

২৯২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'দান', 'বিচিত্রিতা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১২০

২৯৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'দ্বৈত', 'শ্যামলী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৩৮৯

২৯৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৩৩৫ সংখ্যক গান', 'পূজা পর্যায়', *গীতবিতান*, সাহিত্যম্, প্রথম সংস্করণ : ১ বৈশাখ, ১৪০৯, পৃ. ১৬৩

২৯৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'যোগাযোগ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৬, পৃ. ২৫০

২৯৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সমাপ্তি', 'গল্পগুচ্ছ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ১৫৪

২৯৭. সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত), *পৌরাণিক অভিধান*, এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৩৫, পৃ. ৫৪১

২৯৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'হিন্দুমেলায় উপহার', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১০৮৭

২৯৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রকৃতির খেদ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১০৯৯

৩০০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কুহুধ্বনি', 'মানসী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৩২৯

৩০১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মানসসুন্দরী', 'সোনার তরী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৪৮০

৩০২. তদেব, 'পুরস্কার', পৃ. ৫২৭

৩০৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অন্তর্যামী', 'চিত্রা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৫৮৭-৫৮৮

৩০৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নয় সংখ্যক কবিতা', 'স্মরণ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮০, পৃ. ১০১৭

৩০৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '১১ সংখ্যক গান', 'গীতাঞ্জলি', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ১৯৮২, পৃ. ২০০, ২০১

৩০৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৫০ সংখ্যক গান', 'গীতিমাল্য', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৮২, পৃ. ৩২৮

৩০৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '২০৯ সংখ্যক গান', 'পূজাপর্যায়', *গীতবিতান*, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৮৬, পুনর্মুদ্রণ, মাঘ ১৪০৬, পৃ. ৯৩

৩০৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '২৯ সংখ্যক গান', 'প্রেম পর্যায়', *গীতবিতান*, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৭৭, পৃ. ২৮৬

৩০৯. তদেব, '৩৩ সংখ্যক গান', পৃ. ২৮৩

৩১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নৌকাডুবি', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৮৫, পৃ. ৩৬৩

৩১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ঘরে-বাইরে', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা,

প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৬, পৃ. ১৬

৩১২. বীণাপাণি শ্বেতভূজা, তুমি যদি তোমার কমলবন শূন্য করিয়া আজ মল্লভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইলে তবে তোমার চরণাসক্ত যে ভক্তগণ অমৃতপিপাসী, তাহাদের কী গতি হইবে?
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জয় পরাজয়', 'গল্পগুচ্ছ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ১০৩

৩১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বঙ্কিমচন্দ্র', 'আধুনিক সাহিত্য', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ২২১

৩১৪. বিজনবিলাসী সরস্বতী এমন সভায় অধিক্ষণ টিঁকিতে পার না।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কবিসংগীত', 'লোকসাহিত্য', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ১৮৯

৩১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্য সম্মিলন', 'সাহিত্যের পথে', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ৫২৩

৩১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের বিচারক', 'সাহিত্য', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ৩১৩

৩১৭. তদেব, 'সৌন্দর্যবোধ', পৃ. ৩২৩

৩১৮. তদেব।

৩১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রূপ ও অরূপ', 'সঞ্চয়', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্দশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ৯৫৪

৩২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '১০ সংখ্যক অধ্যায়', 'বিশ্বভারতী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্দশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ৫১৮

৩২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আদিম আর্যনিবাস', 'সমাজ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯১০, পৃ. ৪৬৯

৩২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রায়তের কথা', 'কালান্তর', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৬০, পৃ. ৭০৭

৩২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আদিম আর্যনিবাস', 'সমাজ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৬০, পৃ. ৪৬৯

৩২৪. পম্পা মজুমদার, *রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৭৯, প্রথম দে'জ সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ. ২২৮

৩২৫. মা সরস্বতী যখন ভাগের মা হইয়া দাঁড়ান তখন তাহার সদ্গতি হয় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিক্ষার হেরফের', 'শিক্ষা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্দশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ৩১৩

৩২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৭ সংখ্যক প্রবন্ধ', 'জাপানে-পারস্যে', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ৪৭৩

৩২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৮ সংখ্যক পত্র', 'ভানুসিংহের পত্রাবলী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ৩৩১

৩২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাল্মীকি প্রতিভা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ১৮

৩২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পুরস্কার', 'সোনার তরী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৫১৮

৩৩০. সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত), *পৌরাণিক অভিধান*, এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা. লি., প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৩৫, পৃ. ৪৮৪

৩৩১. স্বামী নির্ম্মলানন্দ, *দেবদেবী ও তাঁদের বাহন*, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ: ২৮ আষাঢ়, ১৪১০, পৃ. ১৫৯-১৭৩

৩৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পরশপাথর', 'সোনার তরী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৪৫৯

৩৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জ্যোস্নারাত্রে', 'চিত্রা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৫৬৪

৩৩৪. তদেব, পৃ. ৫৬৫

৩৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্বর্গ হইতে বিদায়', 'চিত্রা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৬১৪

৩৩৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রিয়া', 'চৈতালি', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৬৭৫

৩৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৬ সংখ্যক কবিতা', 'স্মরণ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮০, পৃ. ১০১৬

৩৩৮. তদেব, '২২ সংখ্যক কবিতা', পৃ. ১০২৪

৩৩৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'দুই নারী', 'বলাকা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, মে ১৯৮২, পৃ. ৪৬৮-৪৬৯

৩৪০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মুক্তি', 'পলাতকা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, মে ১৯৮২, পৃ. ৪৯৯

৩৪১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৪৩ সংখ্যক কবিতা', 'শেষ সপ্তক', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ২১১

৩৪২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '১৫২ সংখ্যক গান', 'পূজা পর্যায়', *গীতবিতান*, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৮১, পুনর্মুদ্রণ, মাঘ ১৪০৬, পৃ. ৭০

৩৪৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শেষের কবিতা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৬, পৃ. ৩৩৪

৩৪৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'যোগাযোগ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৬, পৃ. ২১৯

৩৪৫. তদেব, পৃ. ১৮৩

৩৪৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ঘরে-বাইরে', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৬, পৃ. ১০৯

৩৪৭. তদেব, পৃ. ৫৫

৩৪৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চোখের বালি', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৮৫, পৃ. ২০৪

৩৪৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গোরা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৮৫, পৃ. ৮৩২

৩৫০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বৌঠাকুরাণীর হাট', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৮৫, পৃ. ১৬

৩৫১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'দুর্বুদ্ধি', 'গল্পগুচ্ছ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ৩২২

৩৫২. তদেব, 'অধ্যাপক', পৃ. ২৮২

৩৫৩. বন্দরে আসিয়া লোহার সিন্দুকটি যখন পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন তখন দেখিতে পাইলেন, লক্ষ্মী পেঁচার বাসাটি একেবারে শূন্য— সামান্য দুটো কেটা সোনার পালক খসিয়া পড়িয়া আছে।
তদেব, 'রাসমণির ছেলে', পৃ. ৪৩৮

৩৫৪. তদেব, 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ', পৃ. ৩৩০

৩৫৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নরনারী', 'পঞ্চভূত', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ১৯৯৪, পৃ. ৮৬

৩৫৬. তদেব, 'সৌন্দর্যের সম্বন্ধ', পৃ. ৭৬

৩৫৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সৌন্দর্য ও প্রেম', 'আলোচনা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ১৯৯৪, পৃ. ৫৬

৩৫৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছন্দের অর্থ', 'ছন্দ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ৮৫৫

৩৫৯. তদেব।

৩৬০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ৪৪৩

৩৬১. তদেব, ''সৃষ্টি'', পৃ. ৪৫৬

৩৬২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জাপানযাত্রী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ১৫৭

৩৬৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরি', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ২২০

৩৬৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জলস্থল', 'পথের সঞ্চয়', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ৫৪৪

৩৬৫. তদেব, 'খেলা ও কাজ', পৃ. ৫৮১

৩৬৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৪৭ সংখ্যক প্রবন্ধ', 'পথে ও পথের প্রান্তে', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ৫২৫

৩৬৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রূপ ও অরূপ', 'সঞ্চয়', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্দশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ৯৫৪

৩৬৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চরকা', 'কালান্তর', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৬৯২

৩৬৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পল্লীপ্রকৃতি', 'পল্লীপ্রকৃতি', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৭৭১

৩৭০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শারদোৎসব', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ৫৭৫

৩৭১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ফাল্গুনী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ৭৯৫

৩৭২. তদেব।

৩৭৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শেষবর্ষণ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ১৮৮

৩৭৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মালিনী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ৩৫৯

৩৭৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা', 'কাহিনী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৪৪০-৪৪১

৩৭৬. তদেব।

৩৭৭. সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত), *পৌরাণিক অভিধান*, এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৩৫, পৃ. ২২৩

৩৭৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আট সংখ্যক কবিতা', 'শেষসপ্তক', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১৫৪

৩৭৯. তদেব, 'সাঁইত্রিশ সংখ্যক কবিতা', পৃ. ১৯৯

৩৮০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পয়লা আশ্বিন', 'পুনশ্চ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৭৯

৩৮১. অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৩ সংখ্যক কবিতা' (পৃথিবী), 'পত্রপুট', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর, ১৯৮৩, পৃ. ৩৫১

৩৮২. নটরাজ নৃত্য করে নব নব সুন্দরের নাটে,
বসন্তের পুষ্পরঙ্গ শস্যের তরঙ্গে মাঠে মাঠে।
তাঁহারি অক্ষয় নৃত্য, হে গৌরী, তোমার অঙ্গে মনে,
চিত্তের মাধুর্য তব, ধ্যানে তব, তোমার লিখনে।

The Eternel Dancer dances
in the harvest in autumn,
in thy limits, my child,
in thy thoughts and dreams.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'লেখন', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৮২, পৃ. ৭৪৬

৩৮৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাগরিকা', 'মহুয়া', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৮২, পৃ. ৮০০

৩৮৪. তদেব, পৃ. ৮০১

৩৮৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কাবুলিওয়ালা', 'গল্পগুচ্ছ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ১০৯

৩৮৬. তদেব, 'মহামায়া', পৃ. ১১৯

৩৮৭. তদেব, 'দৃষ্টিদান', পৃ. ৩০৬

৩৮৮. তদেব, 'নামঞ্জুর গল্প', পৃ. ৫৬৩

৩৮১. তদেব, পৃ. ৫৬২

৩৯০. তদেব, 'প্রতিহিংসা', পৃ. ২৩৬

৩৯১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পুনরাবৃত্তি', 'লিপিকা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ৬৪৯-৬৫০

৩৯২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ঘরে-বাইরে', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৬, পৃ. ৭

৩৯৩. তদেব, পৃ. ৩৪

৩৯৪. তদেব, পৃ. ১৭

৩৯৫. তদেব, পৃ. ৫৪

৩৯৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'যোগাযোগ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৬, পৃ. ২১৫

৩৯৭. তদেব,পৃ. ২১৮

৩৯৮. তদেব, পৃ. ২০০

৩৯৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শেষের কবিতা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৬, পৃ. ৩৫৯

৪০০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'দুইবোন', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৬, পৃ. ৪০৩

৪০১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চোখের বালি', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৮৫, পৃ. ২৬১

৪০২. তদেব, পৃ. ২৩০

৪০৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রজাপতি নির্বন্ধ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৮৫, পৃ. ৫৩০

৪০৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চার অধ্যায়', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৬, পৃ. ৪৮০-৮১

৪০৫. তদেব, পৃ. ৫০৩

৪০৬. তদেব, পৃ. ৫০১

৪০৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সৌন্দর্যবোধ', 'সাহিত্য', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ৩২২

৪০৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গ্রাম্যসাহিত্য', 'লোকসাহিত্য', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ১৯৯

৪০৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাংলা শব্দতত্ত্ব', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ৬৯০

৪১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বর্ষা ও শরৎ', 'জীবনস্মৃতি', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ১৯৮৯, পৃ. ৮৮

৪১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছেলেবেলা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ১৯৮৯, পৃ. ১০৫

৪১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ২২৪

৪১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জাভাযাত্রীর পত্র', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ২৯০

৪১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা', 'পরিচয়', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ৫০৬

৪১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভগিনী নিবেদিতা', 'পরিচয়', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ৫৩৮

৪১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিক্ষার মিলন', 'শিক্ষা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্দশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ৩৯২

৪১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '২০ সংখ্যক পত্র', ' ভানুসিংহ ঠাকুরের পত্রাবলী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ৩৪৩

৪১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আমেরিকার চিঠি', 'পথের সঞ্চয়', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ৫৯৩

৪১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জাপানযাত্রী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ১৫৭

৪২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রাজা ও রাণী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ৯২

৪২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিসর্জন', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ১৭৮

৪২২. তদেব, পৃ. ২৩৬

৪২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গোড়ায় গলদ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ৩১০

৪২৩. সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত), *পৌরাণিক অভিধান*, এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা, নবম সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৪১০, পৃ. ১০৫

৪২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পনেরো সংখ্যক কবিতা', 'পত্রপূট', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৩৭৬

৪২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মোহনা', 'পরিশেষ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৮২, পৃ. ৯১১

৪২৭. তদেব, 'বক্সাদুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি'।

৪২৮. ...একদা প্রলয়শিঙা বাজিয়া রে উঠিবে!
অমনি নিভিবে রবি, অমনি মিশাবে তারা
অমনি এ জগতের রাশ-রজ্জু টুটিবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'হর-হৃদে কালিকা', 'শৈশবসঙ্গীত', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১০৫৭

৪২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '১৬০ সংখ্যক গান', 'পূজা পর্যায়', *গীতবিতান*, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী

গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : বৈশাখ, ১৩৮৬, পুনর্মুদ্রণ : মাঘ ১৪০৬, পৃ. ৭৩

৪৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '২১ সংখ্যক গান', 'স্বদেশ পর্যায়', *গীতবিতান*, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : বৈশাখ, ১৩৮১, পুনর্মুদ্রণ : মাঘ ১৪০৬, পৃ. ২৫৬

৪৩১. তদেব।

৪৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রাজর্ষি', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর, ১৯৮৫, পৃ. ১১৫

৪৩৩. তদেব, পৃ. ১৩২

৪৩৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রজাপতি নির্বন্ধ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৮৫, পৃ. ৫২৬

৪৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ঘরে-বাইরে', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, জুলাই ১৯৮৬, পৃ. ৫৩

৪৩৬. তদেব, পৃ. ৮৮

৪৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চোখের বালি', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৮৫, পৃ. ২৬১

৪৩৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অনধিকার প্রবেশ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ১৭১

৪৩৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাকার ও নিরাকার', 'আধুনিক সাহিত্য', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ২৮৩

৪৪০. পম্পা মজুমদার, *রবীন্দ্রসংস্কৃতি ভারতীয় রূপ ও উৎস*, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৭২, প্রথম দে'জ সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ. ২১১

৪৪১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জাপানযাত্রী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ১৯৮৯, পৃ. ১৫৭

৪৪২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাতায়নিকের পত্র', 'কালান্তর', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৬২২

৪৪৩. তদেব।

৪৪৪. তদেব, 'শক্তিপূজা', পৃ. ৬৩৬

৪৪৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ধর্ম', 'আলোচনা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চদশ খণ্ড, প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ১৯৯৪, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, পৃ. ৪৯

৪৪৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জাভাযাত্রীর পত্র', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ৩১৩

৪৪৭. তদেব, পৃ. ২৮৬

৪৪৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাল্মীকি প্রতিভা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ৭

৪৪৯. তদেব, পৃ. ৮

৪৫০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিসর্জন', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ১৯৮৪, পৃ. ১৮৩

৪৫১. তদেব, পৃ. ২০৮

৪৫২. তদেব, পৃ. ১৯০

৪৫৩. তদেব, পৃ. ১৯৯

৪৫৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৬৮ সংখ্যক পত্র', *ছিন্নপত্রাবলী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, নূতন সংস্করণ : চৈত্র ১৩৯৯, পৃ. ১০৮

৪৫৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কালান্তর', 'কালান্তর', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯১০, পৃ. ৫৮৯

৪৫৬. তদেব, 'বাতায়নিকের পত্র', পৃ. ৬২২

৪৫৭. তদেব, পৃ. ৬৩০

৪৫৮. তদেব।

৪৫৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯১০, পৃ. ৫৮০-৫৮১

৪৬০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি', 'সমালোচনা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ২২

৪৬১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্বর্গীয় প্রহসন', 'ব্যঙ্গকৌতুক', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ৫৩৪

৪৬২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নতুনকাল', 'সেঁজুতি', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৫৬৭

৪৬৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '১৫৯ সংখ্যক পত্র', *ছিন্নপত্রাবলী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, নূতন সংস্করণ : চৈত্র ১৩৯৯, পৃ. ২৪২

চতুর্থ অধ্যায়

সাহিত্যে দেবতা ভাবনার অন্তরালে রবীন্দ্রমনস্তত্ত্ব

রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছিল 'সেকেলে কলকাতায়'।[১] উনিশ শতকের জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে তখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সদ্য প্রচলন করেছিলেন অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম। দ্বারকানাথ, রামমোহনও ব্রাহ্মধর্মের অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু তাঁর আমলে পারিবারিক পূজাপার্বণ সবই নিষ্ঠার সঙ্গে বজায় রেখেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে আনুষ্ঠানিক দীক্ষা গ্রহণের পরে সেই অনুষ্ঠানগুলি তুলে দিতে থাকেন। দ্বারকানাথের শ্রাদ্ধের সময় হিন্দুধর্মের আচারপদ্ধতি না মানার কারণে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের জন্মের ঠিক আগে গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দনকে নিয়ে গিরীন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী দেবেন্দ্রনাথের পরিবারের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অন্নপ্রাশন ও নামকরণ উৎসব সম্পূর্ণ ব্রাহ্ম রীতিতেই হয়েছিল। অর্থাৎ, আশৈশব এক কট্টর ব্রাহ্ম আবহাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ প্রতিপালিত হয়েছিলেন। পৌত্তলিক উৎসব অনুষ্ঠানের পরিবর্তে মাঘোৎসব, বর্ষশেষ, নববর্ষ ইত্যাদি ব্রহ্মোপাসনামূলক অনুষ্ঠানসমূহ দেখেই পরিণত হয়ে উঠছিলেন রবীন্দ্রনাথ।[২] তবু, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে যে নীরবে প্রবহমান ছিল পৌত্তলিক আবহাওয়া তা আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। অন্দরমহলে এবং চাকরদের তোষাখানায় রবীন্দ্রনাথের শৈশবের বেশিরভাগ সময় কাটত। ফলে, নারী এবং ভৃত্যমহলের যুক্তিবোধহীন সরল পুতুলপুজো তথা দেবসংস্কার রবীন্দ্রনাথের মগ্নচেতনে যে প্রভাববিস্তার করবে একথা বলাই বাহুল্য। শিশু রবীন্দ্রনাথ তাঁদের পালোয়ান জমাদারকে রাগানোর জন্য 'রাধাকৃষ্ণ' বলে চিৎকার করে উঠতেন।[৩] দিশি গান শেখার সময় 'গণেশের মা' আর 'কলাবৌ'-এর কল্পিত দেবপরিবারকে সুরের সাধনার অংশ করে নিয়েছিলেন।[৪] 'কাঠের সিঙ্গি'কে বলি দেওয়ার মতো ভয়ানক খেলা ওই ব্রাহ্মপরিবারে খেলার সাহস দেখিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কারণ, পূজায় বলিদানের গল্পটা তাঁর জানা ছিল।[৫] ব্রজেশ্বর নামের ভৃত্যের কাছে কৃত্তিবাসের সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে ফেলেছিলেন। কিশোরী চাটুজ্যের কাছে মুগ্ধ হয়ে শুনতেন সাতকাণ্ড রামায়ণের গল্প। এই মুগ্ধতা আজীবন তাঁকে আবিষ্ট করে রেখেছিল। বিশু ডাকাতের গল্প, একটি মেয়ের কালী সেজে, খাঁড়া হাতে ডাকাতদের কাছ থেকে প্রণামী আদায় করার গল্প, মায়ের কাছে বসে সুললিত কণ্ঠে রামায়ণ পাঠের স্মৃতি— এই সব কিছুর মধ্যে দিয়েই বোঝা যায় তথাকথিত ব্রাহ্মপরিবারের এই বিখ্যাত সন্তানটির মনের গহনে দেবসংস্কার থাকাটা অস্বাভাবিক ছিল না।

সারাজীবন ধরে বহু বিচিত্র বিষয়ের অধ্যয়ন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যের বিষয় হিসেবে অনেকসময়ই দেবদেবীদের প্রসঙ্গ এসেছিল। ১৮৮১ সালে রবীন্দ্রনাথের আঁকা একটি ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। ছবিটির নাম— KRISHNA RADHA। ছবির ওপরে লেখা ছিল— 'বাঁশরী বাজিল যমুনায়,/শুনিয়ে শ্যামের বাঁশি/চিত হইল উদাসী/বাঁশি কুল মজাইতে চায়'। প্রশান্তকুমার পাল এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—

> ছত্রগুলি উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বৈষ্ণবপদচর্চার প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করেছেন।[৬]

সেই বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ রবীন্দ্রনাথের পাঠ্যতালিকা বিশ্লেষণ করে আমরা দেখিয়েছি তাঁর বৈষ্ণবপদচর্চার কথা। আমাদের লক্ষ করার মতো বিষয় হল রবীন্দ্রনাথের মনে কৃষ্ণ বিগ্রহটির কল্পনা এবং চিত্রের আকারে তা প্রকাশ করার প্রবণতাটি। আরো একটি উল্লেখ করার মতো দিক হল ১৮৮৬ সালেই আঁকা মৃণালিনী দেবীর সময়কার ছবিগুলির তলায় 'সপ্তমী পূজা', 'অষ্টমী পূজা' ও 'নবমী পূজা' এই তিনটি দিনের উল্লেখ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তারিখগুলি ছিল ৪, ৫ এবং ৬ অক্টোবর। এর কয়েকদিন পর তার প্রথম কন্যা মাধুরীলতার জন্ম হয়। ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথকে দুর্গাপূজার বিশেষ দিনগুলির উল্লেখ করতে দেখে দুর্বোধ্য লাগার কোনো কারণ নেই। কারণ, ঘরের উমার আগমনের শুভসূচনা মুহূর্তে নিজের অজান্তেই তাঁর হিন্দু পৌত্তলিক মনটি এই দিনগুলির উল্লেখের মধ্যে নিজের সাক্ষ্য রেখে গিয়েছিল।[৭] এরপরে, যখন শিলাইদহে জমিদারির কাজে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তখন তাঁর দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভরা হিন্দু মনটিকে সত্যিই খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল।

শিলাইদহ এবং তার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির অধিষ্ঠাতা দেববিগ্রহ ছিল গোপীনাথের। তাঁর পূজা পরিচালনা করতেন ঠাকুরপরিবার। ব্রাহ্ম হলেও রবীন্দ্রনাথ খালি পায়ে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতেন, প্রসাদ গ্রহণ করতেন। রবীন্দ্রনাথ আড়ম্বরের সঙ্গে ভাইপো সুরেন্দ্রনাথকে গোপীনাথের মন্দিরে নিয়ে গিয়ে তাঁর 'অভিষেক' করিয়েছিলেন। রথীন্দ্রনাথ নববধূকে নিয়ে গোপীনাথের চরণামৃত গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনুমতি ছাড়া তা সম্ভব ছিল না। শিল্পী নন্দলাল বসুও রবীন্দ্রনাথকে গোপীনাথের শীতলী প্রসাদ খেতে দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আমলে ঘটা করে গ্রামে গোপীনাথের পালাপার্বণগুলি পালন করা হত।[৮]

শিলাইদহে মেলার আয়োজন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অনেক ভেবে মেলার নামকরণ করেছিলেন 'কাত্যায়নী মেলা'। মা দুর্গার অন্য নাম হল কাত্যায়নী। শীতকাল পড়ে গেলেও মা দুর্গার মতো প্রতিমা তৈরি হয়েছিল। দু-তিন বছর পর আবার 'রাজরাজেশ্বরী' মেলার আয়োজন করা হয়েছিল।

সেবার তৈরি হয়েছিল 'দশমহাবিদ্যা'র 'ষোড়শী' মূর্তি। হিন্দু পৌত্তলিকদের মতো মূর্তি গড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। এই ঘটনায় একদিকে যেমন দেবতাদের প্রতি তাঁর প্রীতির দিকটি ধরা পড়ে, তেমনি চোখে পড়ে তাঁর মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব। প্রণবেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে একমত হয়ে বলাই যায়—

> মনে-প্রাণে কট্টর ব্রাহ্মণ এবং সনাতন হিন্দু আদর্শে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ শুধু পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে ব্রাহ্ম সেজেছিলেন— যেটা কার্যকারণ বিচারে এবং বাস্তব অবস্থায় ছিল তাঁর নিতান্তই সাজ।[৯]

রবীন্দ্রনাথ ১৮৮২ সালের বৈশাখ মাসে 'ভারতী'তে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন— 'দেবতায় মনুষ্যত্ব আরোপ।' হার্বার্ট স্পেন্সর তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'The use of Anthropomorphism' নামের প্রবন্ধে দেবতায় মনুষ্যত্ব আরোপ বিষয়ে যা মন্তব্য করেছিলেন, সেই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ এখানে স্পষ্টভাবে লিখেছিলেন যে দেবতাদের চরিত্র দোষের উর্দ্ধে ছিল না। স্পেনসার যেখানে লিখেছিলেন, মানুষ তাঁর রুচি ও প্রকৃতি অনুসারে দেবতার কল্পনা করেছিল, সেখানে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি লক্ষ করার মতো—

> দেবতার হীন স্বভাব হইতে মনুষ্যের হীন স্বভাব কল্পনা করা সকল সময় ঠিক খাটে না।'[১০]

প্রবন্ধটিতে দেবতার সম্পর্কে উষ্মা প্রকাশ করলেও, রবীন্দ্রনাথ দেবতার অস্তিত্বকে উপেক্ষা করেননি। ১৮৮২ সালের মার্চ মাসে 'সিটি কলেজ স্ক্যান্ডাল'-এ জড়িয়ে পড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সিটি কলেজের রামমোহন রায় হোস্টেলের ছাত্রদের সরস্বতী পূজা করতে চাওয়া নিয়ে ছিল এই বিতর্ক। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু পুজোর প্রতিকূলে মত রেখেছিলেন। হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের মতো গোঁড়া ব্রাহ্মদের চাপে পড়েই রবীন্দ্রনাথ এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিকূল মত ছাত্রদের আহত করেছিল। আপাতভাবে মনে হতেই পারে যে রবীন্দ্রসাহিত্যে যেখানে দেবী সরস্বতী এত বিচিত্র ভঙ্গিতে এসেছেন, সেখানে 'সরস্বতী পূজা' রবীন্দ্রনাথকে মৌনী থাকতে বাধ্য করল। আমরা এই বিষয়ে একটু অন্য কথা বলব। 'সমাজ' বইটির 'সিটি কলেজের ছাত্রাবাসে সরস্বতী পূজা' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যটি স্পষ্টভাবে লেখা আছে। আমাদের মতে, তিনি 'সরস্বতী পূজা'—পূজাকে উপলক্ষ্য করে ঘনিয়ে তোলা অশান্তির বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। এই সূত্রে তাঁর মন্তব্যটি লক্ষ করা যাক—

> এ যেন যার উপরে রাগ আছে তাকে বেদনা দেবার জন্য নিজের দেবতাকে লাঠির মতো করে তোলা।[১১]

'নিজের দেবতা' শব্দগুচ্ছটি উল্লেখ করার মতো। রবীন্দ্রনথের দেবতারা ছিলেন মূলত অর্ন্তলোকের দেবতা। তাঁর দেবতাভাবনার সঙ্গে শুভ ও মঙ্গলবোধ জড়িয়ে ছিল। 'আত্মবোধ'-এর 'অর্ন্তদেবতা'

প্রবন্ধটিতে বৈদিক সময়ের সূত্রে লিখেছিলেন—

> প্রাণপাত করে আদিম পশুকে শাসন করেছে যে বীর, তিনিই মানুষের ভিতর থেকে আবিষ্কৃত করেছিলেন আপন দেবতাকে।[১২]

এই বইটিরই 'নরদেবতা' প্রবন্ধে দেবতার সঙ্গে আত্মীয়তার কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

> দেবতাকে মানুষ ডেকেছে পিতা নোহসি, তুমি আমাদের পিতা। পিতা নামের মধ্যে মানব বোধ প্রকাশ পায় এ কথা মানতেই হবে।[১৩]

রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দু ব্রাহ্ম' প্রবন্ধে ব্রাহ্ম ধর্মকে হিন্দুধর্মের থেকে ভিন্ন করে দেখতে চাননি।

> ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের একটি বিকাশ, এই কথা আমরা বলিয়াছি।[১৪]

ব্রাহ্ম পিতার সন্তান বলেই যে তিনি হিন্দুধর্মের সঙ্গে কোনো যোগ রাখতে পারবেন না, একথা মানতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। তিনি 'সর্বজনীন' ধর্মমতের কথা বলেছিলেন—

> বস্তুত আমার পিতা যদি অত্যন্ত সংকীর্ণ সংস্কারের অনুদার প্রকৃতির লোক ছিলেন ইহাই প্রকৃত সত্য হয়, তবে আমার পিতাকে তো আমি পিতারূপে ত্যাগ করিতে পারিব না। যদিও বা আমার মধ্যে কোনো একটা অপ্রকৃতস্থ অবস্থায় তাহা আমার ইচ্ছার মধ্যেও উদয় হয় তথাপি তাহা আমার সাধ্যের মধ্যে নাই। আমারই পিতার সন্তান যে আমি, এ গণ্ডি, বিধাতার গণ্ডি। মুখের বিষয় এই যে, এই গণ্ডি স্বীকার করিয়াও আমি সর্বজনীন হইতে পারি।[১৫]

এই প্রবন্ধে হিন্দুসমাজের পক্ষেই কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। হিন্দু সমাজে ভ্রম, অন্ধসংস্কার থাকা সত্ত্বেও যে সত্য মঙ্গলের কথা বলে রবীন্দ্রনাথ সেই সত্যের দিকে থাকতে চান। হিন্দুদেবদেবীদের স্বীকার করেই এমনভাবেই নিজস্ব ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই দৃষ্টিভঙ্গিই রবীন্দ্রসাহিত্যে হিন্দুদেবদেবীদের প্রবেশাধিকার দেবে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের লেখা 'রোমীয় বহুদেববাদের পরিণতি' প্রবন্ধটিতে ব্রাহ্মধর্ম এবং নবজাগ্রত হিন্দুধর্মের সম্বন্ধের কথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। দুটি ভিন্ন মতের মেলবন্ধনে যে কোনো 'গুরুতর বিঘ্ন'[১৬] ঘটার সম্ভাবনা নেই একথা বলতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই সূত্রে তিনি বিবেকানন্দের উল্লেখ করেছিলেন।

> বিবেকানন্দ যে একসময় উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন তাহাতে তাঁর পরবর্তী মত পরিবর্তনে কোনো গুরুতর বিঘ্ন ঘটায়নি।[১৭]

আমাদের মনে হয় পরিবেশগতভাবে 'ব্রাহ্ম' হয়ে থাকতে বাধ্য রবীন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মের পাশে নতুন আসন পেতে চেয়েছিলেন। সেই কারণেই লিখেছিলেন—

> যেখানে বহুদেববাদের প্রাদুর্ভাব সেখানে কোনো ধর্মমত সহসা আঘাত পাইয়া মরে না, তাহা বহুকালে ক্রমে জীর্ণ ও রূপান্তরিত হয়। নূতন মত আসিয়া পুরাতন মতকে স্থানচ্যুত করে না— সেও তাহার পার্শ্বে আসন গ্রহণ করে।[১৮]

রবীন্দ্রনাথ একদিন তাঁর পারিবারিক ব্রাহ্মধর্মকে নিজের মত বলে স্বীকার করেছিলেন। কিছুদিন আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকও ছিলেন। সেই ব্রাহ্মসমাজের মঞ্চে বারবার আচার্যের ভূমিকা পালন করেও নিজের মনের সঙ্গে মেলাতে পারেননি। এই প্রসঙ্গে 'নাস্তিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' বইটিতে 'রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনা' প্রবন্ধে সোমেন্দ্রনাথ বসু লিখেছিলেন—

> যে দেবতাকে পিতার আসনে বসিয়ে পারিবারিক ধর্মবিশ্বাসকে তিনি পোষণ করেছিলেন সেই দেবতা তাঁকে বেশি আকর্ষণ করলেন না।[১৯]

সুব্রত রায়চৌধুরী 'অরূপসাধনে রূপতাপস, রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে লিখেছিলেন—

> পৌত্তলিকতা-বিরোধী রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও কেউ কেউ খুঁজে পেয়েছেন পৌত্তলিক রবীন্দ্রনাথকে।[২০]

হেমন্তবালা দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্রবিনিময়ের কথা আমরা সকলেই জানি। হেমন্তবালা ছিলেন পৌত্তলিক। তাঁর ভাবনার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের মনকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। একটি চিঠিতে সামান্য ব্যঙ্গ করেই রবীন্দ্রনাথকে হেমন্তবালা লিখেছিলেন—

'কাজেই অপৌত্তলিক আপনার, পৌত্তলিক জোনাকির একটু উপকার করায় কিছু ক্ষতি হবে না।'[২১] হেমন্তবালা পুতুলপুজোর পক্ষে বক্তব্য রাখতেন। ১৯৩২ সালের ৮ নভেম্বর লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ হেমন্তবালাকে লিখেছিলেন— 'অবশ্য ধর্মমত আমার আছে—কিন্তু কোনো সম্প্রদায় আমার নেই। নিজেকে আমি ব্রাহ্ম বলে গণ্যই করি নে।'[২২]

১৩১৭ সালের ২০ আষাঢ় কাদম্বিনী দত্তকে লেখা একটি চিঠিতে (৪ জুলাই, ১৯১০) রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> একটি কথা তুমি নিশ্চয় জেনো ব্রাহ্ম পরিবারে যদিও আমার জন্ম, তবু ঈশ্বর উপাসনা সম্পর্কে আমার মন কোনো সংস্কারে আবদ্ধ হয়নি। তার একটা কারণ অতি শিশুকালেই আমার মনে কবিপ্রকৃতি অত্যন্ত প্রবলভাবে জেগে উঠেছিল— আমি আমার কল্পনা-নিয়ে সর্বদা ভোর হয়ে ছিলুম— ধর্মপ্রবৃত্তি সম্পর্কে কে কি বলে বাল্যকালে তা আমার কানেও যায়নি।[২৩]

নীরদ সি. চৌধুরী 'আত্মঘাতী বাঙালী' প্রবন্ধে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরবাদ পিতৃদত্ত হলেও তিনি সেই ধর্মকে তত্ত্বে পরিণত করেছিলেন। সেই তত্ত্ব ছিল সম্পূর্ণ ধর্মের কঙ্কালমাত্র। রবীন্দ্রনাথ নিজের প্রবৃত্তি দিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন।[২৪] একই প্রবন্ধের শেষের দিকে নীরদ সি. চৌধুরী লিখেছিলেন— 'আমার মাঝে মাঝে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর হিন্দুর পুরাতন অর্ধনারীশ্বর।'[২৫]

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম থেকে আলাদা ছিল রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ। 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের 'পান্থ' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপলব্ধির কথা লিখেছিলেন—

> আমি তো সাধক নই,
> আমি গুরু নই
> আমি কবি।
> আছি
> ধরণীর অতি কাছাকাছি।[২৬]

পম্পা মজুমদার 'রবীন্দ্রমানসে বৈদিক সংস্কৃতির প্রভাব' নামের প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

> কবি যে নিজের অজ্ঞাতে অসচেতনভাবে বৈদিক পূর্বসূরীর পথ অনুসরণ করেছিলেন তার কারণ জগৎ ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে উভয়ের মধ্যে মিল ছিল। ... দেবের কাব্যকে রবীন্দ্রনাথ কবির দৃষ্টিতেই দেখেছিলেন।[২৭]

আমাদের প্রাচীন কাব্যতাত্ত্বিকদের মতে, কবিদের একটি বিশেষ জ্ঞান আছে— 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমপ্রজ্ঞা'। অর্থাৎ, যা পূর্বে ছিল না, এমন বস্তু সৃজন করতে পারার জ্ঞান। রবীন্দ্রনাথ মন থেকে নিজেকে 'কবি' হিসেবেই মেনে নিয়েছিলেন। ফলে, আমরা ধরে নিতে পারি,তাঁরও এই বিশেষ ক্ষমতাটি ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই প্রজ্ঞার আলোকে এক নতুন দেবলোক সৃজন করেছিলেন। সেই দেবলোকের দেবদেবীদের নিজের খেয়ালখুশি অনুসারে তিনি নিয়ে এসেছিলেন তাঁর সাহিত্যে। এই দেবদেবীদের আবির্ভাবের অন্তরালে ধর্মীয় কারণের থেকে অনেক বেশি করে ছিল একজন কবির খামখেয়াল। কারণ, তাঁর সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন ঈশ্বর, যিনি নতুন ভুবন সৃষ্টি করছেন। এই প্রসঙ্গে 'রবীন্দ্রচিত্তে জনচেতনা' বইটিতে 'কবিমানস' প্রবন্ধে জগদীশ ভট্টাচার্যের মন্তব্য স্মরণ করা যাক। তিনি কবিমানসের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমাপ্রজ্ঞা'র কথা লিখেছিলেন।[২৮] যে রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানের বিষয়ের থেকে ভাবের বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছিলেন বেশি,[২৯] তাঁর দেবতাভাবনা ভাবের রঙে রঙিন হবে, একথা বলাই বাহুল্য। জগদীশ ভট্টাচার্যকে অনুসরণ করে বলা চলে, যে দেশকালে কবি বাস করেন, যে বিশেষ মানবগোষ্ঠীতে তাঁর জন্ম, তা থেকে তিনি দূরে থাকতে পারেন না। কেননা, দেশ, কাল, সমাজের তিনিও একজন। কবির রচনায় অতীত ঐতিহ্য ক্রিয়াশীল হয়।[৩০] কবি নিজের প্রতিভার স্পর্শে সেই অতীত ঐতিহ্যকেও নিজের প্রকাশের প্রয়োজনে পরিবর্তিত করে নেন। কবিমানসকে বুঝে নেওয়ার জন্য জগদীশ ভট্টাচার্যের আরো একটি ভাবনার সাহায্য নেওয়া যায়। তিনি কবিমানসকে তথা কবিকে বলেছিলেন— 'ভোরের বাউল'। 'জীবনের ছিন্নবস্ত্রকে কল্পনার রঙিন সুতোয় সুগ্রথিত করে শিল্পিত গৈরিক বাসে সে আচ্ছাদিত। মনের মানুষকে সে ভালোবাসে। কিন্তু অনুরক্ত হয়েও সে অনাসক্ত। তাই তার আচ্ছাদনের বর্ণ গৈরিক। তার হাতে আছে একতারা। নিশান্তের জাগরণী গান গেয়ে পথিক মানুষের চলার পথকে সে গীতছন্দে মধুময় করে তোলে।'[৩১]

রবীন্দ্রনাথ কবিদের ঐতিহ্যের সেই উত্তরাধীকারকেই বজায় রেখেছিলেন তাঁর দেবতাকল্পনার ক্ষেত্রে। দেবতাদের শারীরিক অবয়ব নিয়ে লোককল্পনা ছিল অন্তহীন। মীমাংসাদর্শন প্রণেতা জৈমিনীর মতে দেবতারা ছিলেন মন্ত্রময়ী। মন্ত্রই ছিল দেবতাদের শরীর। প্রাচ্য দেবতাদের মনুষ্যোচিত কতগুলি শব্দ দিয়ে অভিহিত করার মধ্য দিয়েই দেবতাদের মানবিক প্রতিমূর্তির ইঙ্গিত রয়ে যায়। পাশ্চাত্য দার্শনিক জেনোফেনিস ছিলেন প্রায় ঔপনিষদিক। তাই, দেবতাদের মর্ত্য মানুষের মতো আচরণ তিনি

মেনে নিতে পারতেন না। ইথিওপয়িনরা নিজেরা নাক খাঁদা আর কালো বলে দেবতাদের একই রূপ দিয়েছিলেন— এই নিয়েও ব্যঙ্গ করেছিলেন জেনোফেনিস।[৩২]

ঋগ্বেদের ঋষিরাই হোন বা দার্শনিক জেনোফেনিস, তাঁদের বক্তব্যে একটি বিষয় স্পষ্ট যে মানুষ নিজের মতো করেই দেবতাদের সৃজন করেছে। সেই কারণে দেবতারা অনেকবার পরিবর্তিত হয়েছেন। এককালের প্রধান দেবতা পরবর্তীকালে অপ্রধান হয়ে পড়েছেন। আবার, কোনো এক সময়ের গুরুত্বহীন দেবতা উচ্চতর মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এই ভাবে, পৃথিবীর দেবসভা ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। আধুনিক সময় আরো ভাবনার উদারতা দাবি করে। এই সময় দেবদেবীরা শুধু ভক্তি নয়, শিল্প ও সাহিত্যের বিষয়বস্তু মাত্র।

এই ভাবনার নিরিখে বিশ্লেষণ করা উচিত রবীন্দ্র সাহিত্যের দেবতাদের। লক্ষ করলে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে দেবদেবীদের সিদ্ধ রূপকে সব সময় বজায় রাখেননি। বক্তব্য প্রকাশের প্রয়োজনে ইচ্ছা মতো তাঁদের রূপ পরিবর্তন করেছিলেন। পম্পা মজুমদার 'রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস' নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রসাহিত্যে দেবপ্রসঙ্গ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন— '...এঁদের অনেককেই কবি অতি পরিচয়ের ধূলিলিপ্ত ঔদাসীন্য থেকে মুক্ত করে নতুন বেশে সাজিয়ে দিয়েছেন। কখনও তার হারিয়ে যাওয়া পুরনো পরিচয়কে প্রকাশ করেছেন, কখনও বা তার ওপর আপন চিত্তভাব আরোপ করে তাকে অনেকাংশে নতুন রূপে তুলে ধরেছেন।'[৩৩] এখন আমরা রাবীন্দ্রিক দেবদেবীদের সেই নতুন রূপগুলির ওপর আলোকপাত করতে চাই।

রবীন্দ্রনাথ কখনো দেবদেবীদের সিদ্ধ রূপটি বজায় রেখেছেন। আবার কখনো তাঁদের রূপবদল ঘটিয়েছেন। এই রূপ পরিবর্তনের আবার দুটি ধরন আছে। প্রথমত, লিঙ্গগত এবং দ্বিতীয়ত, স্বভাবগত। কোনো কোনো দেবতাকে রবীন্দ্রনাথ মিলিয়ে দিয়েছিলেন নিজের জীবনদর্শনের সঙ্গে। ব্যক্তিগত ভালো লাগা-মন্দ লাগা এবং সমকালীন সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের প্রভাবও তাঁর দেবতাভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল।

রবীন্দ্রসাহিত্যে অগ্নির পুরুষমূর্তি নয়, নারীমূর্তি খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে অগ্নি সম্পর্কে সিদ্ধ ধারণাকে ভেঙে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'দামিনী' এবং 'দীপ্তি'— উপন্যাস ও প্রবন্ধের দুটি চরিত্র আকাশের আগুন তথা বিদ্যুতকে মনে করিয়ে দেয়। একজনের অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিকমিক করে আর অন্যজন কথায় কথায় নিষ্কাশিত অসিলতার মতো ঝকঝক করে। কবিতাতেও অগ্নি 'দেবতার

দূতী' হয়ে দেখা দেয়। রবীন্দ্রসাহিত্যে অগ্নির 'তপস্বী' নয়, 'পূজারিণী' মূর্তি খুঁজে পাওয়া যায়। বৈদিক অগ্নির হব্যবাহ মূর্তির কাজ হল মানুষের সঙ্গে দেবতার সংযোগ ঘটানো। গ্রিক পুরাণে দাইমনের কাজ হল দেবতা ও মানুষের মধ্যে যোগসাধন করা।[৩৪]

রবীন্দ্রনাথের মনে অগ্নি ছিলেন দিব্য প্রেরণাস্বরূপ, এই দেবতা তাঁকে অনন্তের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। কবির কাব্য ভুবনে দিব্যপ্রেম হয়ে প্রেরণা স্বরূপ ছিলেন কাদম্বরী দেবী। আমাদের অনুমান, রবীন্দ্রনাথের অগ্নিকল্পনার অন্তরালে এই নারীর প্রভাব ছিল। ঋষি অরবিন্দ বেদের দেবতাদের আদিযুগের নানা মনস্তাত্ত্বিক প্রতীক হিসেবে দেখেছিলেন। অগ্নি হলেন সেই শক্তি যা 'সত্যকে নিবেদন করতে পারেন কর্মে।'[৩৫] রবীন্দ্রচেতনায় আজীবন উজ্জ্বল হয়ে থাকা অকালপ্রয়াতা কাদম্বরী দেবীর অনন্তযৌবনা এই মূর্তিই কবির অগ্নিকল্পনাকে কাদম্বরী চেতনার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন কিনা আমরা জানি না। কিন্তু বৈদিক অগ্নির চিরনবীন মূর্তির সঙ্গে চিরদিন তরুণী রয়ে যাওয়া কাদম্বরীর এই আশ্চর্য যোগাযোগ আমাদের অনুমানকে দৃঢ় ভিত্তি দেয়।

ইন্দ্র বৃষ্টির দেবতা, বৈদিক যুগে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ দেবতা। পুরাণের আমলে ইন্দ্র হলেন দেবতাদের রাজা। রবীন্দ্রনাথ ইন্দ্রকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর সাহিত্যে। কখনো ইন্দ্র কবির মনের মাটিতে বর্ষা নামিয়ে তাঁর হৃদয়কে সমৃদ্ধ করছে, আবার কখনো ইন্দ্রকে সূর্যের বন্ধু হিসেবে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। বৃক্ষরোপনের সূচনালগ্নে ইন্দ্রের ভেরী বেজে ওঠে। 'ভেরী' বলতে সম্ভবত মেঘ গর্জনকে বোঝানো হয়েছে। ইন্দ্রের ষড়যন্ত্রকারী মূর্তিও রবীন্দ্রসাহিত্যে বিরল নয়। রাবীন্দ্রিক ইন্দ্র কল্পনার সবচেয়ে অভিনব দিকটি হল ইন্দ্রকে 'চিত্রকর' বিশেষণে বিশেষিত করা। ১৯০০ সাল নাগাদ রবীন্দ্রনাথ নিজে ছবি আঁকা শুরু করেছিলেন। ইন্দ্রের বজ্র ছিল সত্যের প্রতীক, অশুভের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র সুনীতের গর্জে ওঠা শিল্পী মন ইন্দ্রের শিল্পিসত্তাকে স্পষ্ট করে তোলে। আবার, ইন্দ্রের সহস্রচক্ষুর বিচিত্র ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন। কখনো ক্ষমতাবানের রূপকে আবার কখনো বহুদর্শীর প্রতীকে এই সহস্রচক্ষুর তাৎপর্য ধরা পড়েছে। শ্রীঅরবিন্দের মতে, ইন্দ্র মানুষের মানসিক শক্তি— 'Indra in the psychological interpretation of the hymns represents, as we shall see, mind power...'[৩৬] রবীন্দ্র সাহিত্যেও ইন্দ্রের ক্ষমতার, শক্তির, সহস্রচক্ষু, বজ্রপাণি রূপ খুঁজে পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যুক্ত করেছিলেন সৌন্দর্যবোধ। রবীন্দ্রনাথের ইন্দ্র আবার শিল্পী। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বলেছিলেন— 'ইন্দ্রসখা'।

বরুণের বৈদিক সিদ্ধরূপটিও যেমন রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছিলেন, তেমনি বরুণের মিথ-ভাঙা কিছু নতুন মূর্তি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছিলেন। আমরা 'খোলাভাঁটিবাহিনী বারুণী'র তাড়া খাওয়া বরুণের ভীরু মূর্তি খুঁজে পাই। আবার স্বর্গের ফ্যাশান দুরস্ত দেবতাদের একজন হয়েও রবীন্দ্রসাহিত্যে বরুণ প্রকট হয়েছেন। গ্রিক সমুদ্রদেব পোসাইডনের সঙ্গে বরুণমূর্তি একাকার যেমন হয়ে গিয়েছে, তেমনি সমুদ্র তথা বরুণদেবকে চামুণ্ডা মূর্তিতেও দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মৃদঙ্গ হাতে বরুণদেব শিল্পী রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি। অগ্নির মতোই বরুণেরও নারীরূপ কল্পনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'পঞ্চভূত'-এর স্রোতস্বিনী বরুণেরই নারীমূর্তি। সিদ্ধ রূপের পাশাপাশি বরুণের তরঙ্গায়িত সৌন্দর্যকে নারীমূর্তির আদলে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের শিল্পী মন। গ্রিকপুরাণে তিয়ামত নামের এক জলদেবীর কথা জানা যায়। স্রোতস্বিনী ও তিয়ামত রবীন্দ্রকল্পনায় মিলেমিশে যাওয়াটা অসম্ভব নয়।

সূর্য হলেন রবীন্দ্রসাহিত্যে এক প্রেমিক পুরুষ। কিরণের মুকুট মাথায় দিয়ে, সুধাপাত্র হাতে এই তরুণ দেবতাটি কবির অন্তরের এবং বাইরের সমস্ত আলোর উৎস। ঊষা এবং সূর্যের অসমাপ্ত প্রেমের ইঙ্গিতে সূর্য বিরহী মনেরও প্রতীক। আবার কখনো সূর্যকে শুভ্র ফলের মতো দেখতে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। গ্রিক দেবতা অ্যাপোলোর অনিন্দ্যসুন্দর রূপ এবং সূর্যের উজ্জ্বলকান্তি রবীন্দ্রসাহিত্যে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। শ্রী অরবিন্দের মতে সূর্য হলেন দ্রষ্টা বা প্রকাশক। রবীন্দ্রসাহিত্যে সূর্যের বিচিত্র মূর্তির সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিষদিক সূর্যকেও প্রকাশ করেছিলেন। যে সূর্যের জ্যোতির মধ্যে নিজের আত্মাকে উজ্জ্বল দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেক্ষেত্রে সূর্য দেবতার ঔপনিষদিক মূর্তিও রবীন্দ্রসাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

চন্দ্র তাঁর পৌরাণিক পরিচয় নিয়ে রবীন্দ্রসাহিত্যের দেবলোকে প্রকট হয়েছিলেন। বৈদিক দেবতা সোমকেও চন্দ্রের অবয়বের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতে চাঁদের সৌন্দর্য আবার গ্রিক দেবী সেলিনি এবং রোমানদেবী লুনাকে মনে করিয়ে দেয়। ব্রহ্মা পৌরাণিক সিদ্ধরূপে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের সাহিত্যে ধরা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মাকে এক রসিক, শিশুসুলভ মনের অধিকারী বৃদ্ধ হিসেবে এঁকেছিলেন। দেবপিতামহের আদলে তাঁর নাটকগুলিতে ঠাকুর্দা, দাদাঠাকুর ইত্যাদি চরিত্রগুলি নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর উদ্দাম হাসি এবং দ্রুততালে বাজিয়ে চলা মৃদঙ্গ— রবীন্দ্রসাহিত্যে ব্রহ্মার এক নতুন বৈশিষ্ট্য তৈরি করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পাঁচ রঙের আলখাল্লা পরিয়ে বৈরাগী সাজিয়েছেন। জগতস্রষ্টা ব্রহ্মার করুণাময় মূর্তিও আমরা রবীন্দ্রসাহিত্যে খুঁজে পেয়েছি।

এক শিশুসুলভ চাপল্য এবং পাগলামি ব্রহ্মা চরিত্রটিতে রাবীন্দ্রিক সংযোজন। প্রবীণ রবীন্দ্রনাথ এবং পিতামহ ব্রহ্মা মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছিলেন।

বিষ্ণুর পালনকর্তা মূর্তিটিকে যেমন গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তেমনি তাঁর সৃজনশীল সত্তাটিকেও অবহেলা করেননি তিনি। বিষ্ণুকে 'জগতের মহা বেদব্যাস' রূপে কল্পনা করাটা রবীন্দ্রসাহিত্যের দেবতাভাবনার অভিনবত্ব। বিশ্বসৃষ্টি আর মহাকাব্য সৃষ্টিকে এক ভাবে দেখতে পারাটা রাবীন্দ্রিক বিশেষত্ব। দার্শনিক ভাবনার অংশ হিসেবেও অনন্ত শয্যাশায়ী নারায়ণকে কল্পনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিষ্ণুর গদাকে তিনি ক্ষমতা বা দম্ভের প্রতীক মনে করেছিলেন। লক্ষ্মী এবং নারায়ণের যুগলবন্দীতেই পূর্ণতা খুঁজে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নারায়ণের শক্তিতে রবীন্দ্রনাথ ভরসা পেয়েছিলেন। আবার 'কেরাণী নারায়ণ'-এর উল্লেখ করে রসিকতাও করেছিলেন। বিষ্ণুর চক্রকে সচলতার প্রতীক বলে মনে করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নরনারায়ণের কল্পনা তাঁর মহামানব কল্পনার সঙ্গে মিলে যায়। রবীন্দ্রনাথের বিষ্ণু কল্পনা অনেকটাই সিদ্ধরূপকে মান্যতা দিয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যে শিব একটি বড়ো জায়গা জুড়ে আছে। শিবের রুদ্র, শঙ্কর, মহাদেব, ভোলানাথ— এই প্রতিটি মূর্তিকেই ব্যবহার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রুদ্রের ভয়ঙ্কর সুন্দর রূপ রবীন্দ্রসাহিত্যে বিচিত্র ভঙ্গিতে এসেছে। কখনো 'চিরদিবসের রাজা', কখনো 'বন্ধু' আবার কখনো 'প্রেমিক' রূপে। সন্ন্যাসী শিবের শুষ্ক, কঠিন মূর্তিকে রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেননি। সেই কারণে মদনের সঙ্গে দ্বৈরথে তাঁকে পরাজিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শিশু ভোলানাথের কল্পনাটিও রবীন্দ্রসাহিত্যে অভিনব। রবীন্দ্রসাহিত্যে আমরা 'শুভ্রকায় মহাদেব'কে খুঁজে পাই 'গোরা' উপন্যাসে। এই সূত্রে আমাদের ঈশ বা ঈশান শিবের কথা মনে পড়তে পারে। এই শিব 'মুক্তাশুভ্র, অভয় ও বরদহস্ত পঞ্চবদন।'[৩৭] মহাদেবের জটা নিঙড়ে বার করা তেলের প্রসঙ্গেও যেমন রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছিলেন, তেমনি শিবের যে দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে স্টাইল রয়েছে 'শেষের কবিতা'র অমিত সেকথা জোর গলায় বলেছিল।[৩৮] রবীন্দ্রনাথ যে দুই ধরনের শিবের কথা বলেছিলেন, তার মধ্যে আর্যরূপটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাতিত্ব বেশি ছিল।

বিশ্বকর্মা রবীন্দ্রনাথের দর্শনভাবনাকে অধিকার করে থাকে। একাগ্র স্রষ্টা বিশ্বকর্মা, আনন্দিত বিশ্বকর্মা, মানুষগড়ার কারিগর বিশ্বকর্মা, চপল বিশ্বকর্মা— ইত্যাদি নানা বিশ্বকর্মার ছবি তৈরি করেছিলেন তিনি। নিজের সৃষ্টিশীল মনের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিলেন এই দেবতাকে। গ্রিক দেবশিল্পী হেফায়েসতাসের সঙ্গে আমাদের বিশ্বকর্মার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রসাহিত্যে কর্মী বিশ্বকর্মার আড়ালে এই হেফায়েসতাস্‌ও লুকিয়ে থাকেন।

কার্তিক ও গণেশকে রবীন্দ্রনাথ বাঙালি ঘরের আদরের ছেলেদের আদলেই গড়েছিলেন। গণেশের বিসদৃশ চেহারা, হাতির মাথা এবং আজব ভাবভঙ্গি তাঁকে শিশুসুলভ করে তোলে। রবীন্দ্রসাহিত্যে গণেশ 'ইতিহাস-বিশারদ', বুদ্ধিদীপ্তও বটে। দেবতা বলেই তাঁর রূপবিচ্যুতি জনমানসে ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছে— এমন কথাও রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। লোভের প্রতীক হয়েও যেমন গণেশ রবীন্দ্রসাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তেমনি সিদ্ধিদাতার সিদ্ধরূপটিকেও রবীন্দ্রনাথ পরিত্যাগ করেননি। কার্তিকও তাঁর বাবু সুলভ চেহারা নিয়ে উনিশ শতকের যুব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আবার কার্তিকের 'পালোয়ানি' নয়, বুদ্ধিবৃত্তিই রবীন্দ্রনাথের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য ছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যের দেবলোকে প্রেমের দেবতা মদনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছিলেন। মদনের সঙ্গে গ্রিক দেবতা এরস, রোমান দেবতা কিউপিডকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। 'চিত্রাঙ্গদা'য় আমরা মদনের পৌরাণিক সিদ্ধরূপটি খুঁজে পেয়েছি। সেই সঙ্গে আমরা দেখেছি 'রক্তকরবী' নাটকে রাজা এবং কিশোর চরিত্রের অন্তরালে মদনের দুটি রূপকে। এই সূত্রে রাজার ধ্বজার কথা মনে পড়ে যায়। এই ধ্বজার সঙ্গে মদনপূজার সম্পর্ক রয়েছে। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলার উনিশ বিঘা, শুখানা ঘি, বাঁশদহনতি বাড়ি প্রভৃতি গ্রামে মদন ত্রয়োদশী ও মদন চতুর্দশী তিথি দুটিকে কেন্দ্র করে কয়েকদিন ব্যাপী মদনপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে লম্বা বাঁশের মাথায় একটি পিতলের আরশি ও একজোড়া গুয়াপান বেঁধে সেটিকে লালশালু জড়িয়ে মদনের প্রতীক হিসেবে পূজা করা হয়। এটি ইন্দ্রধ্বজ পূজার সাদৃশ্যে কল্পিত।[৩৮] 'রক্তকরবী'র রাজারও একটি ধ্বজা ছিল। সে ধ্বজা অজয়শল্যের মতো একদিকে পৃথিবী আর অন্যদিকে স্বর্গকে বিদ্ধ করে। এই ধ্বজা মদনের ধ্বজা বলেই আমাদের অনুমান। অনেক গানে কৃষ্ণ এবং মদন এমনভাবে মিলে আছে যে সংশয় তৈরি হয়। ফাল্গুন মাসের শুক্ল চতুর্দশীর দিন মদনপূজা। দোল আর মদনপূজার দিনটি এক। কৃষ্ণ রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনাকে প্রভাবিত করেছিলেন সেই তাঁর কিশোরবেলা থেকেই। বৈষ্ণব কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে পাঠ করেছিলেন। ব্রজের রাখাল বালক কখনো প্রেমিক কিশোর আবার কখনো 'কালের রাখাল' হয়ে স্পষ্ট অবয়ব পেয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্যে। কৃষ্ণের কঠিন ব্যক্তিত্বও রবীন্দ্রসাহিত্যে দুর্লভ নয়। দার্শনিক কৃষ্ণ, কূটনীতিজ্ঞ কৃষ্ণ এবং প্রেমিক কৃষ্ণ রবীন্দ্রসাহিত্যের দেবলোককে আবিষ্ট করে রেখেছিল তাঁর মোহন বাঁশির সুরে।

ঋগ্বেদে উষা হলেন— 'আগামী দেবত্বের প্রতিশ্রুতি'।[৩৯] রবীন্দ্রসাহিত্যে উষা হলেন পবিত্র সুন্দরী। সূর্য ও উষার অসমাপ্ত প্রেমের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রাত্রি ও উষার মাতা-কন্যা সম্পর্কের কথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এটি একান্তভাবে তাঁর কল্পনা। কবিতায় কখনো উষা ও উমার

পবিত্রতাকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে রবীন্দ্রনাথ স্বর্গের উচ্চতা থেকে নামিয়ে এনেছিলেন মাটির কাছাকাছি। সরস্বতী কেবল বিদ্যা ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন না। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'মানসসুন্দরী'। সরস্বতী মূর্তিতেই তিনি তাঁর প্রেরণার কল্পনা করেছিলেন। লক্ষ্মীর পবিত্রতা ও মঙ্গলময়তাই ছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য। তিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে লক্ষ্মীর কল্যাণী হাতের ছোঁয়া অনুভব করেছিলেন। তিনি লোকলক্ষ্মী, গৃহলক্ষ্মী, বাদললক্ষ্মী, শরৎলক্ষ্মী, বাণিজ্যলক্ষ্মী, বিশ্বলক্ষ্মী ইত্যাদি বিচিত্ররূপের কল্পনা করেছিলেন। এই বিভিন্ন রূপগুলির সবগুলি কিন্তু সিদ্ধ রূপ ছিল না। নিজের ব্যক্তিগত সম্পর্কের নারীদের মধ্যে তিনি দেবী লক্ষ্মীকেই জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। আদ্যাশক্তি মহামায়া দুর্গা, অন্নপূর্ণা এবং জগদ্ধাত্রীরূপে রবীন্দ্রসাহিত্যে মূর্ত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাতিত্ব ছিল ঘরের মেয়ে 'উমা'র প্রতি। কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে হিমালয়কন্যা উমা তাঁর অন্তরের সবটুকু স্নেহের ওপর দাবি রেখেছে। প্রেম বলতে অপর্ণার ভালোবাসা, শক্তি বলতে দুর্গার দশভুজা রূপ, বেদনা বলতে উমার বেদনাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমরা লক্ষ করেছি, রবীন্দ্রসাহিত্যের নারীচরিত্ররা যখন বহির্মুখী কাজের জন্য সেজে উঠছে, তখন তারা দশভূজা দুর্গা। যখন গ্রহের মধ্যে সেবায় তুষ্ট করছে প্রিয়জনেদের তখন তারা অন্নপূর্ণা। আর, যখন সৌন্দর্যে তিলোত্তমা, তখন তারা জগদ্ধাত্রী। রবীন্দ্রনাথের কাছে আদর্শ দাম্পত্যও ছিল হর-পাবর্তীর দাম্পত্য জীবন।

দশমহাবিদ্যার মধ্যে প্রথম মহাবিদ্যা কালীও রবীন্দ্রসাহিত্যে স্থান পেয়েছেন। প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথের কালীবিদ্বেষ উল্লেখ করার মতো। আসলে সৌন্দর্যের পূজারি রবীন্দ্রনাথ কালীর ভয়ঙ্কর মূর্তি এবং তাঁর সঙ্গে যুক্ত বলিপ্রথা কোনোদিন মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। ১৯৩০ সালের আগস্ট মাসে জেনেভায় রোমা রোঁলার সঙ্গে মত বিনিময়ের সূত্রে রবীন্দ্রনাথ একথা আরো স্পষ্ট করে বলেছিলেন। শৈশবে কালীমন্দিরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে এক নিম্নশ্রেণির স্ত্রীলোকের রক্তে হাত ডুবিয়ে শিশুর মাথায় তিলক কেটে দেওয়া, পুরোহিতের ছাগশিশুর ওপর অত্যাচার— এই দেবীকে তাঁর চোখে অত্যন্ত নীচে নামিয়ে দেয়। পরে ১৯৩৯ সালের ১৩ জুলাই রাণী চন্দের কাছেও লিখেছিলেন এই কালীপূজার বিরুদ্ধে প্রতিকূল মন্তব্য। এই প্রতিকূলতার জের টেনেই তিনি লিখেছিলেন 'বিসর্জন' নাটক। রবীন্দ্রনাথ এই নাটক অভিনয়ের সময় রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এই অভিনয়ের স্মৃতিচারণায় অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ অভিনয় চলাকালীন প্রবল উত্তেজনায় কালীমূর্তিকে দুহাতে তুলে নিয়েছিলেন।

> অতবড় মাটির মূর্তি দুহাতে উপরে তুলে ধরে স্টেজের একপাশ থেকে আর একপাশে হাঁটতে হাঁটতে একবার মাঝখানে এসে থেমে গেলন। হাতে মূর্তি তখন কাঁপছে আমরা ভাবি, কী হল রবিকাকার, এইবার বুঝি পড়ে যান মূর্তি সমেত। তারপর উইংসের পাশে এসে মূর্তি আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখলেন। তখনো রবিকাকার উত্তেজিত অবস্থা।[৪০]

এই উত্তেজনার অন্তরালে বাবার প্রভাব এবং শৈশবের কিছু অবাঞ্ছিত স্মৃতি ছিল। হয়তো এই কারণেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্মমত মেনে নিতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এই কালীকে নিয়েই সুন্দর ও শোভন গান এবং কবিতাও রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'ঘরে-বাইরে'র বিমলাকে ঘিরে কালীর রূপকল্প তৈরি করেছিলেন। দেশমাতৃকার মূর্তি আঁকতে গিয়ে গানে, কথায়, সুরে এই কালীমূর্তিই এঁকেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ডান হাতে খড়্গ থাকলেও বাঁ হাতে শঙ্কাহরণ মুদ্রা এঁকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মতো করে কালীপ্রতিমা গড়েছিলেন। এইখানেই তাঁর অভিনবত্ব।

লৌকিক, অনার্য দেবদেবীরা কোনোদিনই রবীন্দ্রনাথের পছন্দের তালিকায় ছিলেন না। রবীন্দ্রসাহিত্যে এই দেবতারা বিচিত্র এক সময়ের প্রতিনিধিত্ব করে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে এই দেবদেবীরা নির্মম, অনভিজাত, শিক্ষিত রুচি দিয়ে তাদের বিচার করা যায় না। এই তথাকথিত অজ্ঞাতকুলশীল দেবদেবীরা রবীন্দ্রনাথের অবহেলা ও বঞ্চনা মাত্র পেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর মগ্নচেতনের গভীর থেকে যে দেবলোক নির্মাণ করেছিলেন, তা ছিল বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে ব্রাহ্মধর্ম বা হিন্দুধর্মের গণ্ডির মধ্যে কোনোদিন আবদ্ধ রাখতে চাননি। ফলে, নিজের সাহিত্যে দেবপ্রসঙ্গ ব্যবহার করার জন্য তাঁর হিন্দু হওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কারণ, একজন ধার্মিকের দেবসংস্কার এবং একজন কবির দেবসংস্কারের প্রকৃতি একেবারে আলাদা। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, প্রতিটি দেবদেবী একাধিক রূপে ধরা দিয়েছেন রবীন্দ্রসাহিত্যের দেবলোকে। একজন হিন্দু পৌত্তলিকের গোঁড়া পুতুলপুজো অথবা একজন কট্টর ব্রাহ্মের ব্রহ্মসাধনার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এই দেবচর্চা। ঊনবিংশ শতাব্দীর দেবতাভাবনা, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের গোপন, পৌত্তলিক আবহাওয়া রবীন্দ্রনাথের দেবসংস্কারকে প্রভাবিত করেছিল। সেই সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের কঠোর ধর্মীয় নীতি রবীন্দ্রনাথের মনকে নিশ্চয়ই বিপ্লবী করে তুলেছিল। তার সঙ্গে ক্রিয়াশীল হয়েছিল পূর্ব সংস্কারের দ্বারা সমৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের অন্তর্লোক, য়ুং যাকে বলেছিলেন 'যৌথ নির্জ্ঞান'। সেই কারণে, রবীন্দ্রসাহিত্যের দেবতাভাবনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মিথগুলির মেলবন্ধন ঘটেছিল। মধুসূদন দত্ত যেমনভাবে গ্রিক ও রোমান পুরাণকে ব্যবহার করেছিলেন নিজের সাহিত্যে। বিহারীলালের সরস্বতী ভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সরস্বতী ভাবনার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়ের ভারতবর্ষের কল্পনার উত্তরাধিকার বহন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা 'মৃণালিনী' উপন্যাসের চতুর্দশ পরিচ্ছেদের 'মাতৃমূর্ত্তির বিসর্জন' অংশে পশুপতির বিগ্রহ বিসর্জন আর রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকে রঘুপতির কালীমূর্তি বিসর্জনের ঘটনাটি একই ভাবনার ঋক্‌থ বহন করেছিল। একথা আমরা জোরের সঙ্গেই বলতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ সম্পর্কে প্রবল ঔদাসীন্য দেখিয়েও 'মালঞ্চ' উপন্যাসে শ্রীরামকৃষ্ণের ফোটোর সামনে নীরজাকে করজোড়ে দাঁড় করিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি তাঁর সাহিত্যে দেবচরিত্রগুলোকে অবলম্বন করে মানুষের কথাই বলেছিলেন। দেবতারা তাঁর কাছে ছিল 'অমৃতের পুত্র'।[৪১] তিনি 'লিপিকার' 'স্বর্গ-মর্ত্য' কথিকাটিতে দেবতাদেরও স্বর্গের বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি চরিত্রটির মাধ্যমে জানিয়েছিলেন:

> ...আজ তুমি স্বর্গের তপোভঙ্গ করে জানিয়ে দাও যে, স্বর্গ পৃথিবীরই।[৪২]

দেবতা ও মানুষের মিলনের মধ্য দিয়ে যে মুক্তির আনন্দ তা চিরকাল 'বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করে'।[৪৩] এই কথিকাটিকে কেন্দ্র করে আমরাও সব দ্বিধা দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে দেবসংস্কারের অর্থ উপলব্ধি করতে পারলাম। তাঁর সাহিত্যে দেবতারা ছিলেন প্রতীকমাত্র। দেবপ্রসঙ্গগুলি 'স্বর্গের আনন্দের সঙ্গে'[৪৪] 'পৃথিবীর ব্যথার'[৪৫], মেলবন্ধন ঘটিয়েছিল।

তথ্যসূত্র

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছেলেবেলা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: আগস্ট ১৯৮৯, পৃ. ৯৭

২. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, প্রথম খণ্ড, আনন্দ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ: কার্তিক, ১৪১৪, পৃ. ১৮

৩. আমাদের পালোয়ান জমাদার সোভারাম থেকে থেকে বাঁও কষত, মুগুর ভাঁজত মস্ত ওজনের, বসে বসে সিদ্ধি ঘুঁটত, কখনো বা কাঁচা শাক-সুদ্ধ মুলো খেত আরামে আর আমরা তার কানের কাছে চিৎকার করে উঠতুম 'রাধেকৃষ্ণ'।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছেলেবেলা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৯৭

৪. গণেশের মা, কলাবৌকে জ্বালা দিয়ো না, তার কটি মোচা ফললে পরে কত হবে ছানাপোনা।
তদেব, পৃ. ১০৫

৫. পূজায় বলিদানের গল্প শুনে ঠিক করেছিলুম সিঙ্গিকে বলি দিলে খুব একটা কাণ্ড হবে।
তদেব, পৃ. ৯৯

৬. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ১৩৯১, শ্রাবণ ২২, তৃতীয় মুদ্রণ : মে ২০০৬, পৃ. ৬২

৭. তদেব।

৮. 'গোপীনাথ ও রবীন্দ্রনাথ', *দেবতা অনুরাগী রবীন্দ্রনাথ*, প্রণবেশ চক্রবর্তী, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ১লা বৈশাখ ১৩৮৯, পৃ. ১৫-২৪

৯. তদেব, 'কাত্যায়নী মেলা', পৃ. ২৬

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'দেবতায় মনুষ্যত্ব আরোপ', 'পরিশিষ্ট-২', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: মে ২০০৪, পৃ. ১৩১১

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সিটি কলেজের ছাত্রাবাসে সরস্বতী পূজা', 'সমাজ ১', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: মে ২০০৪, পৃ. ৩৭৪

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অন্তর্দেবতা', 'আত্মবোধ-২', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: মে ২০০৪, পৃ. ২৩৯

১৩. তদেব, 'নরদেবতা', পৃ. ২০৯

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'হিন্দুব্রাহ্ম', 'সমাজ ১', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: মে ২০০৪, পৃ. ৩৪৫

১৫. তদেব, পৃ. ৩৪৪

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রোমীয় বহুদেবতার পরিণতি', 'সমাজ-১', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: মে ২০০৪, পৃ. ৩২৮

১৭. তদেব।

১৮. তদেব, পৃ. ৩২৯

১৯. সোমেন্দ্রনাথ বসু, 'রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনা', *নাস্তিকতা ও রবীন্দ্রনাথ*, রবীন্দ্রচর্চাভবন, প্রথম প্রকাশ: ২৫ বৈশাখ, ১৩৯৩, পৃ. ১৩৩

২০. সুব্রত রায়চৌধুরী, 'অরূপসাধনে রূপতাপস রবীন্দ্রনাথ', সুব্রত রায়চৌধুরী (সম্পা), তথ্যসূত্র, ১৭ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, মাঘ, ১৪৬৯, পৃ. ৭১

২১. দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জয়ন্তী সান্যাল (সম্পা.), *কবিকে লেখা চিঠি*, হেমন্তবালা দেবী, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ৮ আগস্ট ১৯৯৯, পৃ. ৭৩

২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'হেমন্তবালা দেবীকে লেখা পত্র' (৮ নভেম্বর ১৯৩২), *চিঠিপত্র*, নবম

খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রকাশ: ২৫ বৈশাখ ১৩৭১, পৃ. ১৮৫

২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কাদম্বিনী দেবীকে লেখা পত্র' (৪ জুলাই, ১৯১০), *চিঠিপত্র*, সপ্তম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রকাশ, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৭, পৃ. ২৭

২৪. কিন্তু তাহার কাছে এইসব তত্ত্ব ছিল তাঁহার সম্পূর্ণ ধর্মের কঙ্কালমাত্র, তিনি নিজের প্রবৃত্তি ও কল্পনা দ্বারা উহাকে জীবন্ত করিয়াছিলেন।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী, 'আত্মঘাতী বাঙালী', *আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ*, দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: মাঘ ১৩৯৮, ষষ্ঠ মুদ্রণ: পৌষ ১৪৭০, পৃ. ১১৯

২৫. তদেব, পৃ. ১২৬

২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পান্থ', 'পরিশেষ', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৮২, পৃ.

২৭. পম্পা মজুমদার, 'রবীন্দ্রমানসে বৈদিক সংস্কৃতির প্রভাব', সুবুদ্ধিচরণ গোস্বামী সম্পাদিত *রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত চর্চা*, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯, পৃ. ৬৭

২৮. জগদীশ ভট্টাচার্য, 'কবিমানস', *রবীন্দ্রচিত্তে জনচেতনা*, ভারবি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ২৪ জানুয়ারি, ১৯৯৮, পৃ. ৩৪০

২৯. সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নহে, ভাবের বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের সামগ্রী', 'সাহিত্য', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ৩০৭

৩০. জগদীশ ভট্টাচার্য, 'কবিমানস', *রবীন্দ্রচিত্তে জনচেতনা*, ভারবি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ২৪ জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ৩৪০-৩৪১

৩১. তদেব, পৃ. ৩৫০

৩২. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, *দেবতার মানবায়ন*, আনন্দ, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি, ১৯৯৫, চতুর্থ মুদ্রণ: নভেম্বর, ২০১০, পৃ. ২৩

৩৩. পম্পা মজুমদার, *রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০০৭, প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ, ১৩৭৯, পৃ. ১৯৭

৩৪. জগদীশ ভট্টাচার্য, *কবিমানসী*, দ্বিতীয় খণ্ড, ভারবি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০, পৃ. ৩০

৩৫. শ্রী অরবিন্দ, 'অগ্নি ও সত্য', *বেদরহস্য*, প্রথম খণ্ড, শ্রী অরবিন্দ সোসাইটি, শতবার্ষিকী সংস্করণ:

জুন, ১৯৭৪, পৃ. ৮৭

৩৬. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *হিন্দুদের দেবদেবী*, ফার্মা কে এল এম. প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৯৮২, পুনর্মুদ্রণ : ২০০৪, পৃ. ১৯৮

৩৭. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ*, দ্বিতীয় পর্ব, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পরিবর্ধিত সংস্করণ: ১৯৯৫, কলকাতা, পৃ. ৮৩

৩৮. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ*, তৃতীয় পর্ব, ফার্মা কে এল এম (প্রাইভেট) লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ: ১৯৮৬, পুনর্মুদ্রণ : ১৯৯৭, পৃ. ৩৬৭

৩৯. শ্রী অরবিন্দ, *বেদরহস্য (উত্তরার্ধ)*, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, প্রথম প্রকাশ: ২০০৩, পৃ. ৫৪

৪০. পুলিন দাস, *মঞ্চ অভিনয় নাট্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ*, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স, প্রা.লি., কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ২৫ বৈশাখ ১৩৯৮, পৃ. ২৯

৪১. শোনো বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে...

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রূপান্তর ১২, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১১৮৭

৪২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লিপিকা, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবম খণ্ড, পশিচমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ৬৬৬

৪৩. তদেব।

৪৪. তদেব।

৪৫. তদেব।

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথের জন্মের আগেই তার পরিবার সমাজের নোঙর তুলে বাঁধা ঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল। আচার, অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকর্ম সেখানে সমস্তই বিরল ছিল। আসলে উনিশ শতকের পটভূমিতে ব্রাহ্মগোষ্ঠী এবং তাদের আচার-আচরণ সমাজে একটা আলাদা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলত। তবে, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াটা এই পরিবারের ভবিতব্য ছিল। রঘুনাথ আচার্যের বংশধরদের 'মুসলিম' হয়ে যাওয়ার ঘটনা থেকে শুরু করে পরিবারটির পিরালী গোষ্ঠীর ব্রাহ্মণ সমাজে নির্বাসন পর্ব মনে করলে একথা বলাই যায়। এরপর, ১৮৩৮-৩৯ সালে দেবেন্দ্রনাথের মনের গহনে জেগে উঠল এক ঔপনিষদিক অনুভূতি। এই অনুভূতি থেকেই ঠাকুরবাড়িতে পৌত্তলিকতা দূর করার জন্য তিনি কঠিন নিয়ম জারি করে দিয়েছিলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্মের ভিত প্রতিষ্ঠা হলেও ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে এর বিরুদ্ধে ঘোষিত হয়েছিল নিরুচ্চারিত বিদ্রোহ। অন্দরমহলে, তোশাখানায় নীরবে বহমান ছিল দেবসংস্কারের স্রোত। রবীন্দ্রনাথ বড়ো হয়েছিলেন এই দ্বিখণ্ডিত ধর্মীয় আবহাওয়ায়। অগ্রজদের মধ্যেও দ্বিধাগ্রস্ত মন লক্ষ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। দ্বিজেন্দ্রনাথের উপবীত পরে বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা, সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণায় বাড়ির পুজোর বর্ণনা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রতিমা গড়া দেখার আনন্দের বোধ নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের মনের গহনেও আবেগ তৈরি করেছিল।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধারের বাধ্য সন্তান হওয়ার সুবাদে রবীন্দ্রনাথ কোনো ভাবেই ব্যক্তিগত জীবনে দেবসংস্কার বা দেবদেবীর প্রতি অনুরাগ প্রকাশের সুযোগ পাননি। অথচ, রবীন্দ্রনাথের মতো সৌন্দর্যবোধসম্পন্ন মানুষ দেববিগ্রহগুলির প্রতি আকৃষ্ট হবেন— এটাই স্বাভাবিক। অপ্রকাশিত সেই মুগ্ধতাকে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছিলেন নিজের সাহিত্যক্ষেত্রে। সেখানে তিনি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে গড়ে তুলেছিলেন এক অভিনব দেবলোক। সেখানে দেবরাজ ইন্দ্র কখনো চিত্রকর, কখনো উদ্যত বজ্র হাতে সত্যের পূজারি। অগ্নি লাবণ্যময়ী এক পূজারিণী মূর্তিতে রবীন্দ্রনাথের মনের গহনে দিব্যসংকল্প জাগিয়ে তোলেন। সূর্য, চন্দ্র, বরুণ, বিশ্বকর্মা, মদন, কার্তিক, গণেশ বৈদিক বা পৌরাণিক সনাতন নির্মোক ভেদ করে নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। লক্ষ্মী একাকার হয়ে যান গৃহের মানবপ্রতিমার সঙ্গে। সরস্বতী গ্রিক মিউজদের মতো কবির মনে প্রেরণার সঞ্চার করে যান। দশভূজা দুর্গা শক্তিময়ী নারীর প্রতীক সমাজে কর্মযজ্ঞের সূচনা করেন। এই দেবীই যখন ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে ক্ষুধার্তকে অন্নদান করেন তখন তিনি অন্নপূর্ণা। যদিও আবাল্য কালীপ্রতিমাকে নানাকারণে ঘৃণাই করে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তবু 'হরহৃদে কালিকা' অথবা 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন

আপনি'র মতো গানে নিজের মতো করে সাজিয়ে তুলেছিলেন দেবী কালিকাকে। ধ্বংস নয়, বরাভয়ের মুদ্রা এঁকেছিলেন তাঁর হাতে। অনার্য দেবদেবীদের চরিত্রগত দুর্বলতা মেনে নিতে পারেনি রবীন্দ্রনাথের শিল্পী মন। ফলে মনসা বা চণ্ডীর প্রতি কোনোদিনই সদয় হতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। বাস্তবে না হোক, সাহিত্যের স্বর্গলোকে দেবদেবীদের মান্যতা দিয়েছিলেন ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ।

এই গবেষণায় আমাদের মূল প্রতিপাদ্য ছিল রবীন্দ্রসাহিত্যে দেবভাবনাটিকে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা। ফলে, প্রথমে আমরা উনিশ শতকের বিভিন্ন প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের দেবচর্চার ইতিবৃত্ত আলোচনা করেছি। রবীন্দ্রনাথের পাঠ্যতালিকাটিকে খেয়াল রেখে প্রাচীন দেবনির্ভর সাহিত্যগুলির বিস্তারিত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্রনাথের আগেও যে অনেকে বক্তব্য প্রকাশের প্রয়োজনে দেবতার সিদ্ধরূপকে ভেঙেছেন— তাও আমরা দেখিয়েছি। রবীন্দ্রমানসে সমাজ ও সংস্কৃতির এবং পূর্বজ সাহিত্যিকদের দেবতাভাবনার প্রভাব আলোচনা করার পর নির্বাচন করেছি রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক পরিমণ্ডলকে। সেখানে বাহ্যিক ব্রাহ্মধর্মের আড়ম্বর এবং অন্দরমহলের পৌত্তলিক মনোভাব রবীন্দ্রনাথের অপরিণত মনে একই সঙ্গে কাজ করেছিল। পরিণত বয়সেও একই দোলাচল তাঁর ব্যক্তিত্বকে আবিষ্ট করেছিল। এরপর তাঁর সাহিত্যে দেবপ্রসঙ্গগুলির উল্লেখের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের দেবতাভাবনার পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি।

গবেষণা কাজের শেষে, আমরা খুঁজে পেয়েছি সমাজ-সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন রবীন্দ্রনাথের একটি সত্তাকে। যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম বা হিন্দু কোনো পরিচয়ের গণ্ডিতেই আবদ্ধ নয়। সেই রবীন্দ্রনাথের একটাই পরিচয়, তিনি কবি। বলা ভালো, তিনি একজন রোমান্টিক কবি। সেই কারণেই তাঁর দেবতাভাবনাকে গোঁড়া ব্রাহ্ম দৃষ্টিভঙ্গি যেমন স্পর্শ করেনি, তেমনি সেই ভাবনা ভেসে যায়নি অতিভক্তির প্লাবনে। কল্পনার জাদুকাঠির স্পর্শে তিনি তাঁর সাহিত্যের দেবলোকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন যে দেবসমাজকে, তাঁরা একান্তভাবেই রাবীন্দ্রিক। কোনো বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায় তাঁদের উপর দাবি রাখতে পারবে না।

এইভাবে যুক্তি, তথ্য এবং বোধের স্তর পার হয়ে আমরা 'রবীন্দ্রসাহিত্যে দেবতাভাবনা' শীর্ষক গবেষণাটির অন্তিম পর্বে পৌঁছে গিয়েছি। চিনে নিতে চেষ্টা করেছি এক অন্য রবীন্দ্রনাথকে, যিনি 'গুরু' বা 'সাধক' নন, মাটির পৃথিবীর এক আবেগপ্রবণ কবি। এই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, মাঘ ১৪০৬ বঙ্গাব্দ।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, মাঘ ১৪০৬ বঙ্গাব্দ।

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, তৃতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ফাল্গুন ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ।

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, সপ্তম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, নবম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২৫ বৈশাখ ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ।

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছিন্নপত্রাবলী*, নূতন সংস্করণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, চৈত্র ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ।

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জুলাই ১৯৮০।

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মে ১৯৮২।

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, নভেম্বর ১৯৮৩।

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জুলাই ১৯৮৭।

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জুলাই ১৯৮৪।

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, অক্টোবর ১৯৮৫।

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, অক্টোবর, ১৯৮৫।

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জুলাই ১৯৮৬।

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মার্চ ১৯৮৮।

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মার্চ ১৯৮৯।

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আগস্ট ১৯৮৯।

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ডিসেম্বর ১৯৮৯।

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, নভেম্বর ১৯৯০।

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্দশ খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২।

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চদশ খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আগস্ট ১৯৯৪।

২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চদশ খণ্ড ক, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ফেব্রুয়ারি ২০০০।

২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চদশ খণ্ড খ, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মে ২০০৪।

২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ষোড়শ খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মে ২০০১।

সহায়ক গ্রন্থ (বাংলা)

১. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ঘরোয়া*, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আশ্বিন ১৩৪৮।

২. অমরেন্দ্র রায় (সম্পা.), *শাক্ত পদাবলী* (চয়ন), প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭।

৩. অমিতাভ চৌধুরী, *রবি ঠাকুরের পাগলা ফাইল*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, শৈব্যা প্রকাশনী, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ।

৪. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সম্পা.), *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র*, অষ্টম সংস্করণ, কলকাতা দে'জ পাবলিশিং, অগ্রহায়ণ, ১৪০৬।

৫. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য এবং সুমঙ্গল রাণা (সম্পা.), *শ্রীকৃষ্ণবিজয়*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, রত্নাবলী ২০০৩।

৬. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, কলকাতা, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৫।

৭. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৬।

৮. ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, *স্মৃতিটুকু*, অনাথনাথ দাস (সম্পা.), প্রথম সংস্করণ, শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী-রবীন্দ্রভবন, মাঘ ১৪০৫ বঙ্গাব্দ।

৯. উৎপল দত্ত, *গিরিশমানস*, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটিড, জানুয়ারি ১৯৮৩।

১০. কালীপ্রসন্ন সিংহ, অরুণ নাগ (সম্পা.), *সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা*, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারী ২০০৮।

১১. ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পা.), *মধুসূদন রচনাবলী*, প্রথম প্রকাশ, সংশোধিত পরিবর্তিত সংস্করণ, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, জুন ১৯৯৯।

১২. জগদীশ ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্রচিত্তে জনচেতনা*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ভারবি, জানুয়ারি ১৯৯৮।

১৩. জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত (সম্পা.), *কবি বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল*, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২।

১৪. শ্রী জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী (সম্পা.), *আর্যসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ*, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, সান্যাল অ্যাণ্ড কোম্পানী, রাসপূর্ণিমা ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ।

১৫. জ্যোতির্ময় সেন (ভূমিকা ও তথ্যপঞ্জি), *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী*, প্রথম অলকানন্দা সংস্করণ, কলকাতা, অলকানন্দা পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০১২।

১৬. তুহিনশুভ্র ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্রনাথ চাইলেও বিবেকানন্দ মেশেন নি*, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, কারিগর, জানুয়ারি ২০১১।

১৭. নীরদচন্দ্র চৌধুরী, *আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, মাঘ ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ।

১৮. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, *দেবতার মানবায়ন/শাস্ত্রে সাহিত্যে ও কৌতুকে*, প্রথম সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ, নভেম্বর ২০১০।

১৯. পম্পা মজুমদার, *রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস*, প্রথম দে'জ সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জুলাই ১৯৭২।

২০. পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পা.), *জ্ঞানদানন্দিনী দেবী রচনা সংকলন*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, অগ্রহায়ণ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ।

২১. পুলিন দাস, *মঞ্চ অভিনয় নাট্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, বৈশাখ, ১৯৩৮।

২২. প্রণবেশ চক্রবর্তী, *দেবতা অনুরাগী রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, নাথ ব্রাদার্স, এপ্রিল ১৯৮২।

২৩. প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, *অবনীন্দ্র চরিতম্*, প্রথম রূপা সংস্করণ, কলকাতা, রূপা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৭।

২৪. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ।

২৫. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ, মে ২০০৬।

২৬. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ, বৈশাখ ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।

২৭. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, চতুর্থ খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ, কার্তিক ১৪১৫ বঙ্গাব্দ।

২৮. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, পঞ্চম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ, কার্তিক ১৪১৪ বঙ্গাব্দ।

২৯. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, ষষ্ঠ খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ, ফাল্গুন ১৪১৪।

৩০. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, সপ্তম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ, আষাঢ় ১৪১৪ বঙ্গাব্দ।

৩১. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, অষ্টম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ, শ্রাবণ ১৪১৬।

৩২. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, নবম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ জুন ২০০৮।

৩৩. ফরহাদ খান, *প্রতীচ্য পুরাণ*, প্রথম প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা, প্রতীক প্রকাশন, অক্টোবর ২০০১।

৩৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.), প্রথম প্রকাশ, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ; বৈশাখ ১৪০৫ বঙ্গাব্দ।

৩৫. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, *জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি*, প্রশান্তকুমার পাল (সম্পা.), প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, সুবর্ণরেখা, ২০০২।

৩৬. বিহারীলাল চক্রবর্তী, শ্রী প্রমথনাথ বিশী (সম্পা.), *বিহারীলাল রচনাসম্ভার*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ফাল্গুন ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।

৩৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সাহিত্য সাধক চরিতমালা*, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।

৩৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সাহিত্য সাধক চরিতমালা*, তৃতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।

৩৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), *ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী*, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ফাল্গুন ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ।

৪০. ভূদেব মুখোপাধ্যায়, *ভূদেব রচনাসম্ভার*। বিশী প্রমথনাথ (সম্পা.), প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ।

৪১. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পিতৃস্মৃতি*, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, জিজ্ঞাসা, অগ্রহায়ণ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।

৪২. রাধাগোবিন্দ নাথ (সম্পা.), *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন*, সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, প্রাচ্য বাণী মন্দির, সেপ্টেম্বর ১৯৬০।

৪৩. শম্ভুনাথ কুণ্ডু, *প্রাচীন বঙ্গে পৌরাণিক ধর্ম ও দেবভাবনা*, প্রথম প্রকাশ, বর্ধমান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, জানুয়ারি, ১৯৯৬।

৪৪. শিশিরকুমার দাস, *মধুসূদনের কবিমানস*, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৯।

৪৫. শ্রী অরবিন্দ, *বেদরহস্য*, প্রথম খণ্ড, শতবার্ষিকী সংস্করণ, পণ্ডিচেরি, শ্রী অরবিন্দ সোসাইটি, জুন ১৯৭৪।

৪৬. শ্রী অরবিন্দ, *বেদরহস্য*, উত্তরার্ধ, প্রথম প্রকাশ, পণ্ডিচেরি, শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, ২০০৩।

৪৭. সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), *নবীনচন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ।

৪৮. সনৎকুমার নস্কর (সম্পা.), *কবিকঙ্কন চণ্ডী*, প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, রত্নাবলী, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯।

৪৯. সমীর সেনগুপ্ত, *রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন*, প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ডিসেম্বর ২০০৮।

৫০. সরলা দেবী, *জীবনের ঝরাপাতা*, প্রথম সুবর্ণরেখা সংস্করণ, কলকাতা, সুবর্ণরেখা, ২০০৭।

৫১. সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত), *পৌরাণিক অভিধান*, নবম সংস্করণ, কলকাতা, এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, জ্যৈষ্ঠ ১৪১০ বঙ্গাব্দ।

৫২. সোমেন্দ্রনাথ বসু, *নাস্তিকতা ও রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, রবীন্দ্রচর্চা ভবন, ২৫ বৈশাখ ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ।

৫৩. সোমেন্দ্রনাথ বসু (সম্পা.), *স্মৃতিকথা*, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, বৈতানিক প্রকাশনী, মাঘ ১৪০৯ বঙ্গাব্দ।

৫৪. স্বপন বসু, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস*, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, অক্টোবর ২০০০।

৫৫. স্বামী নির্ম্মলানন্দ, *দেবদেবী ও তাঁদের বাহন*, ষষ্ঠ সংস্করণ, কলকাতা, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, আষাঢ়, ১৪১০ বঙ্গাব্দ।

৫৬. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), *রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত*, প্রথম প্রকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, জুলাই ১৯৮৯।

৫৭. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পা.), *শ্রীল কৃষ্ণদাস বিরচিত শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত*, প্রথম প্রকাশ, ২৪ পরগনা, বি.সি.মজুমদার-বি.পি.এম'স প্রিন্টিং প্রেস, মে ১৯৯৭।

৫৮. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *হিন্দুদের দেবদেবী—উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ*, প্রথম খণ্ড, পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৪।

৫৯. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *হিন্দুদের দেবদেবী—উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ*, দ্বিতীয় খণ্ড, পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫।

৬০. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *হিন্দুদের দেবদেবী—উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ*, তৃতীয় খণ্ড, পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭।

৬১.. হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), *উজ্জ্বলনীলমণি*, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ভারতী প্রকাশন, ১৯৭৭।

৬২. হেমন্তবালা দেবী, *কবিকে লেখা চিঠি*, বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ ও সান্যাল, জয়ন্তী (সম্পা.), প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, আগস্ট ১৯৯৯।

সহায়ক গ্রন্থ (ইংরেজি)

১. John Dowson, *A Classical Dictionary of Hindu Mythology & Religion*. Fourteenth Impression, Kolkata, Pupa, 2004.

২. Krishna Kripalani, *Tagore A Life*, First NBT Edition, Second Reprint, New Delhi, National Book Trust, 2001.

৩. Shankari Prasad Basu, *Letters of Sister Nivedita*, Volume-I, First Publication, Kolkata, Nababharat Publishers, April, 1982.

৪. Swami Nirmalananda, *Hindu Gods And Goddessess*, English First Edition, Kolkata, Bharat Sevasram Sangha, 1998.

সহায়ক পত্রপত্রিকা

১. শিবশিস দত্ত, পার্থ চক্রবর্তী এবং অন্যান্য (সম্পা.), *অবভাস*, প্রসঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ, পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, কলকাতা, জানুয়ারি-মার্চ, ২০০৬।

২. সুব্রত রায়চৌধুরী (সম্পা.), *তথ্যসূত্র*, সতেরো বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০১৩।